সাহিত্য ত্রৈমাসিক

প্রেক্ষণ

বেগম রোকেয়া স্মরণ

অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০৩

খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত

প্রক্ষণ

সাহিত্য ত্রৈমাসিক

বেগম রোকেয়া স্মরণ
অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০৩

ডিক্ল্যারেশন প্রাপ্তি-পূর্ব সংখ্যা হিসেবে
বর্ষ–১০ সংখ্যা–৪
ডিক্ল্যারেশন প্রাপ্তি-উত্তর সংখ্যা হিসেবে
বর্ষ–৬ সংখ্যা–৪

খন্দকার আবদুল মোমেন
সম্পাদিত

www.pathagar.com

প্রক্ষণ

সাহিত্য ত্রৈমাসিক

অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর-২০০৩ সংখ্যা

সম্পাদক : খন্দকার আবদুল মোমেন

সহ-সম্পাদক : নাজমুন নাহার ও সাবিনা মল্লিক

উপদেষ্টামণ্ডলী : শাহ আবদুল হান্নান
আল মাহমুদ
শাহাবুদ্দীন আহমদ
মীর কাসেম আলী
আবুল আসাদ
আবদুল মান্নান তালিব
ফজলে আজিম
হামিদুল ইসলাম
মতিউর রহমান মল্লিক

এ সংখ্যার পৃষ্ঠপোষক : বদরে আলম
প্রফেসর ড. বোরহান উদ্দিন
কাজী জয়নুল আবেদীন
সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানু
মাওঃ আবুল কালাম আজাদ
ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আবুল বাশার
সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ছালেহ
আবদুস সাদেক ভুঁইয়া
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
মোঃ মোশাররফ হোসাইন
মোঃ ইয়ানুর রহমান
এ, এন, এম, রশীদ আহমাদ
অধ্যাপিকা খোন্দকার আয়েশা খাতুন
বি, এম, মনিরুল ইসলাম
মোফাজ্জল হোসেন মিলন

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

সম্পাদনা সহযোগী : মোহাম্মদ তৌহিদুর রহমান

প্রকাশকাল : ৬ পৌষ ১৪১০/২৬ শাওয়াল ১৪২৪/২০ ডিসেম্বর ২০০৩

বিনিময় : ত্রিশ টাকা, তিন মার্কিন ডলার [US$ 3]

সম্পাদক কর্তৃক সড়ক নং ১৩, বাড়ি নং ৫ [তৃতীয় তলা], পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি, ব্লক-খ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত এবং আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ফোন : ৯১২৭২৬০।

www.pathagar.com

মহীয়সী বেগম রোকেয়া

www.pathagar.com

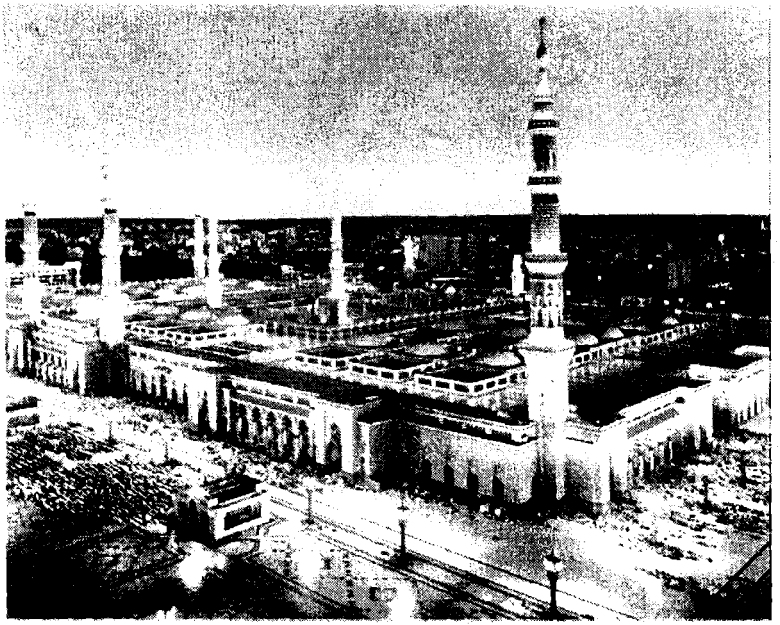

প্লাজা প্রিন্ট শাড়ীর উপহার

আইডি টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ
রোড-১০, প্লট-২৫
শ্যামপুর শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৪
ফোন : ৭৪১৫০৮৭, ৭৪১৭০৫৩

ঝলক, সলিডগোল্ড, মাধুরী, উল্লাস, ডলার্স, বউ, সেভেনহেভেন, সাগরিকা, লিলি, বিনিময়, ডায়মন্ড, রত্নাদ্বিপ, মেরিগোল্ড, মোনালিসা, চ্যানেল আই, স্টার প্লাস, স্বাগতম, একুশে, মোবাইল, এভারেষ্ট, সিলভার, যুগান্তর, জিপি জিপি, থ্রি-পিছ, টু-পিছ ও থান।

সৌন্দর্য বিকাশে অনন্য পরশ

Ivy Tex

শো-রুম
মেসার্স ফেব্রিকস্ প্লাজা
৮৮/৮, ইসলামপুর রোড, (কোহিনুর মার্কেট), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৭৩১১৬৭৪, ৭৩১১৪০৮, মোবাইল : ০১৭১-৫২৭২৩৯

পরিবেশক
মেসার্স প্লাজা টেক্সটাইল
৮৭, ইসলামপুর রোড, আহসানউল্লাহ কমপ্লেক্স (২য় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৭৩১১৬৭৪, ৭৩১১৪০৮, মোবাইল : ০১৭২-০১৫৭৯৪

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সম্পাদকীয়

প্রেক্ষণ সাহিত্য ত্রৈমাসিক, ২০০৩ সালের ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা নানা সঙ্কটের কারণে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। সেজন্য পাঠক সমীপে নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করছি। একই সাথে মহান আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি বেগম রোকেয়া স্মরণ সংখ্যার আত্মপ্রকাশের জন্য।

জাতীয় জীবনে কোন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই প্রয়োজন পূরণের জন্যই বেগম রোকেয়ার আবির্ভাব। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও কুপমণ্ডুকতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে এদেশের নারী সমাজকে আলোকিত পথে পুরুষের পাশাপাশি ভূমিকা পালনের জন্য নারী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে বেগম রোকেয়ার সংগ্রাম অবিস্মরণীয়। ইসলাম শিক্ষাকে নারী ও পুরুষের জন্য ফরজ [অবশ্য কর্তব্য] করেছে। এই ফরজ কাজ থেকে নারীকে বঞ্চিত করা হয়েছিল বেগম রোকেয়ার সমকালীন সমাজে। এরি প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায় বেগম রোকেয়ার লেখনিতে। অধিকার বঞ্চিত নির্যাতিত নিপীড়িত নারী সমাজকে শিক্ষার আলোকিত পথে আনার আহ্বান দেখা যায় তার লেখনিতে, ধর্মীয় বিধি-বিধানের যথার্থ ব্যাখ্যা তার লেখনিতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বেগম রোকেয়াকে নিয়ে নানা বিতর্ক। বিভিন্ন মতের সমালোচক নিজ নিজ মতের ও পছন্দের মানুষ হিসেবে বেগম রোকেয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্য ক্রিয়াশীল বলে প্রতীয়মান হয়। সাহিত্য সমালোচনার জন্য একাডেমিক সততা অপরিহার্য। কোন লেখক বা লেখিকাকে জোর করে তিনি যা নন, তিনি যা ভাবেননি বা লিখেননি বা তার আচরণে যা ছিল না– সেভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা বড়ই অন্যায়। লেখক বা লেখিকার সামগ্রিক মূল্যায়নই যথার্থ মূল্যায়ন। তার আংশিক বক্তব্যের মূল্যায়ন বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। এমন পথের সমালোচনা সমালোচক জীবনের নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থী। হলুদ সাংবাদিকতা যেমন জাতির জন্য ক্ষতিকারক– নীতি বিবর্জিত সমালোচনাও তেমনি জাতির জন্য দুষ্টক্ষত।

বেগম রোকেয়ার সমগ্র রচনা পাঠে দেখা যায় ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে সংকীর্ণ ও বিকৃত ধারণা থেকে মানুষকে সঠিক ধারণায় আনার প্রচেষ্টা করেছেন তিনি। 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।' ক্ষোভ-দুঃখে মানুষের মুখ থেকে এমন কথাই বেরিয়ে আসে। শিশুর আচরণে বিরক্ত মা তাই বলেন, 'দেব তোকে গঙ্গায় ফেলিয়া।'– তাই বলে মা কি তাকে গঙ্গায় ফেলে দেন? না, এটা তার আসল কথা নয়। মহীয়সী বেগম রোকেয়া ধর্মীয় ব্যাপারে অজ্ঞতার নিপীড়নে ক্ষুব্ধ হয়ে কখনো কখনো যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তার ভুল অর্থ নিলে চলবে না। তার সমগ্র রচনাটির বক্তব্য কিন্তু ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে নয় বরং যথার্থ ধারণার স্পষ্ট প্রকাশ।

বেগম রোকেয়া প্রগতি চেয়েছেন। তবে যে প্রগতি বিদেশী সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ এবং যার ফলশ্রুতি উচ্ছৃঙ্খলতা ও নগ্নতার বহিঃপ্রকাশ তাকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন। প্রগতি বলতে বেগম রোকেয়া জ্ঞানে গরিমায় বিকশিত সুন্দর পরিশীলিত জীবন-যাপনকে বুঝিয়েছেন।

এ সংখ্যায় আমরা সমস্ত মত ও পথের লেখক ও লেখিকার লেখা ছেপেছি। বেশ কিছু লেখা সংকলিত। সংকলনের অনুমতির জন্য সবার সাথে যোগাযোগ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আশা করি এ অপরাধ সুশীল সমাজ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

বেগম রোকেয়া স্মরণ সংখ্যা প্রকাশের কাজে যারা বিভিন্ন উপায়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন– তাদের সবার জীবনে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির নহর প্রবাহিত হোক– আমাদের এ আশা নিরন্তর।

www.pathagar.com

We Never Forget

How Important You Are

ট্রাভেল ইন্টারন্যাশনাল লিঃ

TRAVEL INTERNATIONAL LTD

IATA

(IATA APPROVED TRAVEL AGENT)

L-107, SONARGAON HOTEL, KAWRAN BAZAR, DHAKA, BANGLABESH

PHONE : 8113557, 8113599, 9129671, PABX : 8111641, EXT : 4906, FAX : 880-2-8118137

HOUSE # 24, ROAD # 8, GULSHAN-1, DHAKA, BANGLADESH

PHONE : 8812693, 8812590, FAX : 880-2-8812159

58, AGRABAD COMMERCIAL AREA, CHITTAGONG, BANGLADESH

PHONE : 711443, 725349, 716189, 713752-3 FAX : 880-31-710285,

www.pathagar.com

প্রশ্ন

পুরানো সমাধিস্তম্ভ পার হ'য়ে কারখানা, প্রাচীন দেয়াল।
বিশীর্ণ ক্ষুধার ছায়া, কৃষাণের ক্লান্তদেহ শ্রমিক-কংকাল,
নূয়ে পড়া শ্রান্ত মূর্তি শ্রমজীবী কেরানীর, বুভুক্ষু নিখিল,
অবসন্ন বসুন্ধরা খোলে কর্মজগতের খিল।
এসেছে প্রভাত।
সারাদিন, সারারাত
দশদিক ঘিরে পড়ে মেদস্ফীত শোষকের উর্ণনাভ জাল,
জনতার রক্তস্রোত কেটে কেটে চলে তার জাহাজের হাল,
ওড়ে তার বিজয় পতাকা
শোষিত করোটী চিহ্ন আঁকা।

দিকে দিকে তারি শব্দ, তারি হুইসিল
অবসন্ন বসুন্ধরা খোলে কর্মজগতের খিল
বিস্বাদ প্রভাতে।
রাতে
স্বপ্ন নাই।
অপঘাত, অপমৃত্যু, এরি মাঝে স্বপ্নসাধ খুঁজিয়া বেড়াই,
হায়।.....জীবনের স্বপ্ন চাই।

– ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়া, স্বামী সাখাওয়াত হোসেন ও আগের পক্ষের মেয়ের সাথে
প্রথম আলোর সৌজন্যে প্রাপ্ত

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

মহীয়সী নারী-শামসুন নাহার মাহমুদ-১১ ● বেগম রোকেয়ার 'sultana's Dream'-সদরুদ্দিন আহমদ-১৪ ● সে যুগের এক নারী-মুক্তিযোদ্ধা বেগম রোকেয়া-ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী-১৭ ● বেগম রোকেয়া ঃ নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও উন্নয়ন-মোতাহার হোসেন সুফী-২২ ● নারী মুক্তি-সমকাল–বেগম রোকেয়া-সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী-৩৩ ● নারী-সূর্য রোকেয়া-শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ-৪৫ ● বেগম রোকেয়া ও ইসলাম-আতিকুর রহমান-সাবেক প্রভাষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-৪৮ ● একজন শ্রেষ্ঠ নারী বেগম রোকেয়া-শাহ আবদুল হান্নান-৮৪ ● শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম মহিলা ঃ বেগম রোকেয়া-চেমন আরা-৮৭ ● বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও তাঁর সাহিত্য সাধনা-আবদুল হালীম খাঁ-৯২ ● বেগম রোকেয়া ঃ এক অমিত শক্তির নাম-বেগম রাজিয়া হোসাইন-৯৭ ● এক অনির্বাণ আলোর শিখা-নয়ন রহমান-১০৫ ● বেগম রোকেয়া ঃ সমালোচনা ও আলোচনার আড়ালে লড়াকু এক অসাধারণ নারীসত্তা-মাসুদ মজুমদার-১০৮ ● বেগম রোকেয়ার ব্যাঙ্গাত্মক রচনা-শামসুন নাহার জামান-১১২ ● অনন্যা-রায়হানা সালাম-১১৮ ● মহিয়সী বেগম রোকেয়া-তহমিনা বেগম-১২১ ● স্বশিক্ষিত বেগম রোকেয়া-লিলি হক-১২৪ ● বেগম রোকেয়া ও নারী আন্দোলন-সেলিন ইয়াসমিন-১২৬ ● বেগম রোকেয়া ও তাঁর শিক্ষাচিন্তা-ওমর বিশ্বাস-১৩০ ●

গল্প

মোছ-মোহাম্মদ লিয়াকত আলী-১৩৪ ● মানুষ অদৃশ্যে-শাহীন আখতার আঁখি-১৩৯ ●

নিবেদিত কবিতা

বেগম রোকেয়া স্মরণে-মোহাম্মদ মোরশেদ আলী-১৪৫ ● বেগম রোকেয়া আপনি কিংবা আপনার সুলতানা-সাবিনা মল্লিক-১৪৬ ●

জীবনপঞ্জি-১৪৭ ●

অ্যাল্‌বাম্‌-১৫৮ ●

www.pathagar.com

বই হোক আমাদের নিত্যসঙ্গী

প্রিয় পাঠক

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমাদের দেশে সাহিত্য পত্রিকার খুবই আকাল। দুর্যোগ কাটিয়ে প্রেক্ষণ সাহিত্য ত্রৈমাসিক এখনও টিকে আছে আত্মপ্রত্যয়ের সাথে। এর চলার পথ প্রশস্ত হবে যদি পাঠক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' মহানবী [সা.]-এর মুখ নিঃসৃত বাণী ঃ 'তোমরা জ্ঞান অর্জন কর দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত।'

প্রিয় পাঠক

আসুন, আমরা আমাদের জীবনে মনীষীদের নিম্নোক্ত কালোত্তীর্ণ বাণীগুলোর প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করি ঃ

- সাহিত্য হচ্ছে দেশ ও জাতির জীবন মানসের প্রতিফলন। –ইমারসন
- শিল্প ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে আত্মার খাদ্যের সংস্থান করা যায়। –শেলী
- যার বাড়িতে একটি লাইব্রেরি আছে, মানবিক ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে সে অনেক বড়। –হেনরিক ইবসেন
- যার বাগান পুষ্পরাজিতে পূর্ণ এবং যার গৃহ গ্রন্থরাজিতে পূর্ণ, মানের দিক থেকে সে ঐশ্বর্যবান। –এন্ডিউল্যাংস
- যে বই পড়ে না তার মধ্যে মর্যাদাবোধ জন্ম নেয় না। –পিয়ারসন স্মিথ
- জীবনটা বই দিয়ে ঘেরা নয় ঠিকই, তবে জীবনকে বুঝতে হলে অভ্যাসের সংস্কারের বেড়া ভাঙতে হলে বই চাই –সরোজ আচার্য
- সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। –প্রমথ চৌধুরী
- পাঠাগার নিঃসন্দেহে লিখিত ভাষার সঞ্চয় কেন্দ্র। এখানে মানুষ বিপুল পৃথিবীর বিচিত্র সঞ্চয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়। –সৈয়দ আলী আহসান
- The education is not a preparation for life, rather it is the living. –জন ডিউই

প্রিয় পাঠক

ওমর খৈয়াম বলেন, 'রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা-যদি তেমন বই হয়।' সৈয়দ মুজতবা আলী বলেন- 'বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি।' সুন্দর জীবনের জন্য আর কিছু নয়- শুধু বই-বই আর বই।

অতএব, আসুন আমরা সাহিত্য জগতের একটি সুন্দর প্রকাশনা প্রেক্ষণ সাহিত্য ত্রৈমাসিক-এর বার্ষিক গ্রাহক হয়ে যাই। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ ঢাকা মহানগরীর জন্য ১৫০/- টাকা। ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের জন্য ১৬০/- টাকা। পরিশেষে সবার জন্য শুভেচ্ছা আর শুভেচ্ছা।

বিনীত

সম্পাদক, প্রেক্ষণ

www.pathagar.com

মহীয়সী নারী

শামসুন নাহার মাহমুদ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শাহজাহানের উদ্দেশে বলিয়াছেন ঃ
'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার।'

রোকেয়ার জীবন আলোচনা করিলে তাঁহার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটিই বলিতে ইচ্ছা হয়। মুসলমান বালিকাদিগের শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য রোকেয়া একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—বহুদিন পরেও হয়ত একথা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধায় মানুষের শির অবনত হইবে। কিন্তু শুধু একটা স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী বলিলে তাঁহার সত্যিকার পরিচয় হইল না—বাংলার মুসলমান নারীসমাজের গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিবে। এই অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে একটা সমাজের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। আর এই অদ্ভুত পরিবর্তনের জন্য সকলের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব এ কল্যাণী নারীর, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অন্ধকারের কুঁড়িতে রোকেয়া ফুটিলেন আলোকের শতদল পদ্মের মত এ যেন প্রকৃতির রহস্য বিলাস। দীর্ঘকাল সবসাধনা করিয়া তিনি কিরূপে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বপ্ন কিরূপে সফল হইল—তাহাও এক বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে মনে হয়, সাফল্যের বীজ তাঁহার নিজের চরিত্রের মধ্যেই লুকানো ছিল।

মনে হয় রোকেয়ার সাফল্যের প্রধান কারণ তাঁহার কঠিন পণ ও আদর্শের প্রতি তাঁহার বিশ্বস্ততা। 'সত্যপ্রিয় হউক, আর অপ্রিয় হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, সত্যকে বুঝিব, খুঁজিব ও গ্রহণ করিব' এই ছিল তাঁহার পণ। শুধু তাই নয়। তাঁহার আদর্শ ছিল ইহার চেয়েও উচ্চ। সত্যকে শুধু গ্রহণ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। সত্যকে প্রচার করিবেন—দেশের প্রত্যেকটি হতভাগ্য নারীকে জ্ঞানের পথে টানিয়া লইবেন, এই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। জীবনের শেষ পর্যন্ত কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে

www.pathagar.com

মুহূর্তের জন্যও তাঁহার লৌহের মত দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। সমাজসেবা করেন অনেকেই। কিন্তু রোকেয়ার মত এমন আপন-ভোলা সমাজসেবা কে কবে দেখিয়েছে। সমাজের জন্য এমন করিয়া নিজের ঘরবাড়ী, আত্মীয়-স্বজন, বিত্তসম্পত্তি, মানসম্ভ্রম সমস্ত ত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্ত হতে সংসারে ক'জন লোক পারিয়াছেন; জানি না।

রাজনীতিক্ষেত্রে কত প্রসিদ্ধ দেশ নেতাকে অনেক সময় মত পরিবর্তন করিয়া নূতন পথ ও নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রোকেয়ার ছিল একই রাজনীতি—তাহা নারীজাগরণ। অর্ধশতাব্দী আগে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, শত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহাকেই মুক্তির একমাত্র অভ্রান্ত সত্যপথ বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। এতখানি দৃঢ়তা ও এতখানি একাগ্রচিত্ততা যাঁহার মধ্যে ছিল এত দীর্ঘদিন পরেও সাফল্যের সুবর্ণ-কুঞ্জিকা তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িবে না, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

রোকেয়া-জীবন আলোচনা করিলে আমাদের চোখ উজ্জ্বল হইয়া জাগে তাঁহার স্বভাবের একটি গুণ—কোমল ও কঠোরের অপূর্ব সংমিশ্রণ। তাঁহার মন ছিল মমতা মধুতে ভরা! নারীর দুঃখে সে মন মোমের মত গলিয়া যাইত। কি করিয়া এই দুঃখের অবসান হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া তিনি বেদনায় আকুল হইতেন। কিন্তু এই কোমল নারী-চিত্তেরই অন্তরালে এত দৃঢ়তার স্থান কোথায় ছিল, তাহা কে বলিবে? কুসুমকোমলা নারী কোথা হইতে পাইলেন অত অবিচলিত অধ্যবসায়, অত দুর্বার শক্তি ও সাহস, কে একথার উত্তর দিবে?

প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে রোকেয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন,এই সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে; কিন্তু এই বিদ্রোহ তাহার স্নেহ-সুকুমার হৃদয়ের গভীর মমত্ববোধকে ক্ষুণ্ন করিতে পারে নাই। ধ্বংসের আনন্দের চেয়ে সৃষ্টির বেদনাই তাঁহার জীবনের বেশি কার্যকরী হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিভা ছিল সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা। তাঁহার কথা, তাঁহার বক্তৃতা, তাঁহার সাহিত্য—সকল কিছুর মধ্য দিয়াই তিনি সমাজের কুসংস্কারের মূলে আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে বিদ্রোহের উদ্দামতার চেয়ে চিরকালই বেশি ফুটিয়াছে তাঁহার দরদী মনের তীব্র বেদনাবোধ। তাঁহার প্রতিভার বৈচিত্র্য ও মৌলিকতা যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা এখানেই।

জীবনের প্রভাতে চক্ষু মেলিয়া তিনি সমাজের শোচনীয় দুর্দশায় শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু রোগের চিকিৎসা নির্ণয় করিয়াছিলেন তিনি নিপুণ চিকিৎসকের মতই। যুগ যুগ ধরিয়া যে কুসংস্কারের আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা—একথা তিনি ধ্রুব জানিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন শিক্ষার আলো যেদিন জ্বলিবে সেদিন কুসংস্কার কুয়াসার মত আপনিই মিলাইয়া যাইবে—তাহার জন্য আর হৈ চৈ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

মুসলিম নারী সমাজের উন্নতির প্রধান অন্তরায় অবরোধপ্রথা, একথা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন প্রাণঘাতী কার্বলিক এসিড গ্যাসের সহিত অবরোধ প্রথার তুলনা হয়। বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবকাশ পায় না। অন্তঃপুরবাসিনী শত শত নারীও এই অবরোধ-গ্যাস বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া মারিতেছে।

পর্দা অর্থে তিনি বুঝিতেন সবল ব্যক্তিত্ব, কোন প্রকার বাহ্য আড়ম্বর নয়,—তাঁহার সঙ্গে যাহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারাই এ কথা বলিবেন। পর্দা ও অবরোধ ভিন্ন জিনিসঃ

www.pathagar.com

পর্দা! ঐসলামিক কিন্তু অবরোধ অনৈসলামিক—এই বুলি আজকাল অনেকেই আওড়াইতে শুনি। কিন্তু একদিকে নারীর আচরণের সুন্দর সংযম ও শালীনতা অর্থাৎ পর্দা এবং অন্য দিকে অর্থহীন, প্রাণঘাতি অবরোধ—এই দুইয়ের মধ্যে এক যুক্তিসংগত পার্থক্য সেই সুদূর অতীতে রোকেয়াই সকলের আগে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারই লেখনী-মুখে একথা সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়, তাঁহার 'মতিচূর' ইহার সাক্ষ্য দিবে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে রোকেয়ার আসল বিদ্রোহ অবরোধের বিরুদ্ধে নয়। তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন না। তিনি জানিতেন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবরোধের মুখোশ আপনি খসিয়া পড়িবে! তাই শিক্ষা প্রচারের জন্যই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল। জগতের কয়জন সংস্কারক এত সংযম, এত সতর্কতা, এত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারিয়াছে, বলিতে পরি না।

[উৎস : বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল বাংলা সাহিত্য থেকে সংকলিত।]

ভর্তি চলছে! ভর্তি চলছে!! ভর্তি চলছে!!!

ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন
দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি

প্রোগ্রামসমূহ ঃ

ক. বি.এড [অনার্স] ৪ বছর মেয়াদী কোর্স, ৮ সেমিস্টারে সমাপ্ত, সর্বমোট প্রদেয় ফি ৩৬,০০০.০০ টাকা, ৯ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। ভর্তি হয় বছরে দু'বার ঃ ডিসেম্বর ও জুন মাসব্যাপী, ক্লাস শুরু ১০ জানুয়ারী ও ১০ জুলাই। সময় সকাল ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত।

খ. বি. এড [পাস] ১ বছর মেয়াদী কোর্স, ২ সেমিস্টারে সমাপ্ত, সর্বমোট প্রদেয় ফি ৭,০০০.০০ টাকা, ২ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। ভর্তি হয় বছরে ১বার ঃ জানুয়ারী থেকে জুন মাসব্যাপী। ক্লাস শুরু ১০ জুলাই। সময় বিকাল ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত।

গ. [1] এম. এড [মর্নিং-শিফট] ক্লাসের সময় সকাল ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত। [11] এম. এড [ডে-শিফট] ক্লাসের সময় বিকাল ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত। ১ বছর মেয়াদী কোর্স, ২ সেমিস্টারে সমাপ্ত, সর্বমোট প্রদেয় ফি ৯,০০০.০০ টাকা, ৩ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। ভর্তি হয় বছরে ১ বার ঃ মর্নিং-শিপট ডিসেম্বর ও ডে-শিফট জুন মাসব্যাপী।

সত্তর যোগাযোগ করুন ঃ

ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনে

বাড়ি নং ৮৪, ৪র্থ তলা, রোড নং- ৭/এ, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯, ফোন- ৮১২৯২৮৪

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়ার 'Sultana's Dream'

সদরুদ্দিন আহমদ

স্বপ্ন একটি কৌশল [device] হিসেবে অনেক সাহিত্যকর্মে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যযুগের ইংরেজি সাহিত্যে Pearl, Langland-এর Piers The Ploughman, Chaucer-এর The Nun's Priest's Tale এবং আধুনিক কালের Lewis Carroll-এর Alice in wonderland-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বেগম রোকেয়ার 'Sultana's Dream' গল্পে একই কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। এই গল্পে সুলতানা অন্যতম চরিত্র। এতে তার এক স্বপ্নের কাহিনী আছে। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে কাহিনীটি সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার।

এক সন্ধ্যায় সুলতানা তার ড্রয়িংরুমে বসে ভারতের মুসলিম নারীদের দুর্দশার কথা ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতে তিনি কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন তা টের পাননি। ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে তার এক পরিচিতা বিদেশী মহিলা Sister Sarah তার সামনে এসে তাকে 'সুপ্রভাত' জানাচ্ছেন। ভদ্র মহিলা সুলতানাকে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার আহ্বান জানালেন এবং সুলতানা এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে বুঝলেন যে এটা একটি অপরিচিত দেশ এবং মহিলা আসলে Sister Sarah নন– এক অপরিচিতা মহিলা। তবুও তাকে Sister Sarah বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমে বাস্তব জগতের সঙ্গে এই স্বপ্ন জগতের একটা পার্থক্য সুলতানার চোখে পড়লো। রাস্তা-ঘাট আশ্চর্যরকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; কোন ধূলো-বালি নেই; রাস্তার দু'ধারে ফুলের বাগান। রাস্তায় কোন লোকজন তেমন নেই। যাদের দেখা পেলেন তারা সবাই মহিলা। পুরুষ মানুষ কোথাও নজরে পড়লো না। স্বাভাবিকভাবে সুলতানা বিস্মিত হলেন এবং Sister Sarah কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তাকে জানানো হল যে পুরুষরা সব অন্তঃপুরে। এদেশে–দেশটাকে Lady land বলা হয়– মহিলারা বাইরের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

সুলতানার বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। পুরুষরা সব অন্তঃপুরে এবং মহিলারা বাইরের সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে– সুলতানার বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এটা মেলে না। শুধু তাই না। ব্যাপারটা তার কাছে অসম্ভব মনে হয়। এই অসম্ভব কাজ কিভাবে সম্ভব হলো Sister Sarah তার বিস্তৃত বিবরণ দিলেন।

তিনি বললেন যে এই নারীস্থানের রানী একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বিদুষী ও দেশপ্রেমিক মহিলা। তিনি যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে দেশ পরিচালনা করছেন। নারীদের শিক্ষার জন্য তিনি দুটি

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। সেখানে অনেক গবেষণাধর্মী কাজ হচ্ছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে। বৃষ্টির পানি মাটিতে পড়তে দেওয়া হয় না। তাই এখানে কাদা হয় না। যখন রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার করা দরকার হয়, কিংবা ফসল ফলানোর জন্য পানির দরকার হয় তখন জলাধার থেকে পাইপ দিয়ে পানি ব্যবহার করা হয়। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি সূর্যরশ্মি ধরে রাখার কৌশল আবিষ্কার করেছে এবং আলোর জন্য রাত্রে সেটা কাজে লাগানো হয়। এর ফলে বৃষ্টি বা রোদ এ দেশে কোন সমস্যা নয়। ফসল তৈরি করাও সহজ।

তিনি আরো বললেন যে কিছুদিন আগে এক বহিঃশত্রু তাদের দেশ আক্রমণ করে। তাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী সে আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। ফলে দেশ মারাত্মক বিপদের সম্মুক্ষীণ হয় এবং রানী দিশাহারা হয়ে পড়েন। তিনি পরামর্শের জন্য সকলকে ডেকে পাঠান। যে বিশ্ববিদ্যালয়টি সূর্যরশ্মি ধরে রাখার কৌশল আবিষ্কার করেছে তার প্রধান বললেন যে একটি উপায়ে এই আক্রমণ প্রতিহত করা যায় এবং সেটা করার আগে সেনাবাহিনীসহ সব পুরুষদের অন্তঃপুরে পাঠাতে হবে এবং মহিলারা এককভাবে আক্রমণের মোকাবেলা করবেন। তাই করা হলো। পুরুষদের অন্তঃপুরে পাঠানো হল। তখন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অন্যান্য মহিলাদের সহায়তায় সূর্যের Concentrated বা ঘনিভূত রশ্মি শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে শত্রুকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলেন। সেই দিন থেকে মহিলারা সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে এবং পুরুষরা অন্তঃপুরে আছে।

সুলতানা জিজ্ঞাসা করলেন যে পুরুষরা অন্তঃপুরে থেকে যেতে রাজী হলো কেন? মহিলা জবাব দিলেন যে তারা রাজী হয়নি, আপত্তি করেছিল, কিন্তু সেটি গ্রাহ্য করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা সেটা মেনে নিয়েছে। মেয়েদের পক্ষে দেশ পরিচালনা করতে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তাকে বলা হলো যে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আসলে পুরুষরা অলস, অকর্মণ্য, অপদার্থ। তারা অফিসে দেরি করে আসে, সিগারেট খেয়ে, গল্প করে সময় কাটায়; হেন অপরাধ নেই যা তারা করে না। অতএব তাদেরকে অন্তঃপুরে রেখে দিলে দেশ সুষ্ঠুভাবে চালানো যায়। আইন-শৃঙ্খলার কোন সমস্যা হয় না। কারণ অপরাধ হয় না বললেই চলে। মহিলা আরো অনেক সুবিধার কথা বললেন।

সুলতানার বিস্ময়ের অবধি রইলো না। তিনি সে দেশের রানীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। একটি হাওয়াই জাহাজে করে তাকে রানীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। রানীর সঙ্গে তার দেখা হলো, আলাপ হলো। তার আচরণে, কথা-বার্তায় সুলতানা মুগ্ধ হলেন। অবশেষে তিনি বিদায় নিলেন। ঐ হাওয়াই জাহাজে তার ফিরে আসার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু জাহাজে উঠতে গিয়ে তার পা পিঁছলে গেল এবং তিনি জেগে উঠলেন; দেখলেন যে তিনি তার ড্রয়িং রুমে বসে আছেন।

গল্পটিতে স্বপ্নের কৌশলটি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে দেখা যাক। প্রথমতঃ স্বপ্নের মাধ্যমে বাস্তব জগতের সঙ্গে স্বপ্ন জগতের, তথা আদর্শ জগতের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। আদর্শ জগৎ মনোহর; এখানে কোন ধূলো-বালি নেই, কাদা নেই, চারিদিকে ফুলে-ফলে ভরা। কোন অপরাধ নেই, কোন রক্তপাত নেই, কোন অভাব-অনটন নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে জীবন সহজ, সুন্দর, সুখ-শান্তিতে ভরপুর। তবে সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এখানে নারীরাই সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এই জগতের উপস্থাপনার মধ্যে পুরুষ শাসিত সমাজের একটা নেতিবাচক চিত্র ফুটে উঠেছে। শুধু তাই না, পুরুষদেরকে অলস, অকর্মণ্য, অপদার্থ, অপরাধপ্রবণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের সমালোচনা সুলতানা নিজে সরাসরি করতে পারতেন না। করলে পুরুষরা তার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতো। কিন্তু

www.pathagar.com

এক বিদেশীনীর মুখ দিয়ে এসব কথা উচ্চারণ করাতে কেউ আপত্তি উঠাতে পারে না। অনেক লেখক এই কৌশল অবলম্বন করেন। Gulliver's Travels-এর লেখক Swift Bobelignag এর রাজার মুখ দিয়ে ইংরেজদের the most pernicions Vomin that ever crawled upon the earth বলে উল্লেখ করেছেন। তবে আলোচ্য গল্পের বিদেশী মহিলা শুধু সমালোচনা করেননি, তিনি একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা পেশ করেছেন। বস্তুতঃ তিনি একটি আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা এঁকেছেন, যার নাম দেওয়া হয়েছে Lady land. এর মধ্যে অবাস্তবতা আছে, কিন্তু সেটা পাঠককে বিব্রত করে না, কারণ প্রথমতঃ এটা একটা স্বপ্ন জগৎ; দ্বিতীয়তঃ এই জগৎকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য একটি কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। সেটি হলো এই জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। Gulliver's Travels-এর অবাস্তব জগৎকে Swift ঠিক একই কৌশল অবলম্বন করে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ স্বপ্ন জগতের বিবরণের মাধ্যমে লেখিকা নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন। সরাসরি বক্তব্য সাংবাদিকতা বা প্রপাগাণ্ডার পর্যায় পড়ে; কিন্তু বক্তব্য যখন অপ্রত্যক্ষভাবে গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় তখন তা সাহিত্য হয়ে ওঠে। 'Sultan's Dream'-এর মর্মকথা গল্পের আকারেই প্রকাশ পেয়েছে। কি সে মর্মকথা? এর মর্মকথা এই যে নারীরা তুচ্ছ নয়; তাদের মধ্যে সৃজনীশক্তি আছে, উদ্ভাবনী শক্তি আছে এবং তারা সুযোগ পেলে পুরুষদের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে দেশ ও জাতির সেবা করতে পারে। কিন্তু নারীরা সে কথা জানে না। গল্পের সুলতানা আত্মবিস্মৃত ছিলেন, তিনি সমাজে তার অবস্থানকে মেনে নিয়ে দিন যাপন করছেন। কোন অভিযোগ করেননি, কোন আপত্তি তোলেননি। স্বপ্নের মাধ্যমে এই আত্মবিস্মৃত নারীর সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো।

গল্পটিতে লেখিকার হাস্যরসের ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। এখানে হাস্যরস আছে তাকে Situational humour বলা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমাজে নারী ও পুরুষের যে ভূমিকায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, গল্পে তা সম্পূর্ণ ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। যে পুরুষরা নারীদের অন্তঃপুরে রেখে দিয়ে তাদের অধিকারকে পদদলিত করেছে, প্রবল দাপটের সঙ্গে কর্তৃত্ব করে আসছে, তারা নারী নেতৃত্ব মেনে নিয়ে অন্তঃপুরে অবস্থান করছে, আর নারীরা পুরুষদের স্থান দখল করে নিয়েছে। এই অবস্থায় পুরুষরা কি করুণা জাগায়, না হাসির উদ্রেক করে?

www.pathagar.com

সে যুগের এক নারী-মুক্তিযোদ্ধা বেগম রোকেয়া

ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

বিগত শতাব্দীর মহিয়সী এক নারী– নারী জাগরণের অগ্রদূত প্রবাদতুল্য নাম– বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, রংপুরের পায়রাবন্দে যাঁর জন্ম ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮০ এবং মৃত্যু কলকাতায় ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩২। আমাদের বিজয়ের মাসে। বর্তমান রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে তাঁর জন্ম হলেও জীবনের প্রায় দীর্ঘ সময়ই কেটেছে কলকাতায়– তাঁর স্বপ্নের সাখাওয়াত হোসেন বালিকা বিদ্যালয়টি নিয়ে– সেই অন্ধকার দিনে– যখন মুসলিম সমাজে নারীদের তেমন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলই না বলা চলে। তাঁর পিতার নাম ছিল জহীর উদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের– তিনি ছিলেন ঐ অঞ্চলের ব্রিটিশ সনদ প্রাপ্ত জমিদার– আরবী ফারসী ও উর্দূ ভাষায় ছিলেন পারদর্শী এবং গৃহেও উর্দূ ভাষাই সর্বদা ব্যবহৃত ছিল। প্রাচীন খানদানী শরিয়তী পরিবারে তখন এটাই ছিল রীতি। বাংলা বা ইংরেজির ছিল না পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রচলন এবং ঐ দুই ভাষার চর্চা করাও ছিল পরিবারে নিষিদ্ধ। বেগম রোকেয়ার মা ছিলেন বলিয়াদির জমিদার কন্যা [বর্তমান টাংগাইল] এবং পরে তাঁর ভগ্নি করিমুন্নেসারও [১৮৫৫-১৯২৬] বিবাহ হয় টাংগাইল দেলদুয়ারের বিখ্যাত গজনবী জমিদার পরিবারে। অন্য আরেক বোনের নাম ছিল হোমেরা সাবের– যদিও তাঁর বিস্তৃত পরিচয় অস্পষ্ট– সম্ভবত অল্প বয়সেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এই পরিবারে পাঁচ বছর বয়সেই মেয়েদের পর্দা করতে হত– বোরকা পরতে হত এবং মা দাদী নানী ছাড়া অন্য মহিলাদের সামনেও যাওয়া ছিল নিষিদ্ধ– যার বিবরণ রোকেয়ার গ্রন্থেই আছে। তাঁর অন্যান্য ভাইদের নাম ছিল আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবের– কনিষ্ঠ ভ্রাতা খলিলুর রহমান আবু জায়গাম সাবের। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবু ইব্রাহিম সাবেরের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে- যিনি কলকাতায় পড়তেন, তার কাছে ঘরে অতি গোপনে বাংলা ও ইংরেজির পাঠ নিত দুই ভগ্নি– পরে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি পড়ে বাংলা ও ইংরেজিতে কিছু কিছু জ্ঞানার্জন করেন। এই পরিবারে বাল্য বিবাহের প্রচলন থাকলেও রোকেয়ার বিবাহ হয় ১৮৯০ সালে প্রায় ১৮ বছর বয়সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বি-এ, এম. আর, এ. এস.,

www.pathagar.com

ভাগলপুরের অবাঙালী এবং বিলাত ফেরত এবং আধুনিক মনা- সাহিত্য ও বিদ্যানুরাগী খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। যিনি ছিলেন বিপত্নীক এবং তখনই তাঁর বয়স ৪০ বছর। স্বামীর সঙ্গে চাকুরী সূত্রে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে দেশ, দেশের সংস্কৃতি এবং নারী জাতির দূর্গতি তিনি নিজের চোখেই দেখেন। জানা যায় এই সময় তার দুটি কন্যা সন্তানও জন্মগ্রহণ করে- যার একজন ৪ মাস ও অন্যজন মাত্র ৫ মাস বয়সে মারা যান। পরবর্তীতে তার প্রতিষ্ঠিত রোকেয়া সাখাওয়াত স্কুলের ছাত্রীগণই হয় তার কন্যা প্রতিম। স্বামীর মৃত্যুর পর মাত্র ৫জন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে স্বামীর বাড়ির একাংশে রোকেয়া সাখাওয়াত স্কুল স্থাপিত হয়। ভাগলপুরে এক সৎকন্যার প্রতিকূলতার জন্য ১৯০৯ সালে স্কুলটি প্রথমে কলকাতার অলিউল্লাহ লেনে এবং পরে ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে [১৯১৩] এবং ১৯১৫ সালে লোয়ার সার্কুলার রোডে এবং পরে স্থায়ীভাবে ১৭নং লর্ড সিংহ রোডে আরও জায়গা কিনে [যা এখন একটি সরকারী বিদ্যানিকেতন]। স্বামীর দেয়া মাত্র ১০ হাজার টাকা সম্বল করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে মুসলমান মেয়েদের অন্ধ অবরোধ থেকে আলোর জগতে টেনে আনতে তাঁর অবদান রূপকথার মতই অবিশ্বাস্য। স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেও মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার ভুবনে টেনে আনতে বিভিন্ন-পত্রিকা, ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে খাওয়াতনে ইসলাম' এবং 'নিখিল ভারত মুসলিম সমিতির সভায় তাঁর যুক্তিপূর্ণ ভাষণ; কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহের দুঃসাধ্য সাধনা- সে এক বিরাট ইতিহাস এবং তা বিভিন্ন গ্রন্থে দেশে বিদেশে শ্রদ্ধার সঙ্গেই লিখিত হয়েছে- হচ্ছে। তাঁর স্মৃতিতে হয়েছে স্কুল। মেয়েদের হল এবং আজ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও প্রবর্তিত। তখনকার যুগের 'নবপ্রভা' ও 'মহিলাঙ্গনে' ১৯০০ সালে সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রবাসী প্রকাশ পায়- লেখিকা হিসাবে নাম ছিল মিসেস আর. এস. হোসেন। তাঁর লিখিত এবং প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে [১] প্রবন্ধ- মতিচূর ১ম খণ্ড [১৯০৫], ২য় খণ্ড [১৯২১];

[২] নাটক- Sultana's Dream [সুলতানাস ড্রিম; ১৯২১];

[৩] উপন্যাস- পদ্মরাগ [১৯২৪], অবরোধ বাসিনী [১৯২৮]; ডেলিসিয়া হত্যা [ইংরেজি]; সুলতানার স্বপ্ন [ইংরেজী গ্রন্থের সহজ অনুবাদ]- তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী যা বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে আমার কার্যকালে [১৯৬৮-৭২] স্মারক প্রকাশ করতে সমর্থ হই। এ ছাড়াও তার বিভিন্ন প্রবন্ধ [বাংলা ও ইংরেজি] সে যুগের কলকাতায় ও ইংল্যান্ডে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এখনও অযত্নে ছড়িয়ে আছে, লন্ডনের ইন্ডিয়া লাইব্রেরীর পাঠাগারে এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব- যদি আমাদের কোন ছাত্রী ডক্টরেট পর্যায়ে কাজ করেন- এবং কলকাতার রোকেয়া সাখাওয়াত স্কুল-এ গিয়েও পুরাতন ফাইলপত্র পরীক্ষা করেন- যে বিষয়ে আমার সার্বিক সাহায্য দিতে আমি প্রস্তুত এবং এ বিষয়ে কলকাতার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট পর্যায়ের পরীক্ষা নিতে গিয়ে কয়েকজন ছাত্রীকেও বলেছি।

কলকাতার অদূরে শোধপুরের আমবাগানে তাদের পরিবারের নিজস্ব পারিবারিক গোরস্থানে [বাগানবাড়ি] ৯ই ডিসেম্বর [১৯৩২] তাঁকে সমাধিস্ত করা হয় এবং পরদিন কলিকাতার আলববি হলে যে নাগরিক শোক সভা হয় তাতে কবি নজরুলসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন এবং তা পরদিনের [এবং পরের সপ্তাহেও] বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিপুলভাবে প্রচারিত হয়- সেসব পত্রিকা কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে সম্ভবত সংরক্ষিত আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য- কলকাতায় অবস্থানকালে তাঁর বিত্তশালী জ্যেষ্ঠা ভগিনী দেলদুয়ার [টাংগাইলের] জমিদার বেগম করিমুন্নেসাও ছিলেন তাঁর সর্বসময়ের উৎসাহ দাতা [মৃত্যু-১৯২৬]; দুই সন্তানের [আবদুল হালিম ও আবদুল করিম গজনবী] শিক্ষার স্বার্থে তিনি কলকাতায়ই অবস্থান করতেন। উল্লেখ্য বেগম রোকেয়ার

www.pathagar.com

জীবনকাহিনী যেমন এখনও অনুদঘাটিত– তেমনই অনুদঘাটিত কবি বেগম করিমুন্নেসার সাহিত্য সাধনার ইতিহাস, যিনি সে যুগের 'নবনূর' প্রভৃতি পত্রিকাসহ তাঁদেরই অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত 'মিহির ও সুধাকর' [১৮৯৫; সম্পাদক– শেখ আবদুর রহীম]সহ 'হাফেজ' [১৮৯৭], 'মোসলেম প্রতিভা', 'মোসলেম মহিয়ষী' [১৯১১], 'আখবারে ইসলামিয়া [১৮৮৩], 'আহমদী' [১৮৮৬] প্রভৃতি পত্রিকায় উভয় ভগ্নীর রচনাই প্রকাশিত হতে থাকে– যে-সব তথ্য এখনও অজ্ঞাত।

বেগম রোকেয়ার পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত পায়রাবন্দ আমার প্রথম দর্শনের সৌভাগ্য হয় ১৯৮৯-তে ডিসেম্বর মাসে 'বিসিক' আয়োজিত রংপুর শহরে প্রধান অতিথি হয়ে– শেষে মেলায় গিয়ে। 'বাসসের' রংপুর প্রতিনিধি এবং অন্যান্য স্থানীয় সাংবাদিকগণসহ একদিন রওনা হওয়া গেল রংপুরের পূর্বদিকে মাত্র ১০ কি. মি. দূরে মিঠাপুকুর থানার উত্তর দিকে পায়রাবন্দ গ্রামে– একটি পরিত্যক্ত বাড়ির ভিটে, যা নাকি একদা ছিল তিন তলা প্রাসাদ– ছিল জমিদারী কাচারী এবং বৈঠকখানা। ইটগুলি শূন্য ভিটার চারদিকে ও দক্ষিণের ফসলের খেতে তখনও ছড়ানো ছিটানো সম্ভবত বিক্রি হয়ে গিয়েছিল– শুধুমাত্র ভিটেটিই ছিল সর্ব দক্ষিণে 'টি অক্ষরের মত কুলুঙ্গিসহ একটি অতিজীর্ণ প্রাচীর মাত্র দাঁড়িয়ে– যা রোকেয়ার জন্মস্থান হিসাবে আজও দেখানো হয়– যদিও সত্যতা প্রশ্ন সাপেক্ষ কারণ চাক্ষুস সাক্ষীতে পাওয়া যায় নাই। রোকেয়া বিবাহের পর [১৮৯৮] তিনি একবারের জন্যও পিতৃভূমি পায়রাবন্দে একা বা স্বামীসহ বেড়াতে আসেননি বা তার পিতা-মাতা পায়রাবন্দ ছেড়ে স্থায়ীভাবে কলকাতার বাসিন্দা হয়েছিলেন। এমন তথ্য আমাদের হাতে নাই। উল্লেখ্য রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসারও বিবাহ বাসর হয় কলকাতায় নিজস্ব বা ভাড়া করা কোন বাড়িতে তাঁদের পারিবারিক কবরস্থানও কলকাতার অদূরে শোধপুরের বাগান বাড়িতে [যেখানে বাবা-মা নাকি থাকতেনও] সেখানেই তাঁর বাবা-মা এবং ভাইদেরও সম্ভবত কবর– যা নাকি এখন বেদখল– কবরের কোন নিশানা নেই– একবার বেনাপোল থেকে গাড়িতে কলকাতা যেতে [১৯৮৮] লোকজনদের জিজ্ঞাসা করেও জানা যায় নাই– যদিও আম বাগানটি ছিল ঘন গাছে পূর্ণ। রোকেয়া স্মৃতি স্কুলটি [পায়রাবন্দ] তখন দেখেছিলাম টিনেরই– কয়েকশত ছাত্রী– প্রধান শিক্ষক বলছিলেন তখন ওখানে বাল্যবিবাহের খুবই প্রচলন ছিল– মানুষের অবস্থা ছিল অসচ্ছল– ৭০ বছরের বৃদ্ধের সঙ্গেও নাকি ১৫/১৬ বছরের মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়– সে মেয়েরা আর স্কুলে আসে না। গরু-ছাগলের চারণভূমি রোকেয়ার জন্মস্থানটি দেখে খুবই মর্মাহত চিত্তে সেবার ফেরৎ আসি সেদিন।

আর একবার ২৭ অক্টোবর [৯৯] আব্বাস উদ্দিন শতবার্ষিকী উপলক্ষে এসে– সকাল বেলাতেই রওনা হলাম, সঙ্গে শিল্পী পুত্র মুস্তফা জামান আব্বাসী এবং তাঁর স্ত্রী কবি অধ্যাপিকা আসমা আব্বাসী। সকাল বেলার শিশির বিন্দুতে ঝলমল মাঠ-ঘাট এবং বৃক্ষরাজি বামে মোড় নিতেই ঢুকে গেলাম পায়রাবন্দের ভিটায়। পূর্বের সেই স্কুলটি আছে– তবে আরও বিস্তৃত। তার পাশেই এখন হয়েছে দ্বিতল রোকেয়া স্মৃতি কলেজ– আপাতত দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত– হয়তো এতোদিনে ডিগ্রীতে উন্নীত। পশ্চিমের ভিটেটি এখন প্রাচীর বেষ্টিত, আছে সুদৃশ্য ফটক– নেতৃদের নামে নামে লাগানো হয়েছে বহু মূল্যবান বৃক্ষরাজি– হয়েছে একটি মঞ্চ কিন্তু 'আতুরঘর' বলে কথিত 'টি'শেপ অংশটি পূর্ববৎ কোন সংস্কারের ছোঁয়া তখনও লাগেনি সেখানে। দক্ষিণে প্রাচীরের বাইরে গড়ে উঠেছে একটি দ্বিতল দালান– 'ছহি কোরান শিক্ষা কেন্দ্র, হস্ত ও কুটির শিল্প কেন্দ্র– নিচ তলায় একটি পাঠাগার [প্রকল্প নেয়া হয়েছে এখানে একটি 'রোকেয়া কমপ্লেক্স করার– যার ভার দেয়া হয়েছিল বাংলা একাডেমীকে– যদিও রোকেয়া পরিবারের স্মৃতির সেই বিরাট উত্তরে পুকুরটি [যা গতবারেও দেখে গিয়েছিলাম ছবিও তুলেছিলাম ভগ্ন ঘাটের– শুনলাম তা কুচক্রীদের

www.pathagar.com

কারণে এখন হাতছাড়া– তাতে নাকি হবে ধান চাষ। এখন এখানে একটি রেস্ট হাউস হয়েছে– আসে বিভিন্ন পিকনিক পার্টি আসেন দর্শকবৃন্দ– ইচ্ছা করলে রাতও কাটানো যাবে।

পূর্বেই বলেছি– রোকেয়ার পিতা জহির উদ্দীন মোহাম্মদ সাবের রোকেয়ার বিবাহের সময় [১৮৯৮] বা পরে দুইপুত্র এবং বড়কন্যা [বিধবা] করিমুন্নেসাসহ সম্ভবত পায়রাবন্দের জমিদারীর একটা বিলি ব্যবস্থা করে চিরতরে কলকাতা বা বারাসতবাসী হয়েছিলেন, দুই ছেলে আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবের ও খলিলুর রহমান আবু জায়গাম সাবের কলকাতায় কি করতেন সে তথ্য আমাদের পক্ষে যোগাড় করা সম্ভবপর হয় নাই। কেনই বা রোকেয়ার পিতা ত্রিতল জমিদার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন– নাকি জমিদারী নিলাম হয়ে যাচ্ছিল। হয়তো এই বাড়ি এবং জমিদারী ছাড়া তাদের অন্য কোন জমিদারী [Land Property] ছিল না– কারণ আগের দিনের জমিদারগণ জোতদার হতে চাইতেন না ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কারণ থাকতে পারে। ড. মালিহা খাতুনের গ্রন্থ থেকে [সাখাওয়াৎ স্কুল ও বেগম রোকেয়ার কিছু স্মৃতি: ঢাকা, ১৯৯৫] তথ্য পাওয়া যাচ্ছে রোকেয়ার পিতা মোহাম্মদ সাবেরের আরও তিনজন স্ত্রী ছিলেন এবং তারা পূর্বাপর পায়রাবন্দেই বাস করেছেন, তাঁদের কবরও এখানেই এবং সেই তিন স্ত্রীর উত্তর পুরুষগণ এখনও আছেন– চরম দারিদ্র্য জর্জরিত। রোকেয়ার বৈমাত্রেয় ভাই ইয়াকুব আলী চৌধুরী চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মারা গেছেন, তার স্ত্রী মাজেদা সাবের চৌধুরী 'রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্রের' কর্মীবৃন্দের দয়ায় একটি ভিজিডি কার্ড পেয়েছেন। আছেন রজিনা সাবের চৌধুরী– বৈমাত্রেয় ভাই মশিউজজামান সাবের চৌধুরীর মেয়ে– ম্যাট্রিক পাশ করে পায়রাবন্দ বিদ্যালয়ে এখন শিক্ষিকা [যাঁর সঙ্গে আমার দেখাও হয়]; স্বামী নাজমুল হক বুলু কৃষিজীবি– বড় মেয়ে তখন বি.এসসি পড়ছিল– অন্য ছেলেটি তখন অষ্টম শ্রেণীতে। রোকেয়ার আরেক বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে সোলেমান সাবের চৌধুরী একটি কুড়ে ঘরে বসে দর্জির কাজ করেন। আলেকজান্ডার সাবের চৌধুরী আলী সাবের চৌধুরী, [আলী সানুর ছোট ভাই] পায়রাবন্দে রাস্তার ধারে সাইকেল ও রিক্সা মেরামত করে সবাই অতিকষ্টে সংসার চালান [যা আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শনে এবং প্রশ্নোত্তরে পাওয়া গেছে– যদিও তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতে চান না]। আমাদের প্রশ্ন– সাবের চৌধুরী রোকেয়া, তাঁর বড়বোন করিমুন্নেসা এবং দুই ভাইসহ [কলকাতা বা বারাসত] চলে গেলেন কিন্তু অন্য বিবাহিত তিন স্ত্রীকে এভাবে অসহায়া অবস্থায় ফেলে গেলেন কেন? বেশ বুঝা যাচ্ছে এঁদের কোন পৌত্রিক খাস জমি [Land property] ছিল না এবং এঁরা কেউই স্বামী বা পিতার পৈত্রিক ভিটায়ও [ত্রিতল দালান] থাকতেন না– কেন? এ প্রশ্নের উত্তর জীবিত উত্তরাধিকারদের জিজ্ঞাসা করলে আবিষ্কৃত হতে পারে– যে দায়িত্ব রংপুর শহরের সাংবাদিকদের।

আমরা এরপর রোকেয়া স্মৃতি কলেজে গেলাম সুসজ্জিত শ্রেণীকক্ষে চমৎকার পাঠাগার, দেখা হল শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে রায়হানুল কবির, মাহফুজা বেগম, শহিদুল ইসলাম, মোঃ রুহুল আমিন, হিরন্ময় অধিকারী, তারকচন্দ্র বর্মন, আসমা খাতুন, নুরুন নাহার এবং অন্যান্যদের সঙ্গেও। ১৯৮৯-এ যাদের দেখে গিয়েছিলাম– এরা তাদের থেকে অনেক আধুনিকা বলে মনে হল। কলেজের ফলাফল ভালো– তবে বাল্য বিবাহের নমুনা কলেজেও দেখা গেল– হয়তো কম। আব্বাসী হারমোনিয়াম সহযোগে এবং ছাত্রীদের ভাওয়াইয়া গানের মধ্য দিয়ে পরিবেশ আনন্দময় হয়ে উঠলো। বললাম– আবার আসবো– পড়ো মন দিয়ে পড়াশোনা শেষ না হলে বিয়ের

www.pathagar.com

পীড়িতে বসবে না, পরিস্থিতি খারাপ হলে একটা পোস্ট কার্ড লিখবে সাড়া দেব। এইতো মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে ঐতিহ্যবাহী কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ– তা হয়তো কালে বিশ্ববিদ্যালয়ও হয়ে যাবে– একদা উচ্চশিক্ষা নেবে সেখানে গিয়েও। হয়তো কালে এটিও হবে রোকেয়া মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রীদের সেদিনের আপ্যায়ন ছিল অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। তাদের কেউ কেউ এখনো নববর্ষে কার্ড পাঠায় আমিও উত্তর দিই।

ফেরত পথে যেতেই হল স্কুল বিভাগে। প্রধান শিক্ষক মোঃ ইদ্রিস আলী মণ্ডল ও সাবের পরিবারের পূর্বোক্ত বঞ্চিতা আবার চা না খেয়ে উঠতেই দিলেন না– পূর্বেই তারা খবর পেয়েছিল।

যে রোকেয়া কমপ্লেক্স হবে। কোটি টাকা নাকি ব্যয় হবে– সেই পরিবারেই মানবেতর জীবন যাপনকারী মানুষগুলির জন্য কোন খাস জমিদান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনার জন্য ব্যাংক ঋণ অগত্যা এখানে প্রস্তাবিত কমপ্লেক্সে [Rokeya Memorial Comlex] কোন চাকুরীর ব্যবস্থা করা যায় কিনা [অগ্রাধিকার ভিত্তিতে] এটা দেখা রোকেয়া ভক্ত দেশবাসী এবং সরকারের দায়িত্ব বলে মনে করি।

আমরা ফিরে এলাম।

পেছনে পড়ে রইলো রোকেয়া স্মৃতির পায়রাবন্দ। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রীরা গাড়ি পর্যন্ত এলো– তোলা হল বহু ছবি– থাকলো স্মৃতি হয়ে।

HABIB TRADE SYNDICATE DISTRIBUTORS :
KALLAL GROUP OF
AMIN MANUFACTURING
INTERNATIONAL TRADE CORP.
HAMDARD LABROTORIES
KOREA BANGLADESH

152, EAST KAFRUL DHAKA- CANTT.

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়া ঃ নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও উন্নয়ন

মোতাহার হোসেন সুফী

নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনায় সর্বপ্রথমে শ্রদ্ধার্ঘ্য যাঁর প্রাপ্য তিনি নারী জাগরণের অগ্রদূতী মহীয়সী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বেগম রোকেয়ার আবির্ভাবলগ্ন–সে এক অন্ধকার যুগ। উনিশ শতকের শেষভাগে ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জমিদার সাবের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বেগম রোকেয়া। পায়রাবন্দ গ্রাম ও জমিদার বাড়ির পরিবেশ বর্ণনা করে বেগম রোকেয়া বলেছেন, ".....আমাদের এ নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত বাড়ীর তুলনা কোথায়? ..... বাড়ীর চতুর্দিকে গভীর বন, তাহাতে বাঘ, শুকর, শৃগাল– সবই আছে। আমাদের এখানে ঘড়ি নাই, সেজন্য আমাদের কোন কাজ আটকায় না। প্রভাতে আমরা 'ঘুঘু', 'বউ কথা কও', 'ওখুকি, ওখুকি', 'চোক গেল' প্রভৃতি পাখীর ভৈরবী আলাপে শয্যাত্যাগ করি। সন্ধ্যাকালে শৃগালের 'হুয়া হুয়া কাও হুয়া' শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারি, মাগরেবের নামাজের সময় হইয়াছে। রাত্রিকালে কুরুয়া পাখির 'কা-এ্যাক-কা –একে-কু' ডাক শুনিয়া বুঝিতে পারি, এখন রাত্রি তিনটা। আমাদের শৈশবজীবন পল্লীগ্রামের নিবিড় অরণ্যে পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে।" বেগম রোকেয়ার বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ের অকপট বর্ণনা– আধুনিক জীবনের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এক অজ পাড়াগাঁয়ে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর শৈশব জীবন। ইংরেজ আমলে বাংলার অগণিত গ্রামের ন্যায় রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রাম ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির আশা থেকে বঞ্চিত। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবার সাবের পরিবারে ছিল পর্দাপ্রথার বাড়াবাড়ি। পর্দাপ্রথার নামে কার্যত ছিল অবরোধ প্রথা। এই অবরোধের বন্ধন ছিল কঠোর। শুধু পুরুষ মানুষ নয়; আত্মীয়া মহিলাদের সম্মুখেও সাবের পরিবারের মেয়েদের পর্দা করতে হতো। এই পরিবারের অবিবাহিতা কোন মেয়ে এমন কি সে শিশুকন্যা হলেও তাকে বাড়ির চাকরানী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোক দেখতে পেত না। পরিবারের মেয়েদের মতো বেগম রোকেয়াও তাঁর শৈশবে কার্যত ছিলেন গৃহবন্দিনী। স্বীয় শৈশব জীবনের বন্দীদশার তিক্ত স্মৃতির উল্লেখ প্রসঙ্গে 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে তিনি বলেন– 'অপরের কথা দূরে থাকুক। এখন নিজের কথা কিছু বলি। সবেমাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও

www.pathagar.com

পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই, অথচ পর্দা করিতে হইত। পুরুষদের তো অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ. সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়ে মানুষের অবাধ গতি– অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত; অমনি বাড়ীর কোন লোক চক্ষু ইশারা করিত, আমি যেন প্রাণ ভয়ে যত্রতত্র– কখনও রান্নাঘরে ঝাঁপির অন্তরালে, কখনও কোন চাকরাণীর গোল করিয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নিচে লুকাইতাম।" অন্যত্র বেগম রোকেয়া বলেছেন– "অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘণিষ্ঠ আত্মীয় এবং বাড়ীর চাকরাণী ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোক দেখিতে পায় না।'

সাবের পরিবারে পর্দার নামে অবরোধের কঠোরতার কারণে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সকল পথ ছিল রুদ্ধ। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামল। শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন নিপীড়িত দেশবাসী। পরাধীনতার অক্টোপাশ শৃঙ্খলে নিবিষ্ট পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা ছিল অবহেলিত, উপেক্ষিত ও বঞ্চিত। মুসলমান সমাজের অর্ধাংশ নারী সমাজের অবস্থা ছিল সর্বাধিক শোচনীয়। জাতীয় জাগরণে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বোচ্চ হওয়া সত্ত্বেও বেগম রোকেয়ার আবির্ভাবকালে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার আলোদান করার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি পুরুষ সম্প্রদায়। সে সময়ে শিক্ষার্জন মুসলমান সমাজের এক সংকীর্ণ গণ্ডি আশরাফদের মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ। মুসলমান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ছিল আতরাফ। তারা ছিল নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার অন্ধকারে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর বিষয়টিও ছিল গুরুত্বহীন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা বলতেন– 'লেখাপড়া শিখিয়া মেয়ে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হইবে।' আশরাফ তথা অভিজাত মুসলমান পরিবারের মেয়েদের ন্যায় সাবের পরিবারের মেয়েদের ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানদানের জন্য আরবি ভাষা শিক্ষা নয়, ব্যবস্থা ছিল শুধু কুরআন পাঠ করানোর। এর অর্থও তাদের শেখানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজি বর্ণ পরিচয় দূরের কথা মাতৃভাষা বাংলাও মেয়েদের শেখানো ছিল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বাঙালি মুসলমান সমাজের অন্যান্য দুর্ভাগিনীর ন্যায় কোন বিদ্যায়তনে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাননি বেগম রোকেয়া। শৈশবে তিনি যেটুকু লেখাপড়া শিখেছেন তা সম্ভবপর হয়েছে গৃহের সীমাবদ্ধ পরিসরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে। স্বীয় জীবনের বেদনাময় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বেগম রোকেয়া বলেন– 'বালিকা বিদ্যালয় বা স্কুল-কলেজ গৃহের অভ্যন্তরে আমি কখনও প্রবেশ করি নাই, কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয়-স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান করিবেন দূরে থাকুক, বরং নানাপ্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন– কিন্তু তথাপি আমি পশ্চাৎপদ হই নাই।'

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ না করেও কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখে সেই অন্ধকার যুগে বেগম রোকেয়ার মত কিভাবে জ্ঞানের, শিক্ষার ও স্বাধীন চিন্তার আলোকে আলোকিত হয়েছিল সে কথা আজ ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

ইংরেজ শাসনে 'বিভেদ করে শাসন কর' নীতির বিষময় প্রতিক্রিয়ায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় ছিল পশ্চাৎপদ। বিশ শতকের শুরুতে মুসলমান সমাজে জাগরণের সাড়া সৃষ্টি হল 'অল ইন্ডিয়া মোসলেম লীগ', 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, অনুষ্ঠিত হয় 'অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স'। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল মুসলমান পুরুষ সম্প্রদায়ের মধ্যে। সমাজের ধর্মান্ধ ব্যক্তিবর্গ এবং রক্ষণশীল সমাজপতিগণ ছিলেন নারী শিক্ষার বিরোধী। নারী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা যে বাঙালি

www.pathagar.com

মুসলমান সমাজের অবনতি, দুরবস্থা, ও দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী– সে সম্পর্কে জোরালো ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন বেগম রোকেয়া। নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, "মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রীশিক্ষায় ঔদাস্য। ভ্রাতৃগণ মনে করেন, তাঁহারা গোটাকতক আলীগড় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর করিয়াই পুলসিরাত [পারলৌকিক সেতু বিশেষ] পার হইবেন– আর পার হইবার সময় স্ত্রী ও কন্যাকে হ্যান্ডব্যাগে পুরিয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার বিধান যে অন্যরূপ– সে বিধি অনুসারে প্রত্যেককেই স্ব স্ব কর্মফল ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং স্ত্রীলোকদের উচিত যে, তাঁহারা বাক্স-বন্দী হইয়া মালগাড়িতে বসিয়া স্বশরীরে স্বর্গলাভের আশায় না থাকিয়া স্বীয় কন্যাদের সুশিক্ষায় মনোযোগী হন।"

নারী শিক্ষা বিরোধী একদেশদর্শী চিন্দাধারাকে পরিহাস করে 'সিসেম ফাঁক' [শিক্ষা] প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া বলেছেন, ".....প্রকৃত মুক্তির দ্বার উদঘাটনের মন্ত্রটি অর্থাৎ স্ত্রী-শিক্ষার বিষয় ভুলিয়াছিলো বলিয়া আমি মৃদু হাস্য করিতাম। মনে মনে বলিতাম ভ্রাতঃ যাহাই করুন না কেন এ রত্ন সম্ভার লইয়া সওগাত দিতে যাইবেন কোথায়? দ্বার যে বন্ধ। গৃহে যে গৃহিনী, ধর্মে যে সহধর্মিনী, ভাবী বংশধরের যে জননী, ভবিষ্যৎ আশা ভরসার যে রক্ষয়িত্রী ও পালনকর্ত্রী তাহাকে সঙ্গে না লইলে আপনি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিবেন না। গরীবের কথা বাসি হইলে ফলে; আমার কথাও [১০/১২ বৎসরের] বাসি হইয়া ফলিয়াছে।

এখন মুসলমান সমাজ বুঝিয়াছে, 'স্ত্রী শিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই।'

মুসলমান নারী সমাজের কুসংস্কার, সংকীর্ণচিত্ততা ও কুপমণ্ডুকতার মুখ্য কারণ যে শিক্ষার অভাব– সে সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য বেগম রোকেয়া তাগিদ দিয়েছেন 'রোকেয়া' প্রবন্ধে। নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেছেন, 'সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সংকীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধ থাকার জন্য হয় নাই, শিক্ষার অভাবে হইয়াছে। সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি এমন সঙ্কুচিত হইয়াছে।.....আমরা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবে না। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশামাত্র। আমাদিগকে সকল প্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে। শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতালাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইহাতে তাহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। তাই তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে ও উঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি ইতোপূর্বে বলিয়াছি যে, 'নর ও নারী উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।' এখনও তাহাই বলি এবং আবশ্যক হইলে ঐ কথা শতবার বলিব।'

মুসলমান সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁদের মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য টাকা খরচ না করে বাহুল্য অলঙ্কারের পেছনে খরচ করে থাকেন প্রচুর টাকা। উপরন্তু পর্দার অজুহাত সৃষ্টি করে মেয়েদের বঞ্চিত করা হয় লেখাপড়া শেখা থেকে। বেগম রোকেয়ার মতে, তাঁরা এই সত্য কথাটি বিস্মৃত হন যে, একটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পাঠ করলে যে অনির্বচনীয় সুখের আস্বাদ লাভ করা যায়, দশ রকমের অলঙ্কার পরিধান করলেও তার শতাংশের একাংশ সুখ পাওয়া যায় না। টাকার শ্রাদ্ধ করে বাড়ির মেয়েদের অলঙ্কারে ভূষিত না করার জন্য তিনি বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন। সেই সাথে বাহুল্য অলঙ্কারের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে মেয়েদের জ্ঞান-ভূষণে অলঙ্কৃতা করার জন্য পৃথকভাবে 'জেনানা স্কুল' প্রতিষ্ঠারও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র স্কুল-

www.pathagar.com

কলেজ স্থাপন করা হলে যথারীতি পর্দা বজায় রেখে মুসলমান সমাজের মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হবে বলে বেগম রোকেয়া দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন 'বোরকা' প্রবন্ধে।

নারী সমাজের পশ্চাৎপদতা ও দুরবস্থার একমাত্র প্রতিকার যে নারী শিক্ষার বিস্তার সে সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার মনের বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। ইতিহাস চেতনার আলোকে নারীর অবনত অবস্থার পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বেগম রোকেয়া বলেন, 'আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ এক প্রকার নাই।' নারীর অবনত অবস্থা তথা অধোগতির মূল কারণ শিক্ষাগ্রহণে নারীর অনাগ্রহ, সামাজিক বাধা তথা সমাজপতিদের রক্ষণশীল মনোভাব, প্রতিকূল পরিবেশ, শিক্ষাহীনতা ও উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন বেগম রোকেয়া।

সমাজের অগ্রগতির স্বার্থে পশ্চাৎপদতা, কুপমণ্ডুকতা, ধর্মান্ধতা ও প্রচলিত কুসংস্কারগুলো দূরীকরণের জন্যে প্রয়োজন নারী শিক্ষা। অথচ সমকালীন সমাজ ছিল প্রধানত নারী শিক্ষা বিরোধী– একথা আগেই উল্লেখ করেছি। নারী শিক্ষা বিরোধী মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করে বেগম রোকেয়া বলেন, 'স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা 'স্ত্রী শিক্ষা' শব্দ শুনিলেই 'শিক্ষার কুফলের' একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ 'শিক্ষার' ঘাড় চাপাইয়া দেয় এবং শতকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে, 'স্ত্রী শিক্ষাকে নমস্কার।'

আজকাল অধিকাংশ লোক শিক্ষাকে কেবল চাকুরি লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরি গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রী শিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।'

[স্ত্রী শিক্ষার অবনতি, বেগম রোকেয়া রচনাবলী পৃষ্ঠা ১৭-১৮]

সমাজে নারীশিক্ষার প্রতি যে মনোভাব বিরাজ করছে তার আশু পরিবর্তন কামনা করেছেন বেগম রোকেয়া। সমাজের উন্নতির স্বার্থে নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং নারী সমাজে শিক্ষার বিস্তারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রকৃত শিক্ষা কি? বেগম রোকেয়ার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, শুধু চাকুরিলাভ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য দেহ, মন ও আত্মার বিকাশ সাধন। নারীকে কোন ধরনের শিক্ষাদান করতে হবে সে সম্পর্কে বেগম রোকেয়া স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায়। শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '.....শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের 'অন্ধ অনুকরণ' নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা [faculty] দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি [develop] করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মন এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন [বা observe] করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি– তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল 'পাশ করা বিদ্যাকে' প্রকৃত শিক্ষা বলি না।' [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮] শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে– পশুর সাথে সৃষ্টি করে পার্থক্য। শিক্ষা ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত করে, প্রসারিত করে দৃষ্টি শক্তি– জাগ্রত করে বিবেকবোধ। শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তির দর্শনশক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটে। উদাহরণের সাহায্যে রোকেয়া বলেন, 'যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি, কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে [বিজ্ঞানের] শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের

www.pathagar.com

পদদলিত যে কাজকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবীদ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা– বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ [opal]; কর্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুত করণোপযোগী মৃত্তিকা অথবা নীলকান্ত মণি; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার।' [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮]

বাহ্যিক চোখ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তির একই রূপ হলেও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টি এক নয়। পৃথিবীর বস্তু নির্ণয়কে একজন কবি ও বিজ্ঞানবীদ যেভাবে উপলব্ধি কিংবা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম অশিক্ষিত ব্যক্তি চোখ থাকতেও সেরূপ ক্ষমতার অধিকারী নন। তাই নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নারীদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রোকেয়া বলেন, 'যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা মানিক দেখে। আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির-অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কি উত্তর দিব?' [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮]

বিবেকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অবনতির কারণসমূহ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে নারীসমাজ এবং উন্নতির জন্য চেষ্টা করা যে কর্তব্য সেই বোধও জাগ্রত হবে। রোকেয়া বলেন, 'আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি 'ভরসা কেবল পতিতপাবন', কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে [God helps those that help themselves]। তাই বলি আমাদের অবস্থা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।" [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা– ১৯]

পুরুষের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে দাসসুলভ মনোভাব নারীমনের গভীরে প্রবেশ করার ফলে দীর্ঘকাল ধরে নারী হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলো অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় 'দাসী' হয়ে পড়েছে নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবকিছু। নারীমনের তেজস্বিতা নেই, নারী সমাজে স্বাধীন চিন্তা নেই। নারীকে জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বেগম রোকেয়ার আকুল আহ্বান–

'অতএব, জাগ, জাগ গো ভগিনি।' প্রথমে জাগিয়া ওঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহাগোলযোগ বাধাইবে জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য 'কৎল'-এর [অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের] বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি!.....[এবং ভগ্নীদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি] কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই।" [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯-২০]

নারী ও পুরুষের সমন্বয়েই মানব সমাজ। সমাজের কল্যাণের স্বার্থে জনসমষ্টির অর্ধাংশ নারীকে জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল রোকেয়ার জীবনের মূল লক্ষ্য। নারীর স্বাধীনতা বলতে রোকেয়া কি বোঝেন? তাঁর নিজের কথা, 'স্বাধীনতা অর্থ পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে।' [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২০]

রোকেয়া আন্তরিকভাবে কামনা করেছেন জীবনের সকলক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে নারীর প্রাপ্য স্থান ও মর্যাদা। সে সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিই শুধু নয় নিশ্চেষ্ট নারীর অন্তরে বোধ, উপলব্ধি ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন রোকেয়া। নারীর উন্নতি অর্থে রোকেয়ার অভিমত পুরুষের সাথে সমকক্ষতা। তিনি বলেন, "নচেৎ কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা দিব? পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ। একটা পরিবারের পুত্র ও কন্যায় যে প্রকার সমকক্ষতা থাকা উচিত, আমরা তাহাই চাই। যেহেতু পুরুষ সমাজের পুত্র আমরা সমাজের কন্যা।"

পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য যা প্রয়োজন যোগ্যতা অর্জনে তা করার জন্য নারী সমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন রোকেয়া। তিনি বলেন, "পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য

www.pathagar.com

আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী– ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী– ব্যারিস্টার, লেডী– জজ সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে 'রানী' করিয়া ফেলিব।" তিনি বলেন, 'লেডী-কেরানী হওয়ার কথা কেবল বঙ্গদেশে যেমন shocking বোধ হয়, সেরূপ অন্যত্র বোধ হয় না। আমেরিকায় লেডী-কেরানী বা লেডী-ব্যারিস্টার প্রভৃতি বিরল নহে। এবং এমন একদিনও ছিল, যখন অন্যান্য দেশের মুসলমান সমাজে 'স্ত্রী কবি, স্ত্রী– দার্শনিক, স্ত্রী–ঐতিহাসিক, স্ত্রী–বৈজ্ঞানিক, স্ত্রী- বক্তা, স্ত্রী চিকিৎসক, স্ত্রী রাজনীতিবিদ' প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। কেবল বঙ্গীয় মোসলেম সমাজে ওরূপ রমণীরত্ন নাই।' [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা– ২১]

বিগত শতাব্দীতে ১৯৩২ সালে বেগম রোকেয়া পরলোকগমন করেছেন। বিগত শতাব্দীতে এবং বর্তমানেও প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করে আছেন নারী। বর্তমানে জাতীয় জীবনের প্রতিস্তরে প্রতিনিধিত্ব করার মতো মেয়েদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজনকে পাওয়া যায়। সাধারণ শিক্ষা, চিকিৎসা, আইন, কারিগরি শিক্ষা ও সেই সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন মুসলিম মহিলারা। উচ্চশিক্ষার কোনক্ষেত্রেই আমাদের দেশের মুসলিম মহিলারা আজ আর পিছিয়ে নেই। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে এখন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য কত রকমের সংগঠনই না গড়ে উঠেছে। মেয়েরা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও আজ এগিয়ে চলেছেন দৃঢ় পদক্ষেপে। নিজেদের প্রচেষ্টায় বেশ কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রচার করতেও তাঁদের আমরা দেখতে পাচ্ছি। মেয়েদের মধ্যে রয়েছেন অনেক কবি, সাহিত্যিক, গবেষক ও সাহিত্য সমালোচক। তাঁদের প্রচেষ্টায় উচ্চশিক্ষার অনেক প্রতিষ্ঠানও চালু রয়েছে আমাদের দেশে। শিল্প ও বাণিজ্যের সকল শাখাতেও মেয়েদের অগ্রগতি আজ লক্ষ্যযোগ্য। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বেগম রোকেয়ার মনোগত আশা পূরণ হয়েছে অনেকখানি। এখন পর্দাপ্রথার নামে অমানবিক অবরোধ প্রথা সমাজে আর চালু নেই। মেয়েরা স্বচ্ছন্দে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জন করার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি তথা নারী জাগরণ হঠাৎ করে আসেনি। মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও জাগরণের বাণী যিনি সর্বপ্রথম প্রচার করতে শুরু করেন সেই প্রাতঃস্মরণীয় যুগন্ধর মহিলা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

নারীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেই বেগম রোকেয়া স্বীয় জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ক্ষান্ত হননি, নারীশিক্ষার উন্নয়নে যুগের দাবি পূরণে গ্রহণ করেছেন তিনি সাহসী পদক্ষেপ। নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে নারীশিক্ষার উন্নয়ন সাধন ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা। স্বজাতির সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে নারীশিক্ষার উন্নয়নে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে মহীয়সী বেগম রোকেয়ার চিন্তা-ভাবনার সামঞ্জস্য দেখতে পাই।

স্বাধীনতাহারা ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে শিক্ষা-দীক্ষায় বঞ্চিত হয়ে হয়েছিল অধঃপতিত। স্বজাতির অধঃপতিত অবস্থা স্যার সৈয়দ আহমদকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। শিক্ষার মাধ্যমেই জাতীয় জাগরণ সম্ভব এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন শিক্ষা প্রচার আন্দোলনে। তাঁর এই শিক্ষা প্রচার আন্দোলন 'আলীগড় আন্দোলন' নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে বেগম রোকেয়া বাংলার মুসলমান নারীসমাজের অধঃপতিত অবস্থা দেখে হয়েছিলেন অত্যন্ত মর্মাহত ও ব্যথিত। দেশ ও জাতির স্বার্থে মুসলমান নারী সমাজের জাগরণের জন্য নারীশিক্ষার বিস্তার ও নারীশিক্ষার উন্নয়নে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

১৯০৯ সালের ৩রা মে। বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যরস পিপাসু স্বামী খানবাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন অকালে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন বিহারের ভাগলপুরের অধিবাসী। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। কৃষিশিক্ষার বৃত্তি নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এ., এম. আর. এ. এস। তিনি ছিলেন পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা -একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। স্বামীর অকালমৃত্যুতে স্বামী সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হবার পর পরলোকগত স্বামীর স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য ও সেই সাথে শিক্ষা প্রচারের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় তিনি প্রথমে ভাগলপুর মুসলিম বালিকাদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলটি স্থাপিত হয় তাঁর স্বামীর ইন্তেকালের প্রায় পাঁচ মাস পরে ১৯০৯ সালের ১লা অক্টোবরে। সে সময় স্কুলটির ছাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচজন। তাহলেও মনোবল হারাননি বেগম রোকেয়া। দুর্ভাগ্যক্রমে সপত্নী-কন্যা ও জামাতার কাছ থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। তাদের দুর্ব্যবহারে বেগম রোকেয়া অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। ভাগলপুরে স্বামীগৃহে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হলো না। তাঁর স্বামী মৃত্যুর পূর্বে নারীশিক্ষার উন্নয়ন অর্থাৎ মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য দশ হাজার টাকা দান করেন এবং স্ত্রী বেগম রোকেয়াকেই তিনি ট্রাস্টি মনোনীত করেন। এই বিপুল পরিমাণ টাকার জন্যই যে তাঁর সপত্নী কন্যা ও জামাতা প্রাণপণ বিরোধিতায় নেমেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। ফলে বেগম রোকেয়া বাধ্য হলেন ভাগলপুরের স্বামীগৃহ ত্যাগ করতে। ১৯১০ সালের শেষভাগে তিনি ভাগলপুর পরিত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। বস্তুত কলকাতায় আগমন তাঁর জীবনের পক্ষে শুভই হয়েছিল। এইখানেই তাঁর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল পরিপূর্ণভাবে। কলকাতায় চলে আসার পর তিনি ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে নতুন উদ্যমে স্বল্পসংখ্যক ছাত্রী নিয়ে ১৩নং অলীউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ক্লাশ শুরু করেন। এর পূর্বে কলকাতায় মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার জন্য মাত্র দুটো স্কুল ছিল বলে জানা গেছে। কলকাতায় প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়টি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত হয়েছিল মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম ফেরদৌস মহলের পৃষ্ঠপোষকতায়। ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল মুসলমান মেয়েদের দ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোহরার্দ্দীয়া বালিকা বিদ্যালয়। প্রসিদ্ধ বাঙালি মুসলিম জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীর মাতা সমাজকর্মী খুজিস্তা আখতার বানু ছিলেন উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নারীমুক্তি সাধনে স্কুল দুটির ভূমিকা কিরূপ ছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। ১৩নং অলীউল্লাহ লেনের বাড়িতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯১৩ সালের ৯ই মে তারিখে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ১৩নং ইউরোপীয়ান এ্যাসাইলাম লেনে সরানো হয়। ১৯১৫ সালের সূচনায় স্কুলটি উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং বছরের শেষে ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় ৮৪-তে। ছাত্রী-সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকায় ১৯১৫ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এই স্কুল স্থানান্তরিত হয় ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোডের ঠিকানায়। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলকে গড়ে তোলার জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয়েছে বেগম রোকেয়াকে। তাঁর এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির জন্য সহানুভূতি দূরের কথা সমাজপতিরা বিস্ফারিতনেত্রে তাঁর খুঁটিনাটি ভুলভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণে ছিল বদ্ধপরিকর।

ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী সরোজিনী নাইডু সুদূর হায়দরাবাদ থেকে ১৯১৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরে লিখিত এক চিঠিতে নারীশিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়ার মহৎ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করে মন্তব্য করেছেন, '.....কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি, আপনি কি দুঃসাহসের কাজ করিয়া চলিয়াছেন। মুসলমান বালিকাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য আপনি যে কাজ হাতে নিয়াছেন এবং তাহার সাফল্যের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী যে ত্যাগ সাধনা করিয়া

www.pathagar.com

আসিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আপনার প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যেই এই চিঠিখানা লিখিলাম।

.....আজ সাময়িকপত্রে [Indian Ladies Magazine] আপনার স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট পড়িতেছিলাম। আপনার এই ভগ্নী দূর হইতে বরাবর আদর্শকে এবং আপনার কর্মময় জীবনকে কিরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকে, তাহা জানাইবার জন্যই এই চিঠি। মুসলমান নারীদের কল্যাণের জন্য আপনি যে অক্লান্ত সাধনা করিতেছেন, বিধাতা করুন, তাহা জয়যুক্ত হউক।'

সে সময় কলকাতায় মুসলমান মেয়েদের লেখাপড়া শেখার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের হিন্দু অথবা খ্রিস্টানদের স্কুলে পড়তে হতো। ফলে তারা হিন্দু না হয় খ্রিস্টান ভাবাপন্ন হয়ে পড়তেন। সে যুগে কলকাতার অতি আধুনিক মেয়েরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে যেভাবে আচার-আচরণ, পোশাকে-আশাকে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিত তা বেগম রোকেয়া মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন, '.....এমন অমুসলিম স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্তা মুসলিম মেয়েরা লজ্জা শরমের ধার অতি অল্পই ধারে। তাহারা যেরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়া পরপুরুষের সম্মুখে বেপরোয়াভাবে বাহির হয়, তাহাতে শরীয়ত অনুযায়ী পর্দা রক্ষা হয় না। উপরোক্ত দূরবস্থার একমাত্র ঔষধ একটি আদর্শ মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়– যেখানে আমাদের মেয়েরা আধুনিক জগতের অন্যান্য সম্প্রদায় এবং প্রদেশের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলবার মত উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে।'

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপনের পিছনে সক্রিয় ছিল একটি আদর্শ, একটি প্রেরণা। মুসলমান বালিকাদের শিক্ষার দুরবস্থা, নারী শিক্ষার ব্যাপারে ধর্মান্ধ ব্যক্তি ও রক্ষণশীল সমাজপতিদের বিরূপ মনোভাব এবং পর্দার নামে প্রাণঘাতি অবরোধ প্রথার কুপ্রভাব সম্পর্কে ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতির [Bengal women's Educational conference] সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভানেত্রীর অভিভাষণেও তিনি বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। বেগম রোকেয়া বলেন, '.....২০/২১ বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজসেবা– বিশেষত ১৬ বৎসর যাবত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরিচালনা করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি তাহাই অপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি।

স্ত্রী-শিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া পড়ে। আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য হয়। প্রবাদ আছে, 'বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়।

এখন প্রশ্ন এই যে, মুসলমান বালিকাদের সুশিক্ষার উপায় কি? উপায় তো আল্লাহর কৃপায় অনেকই আছে, কিন্তু অভাগিনীগণ তাহার ফল ভোগ করিতে পায় কই? আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবনের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবন কাহার জানেন? সে জীবন ভারত-নারীর। এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই।.....

.....সম্প্রতি তুরস্ক এবং মিসর, ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দিবার জন্য বাধ্যতামূলক আইন করিয়াছেন। কিন্তু তুরস্ক আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণে সোজা পথ অবলম্বন করেন নাই, বরং আমাদের ধর্মশাস্ত্রের একটি অলঙ্ঘনীয় আদেশ পালন করিয়াছেন। যেহেতু পৃথিবীতে যিনি সর্বপ্রথম পুরুষ স্ত্রীলোককে সমভাবে সুশিক্ষা দান করা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের রসুল মকবুল [অর্থাৎ পয়গম্বর সাহেব] তিন আদেশ করিয়াছেন শিক্ষা লাভ করা সমস্ত নরনারীর অবশ্য কর্তব্য। তেরশত বৎসর পূর্বেই আমাদের জন্য এই

www.pathagar.com

শিক্ষাদানের বাধ্যতামূলক আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজ তাহা পালন করে নাই, পরন্তু ঐ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং তদ্রূপ বিরুদ্ধাচরণেই বংশগৌরব মনে করিতেছে। এখনও আমার সম্মুখে আমাদের স্কুলের কয়েকটি ছাত্রীর অভিভাবকের পত্র মজুত আছে, যাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছে যে, তাঁহাদের মেয়েদের যেন সামান্য উর্দু ও কোরআন শরীফ পাঠ ছাড়া আর কিছু বিশেষত ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া না হয়।'

বেগম রোকেয়ার শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কিত ও কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর অন্যতম সহকর্মিণী ফাতেমা খানম ১৯২৭ সালে সুসাহিত্যিক আবুল ফজলকে লিখিত এক চিঠিতে মন্তব্য করেছেন, 'অলস অকর্মণ্য মুসলমান সমাজের নারীজাতির জন্য এই প্রবীণা বিধবা মহিলাটি যা করেছেন সমস্ত ভারতে [ব্রিটিশ ভারতে] তার তুলনা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালি মুসলমানদের নিদ্রা তিনি কিছুতেই ভাঙ্গাতে পারছেন না। তাঁর স্কুলে তফসিরসহ কোরআন পাঠ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, পার্শী, হোম নার্সিং, ফার্স্ট-এড, রন্ধন সেলাই ইত্যাদি মেয়েদের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েরা আগ্রহে শিক্ষা করছে কিন্তু বাঙালিরা এদিকে ফিরেও চাচ্ছে না। ১১৪টি মেয়ের মধ্যে মাত্র দুইটি বাঙালি। এখন বুঝতে পার বাংলার কি অবস্থা।' কুম্ভকর্ণ বাঙালি মুসলমান সমাজের নিদ্রাভঙ্গ করতে না পারলেও বেগম রোকেয়া অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁর প্রচেষ্টা। বাংলার মুসলমান নারী সমাজ শিক্ষা বিস্তারের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন বেগম রোকেয়া। স্কুলটি স্থাপন করার পর থেকে এর কাজ কর্ম তিনি পরিচালনা করতে পারেননি শান্তিপূর্ণভাবে। স্কুলটির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য রীতিমত হিমশিম খেতে হয়েছিল তাঁকে। এর কারণ দীর্ঘকাল ধরে এই স্কুলের বিরুদ্ধে চলেছিল নানাবিধ ষড়যন্ত্র। স্কুলটিকে সুষ্ঠু ভিত্তির উপর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কলকাতা শহরের সেকালের গণ্যমান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে তিনি সাহায্য ও সহযোগিতা আশা করেছিলেন অথচ তাঁরা উল্টো প্রাণপণে তাঁর শত্রুতাই করেছেন। নানা কুট ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতেও তাঁরা পেছপা হননি। স্কুলের ক্ষতিসাধন করতে কতকগুলো লোক অহেতুক সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজপতিরাই শুধু একা নন ধর্মান্ধ মোল্লা মৌলবীরাও বেগম রোকেয়ার নারীশিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়ার প্রতি কেউ তুচ্ছ কারণে বিরক্ত হলেও সেই ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে তাঁরা যত্নবান হতেন স্কুলের উচ্ছেদ সাধনে। সমাজের নিন্দা গ্লানিতে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল বিষময়। তাঁর বিরুদ্ধে এমন অপপ্রচার হয়েছিল যে, 'যুবতী বিধবা স্কুল স্থাপন করিয়া নিজের রূপ যৌবনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন।'

এছাড়াও শিক্ষাবিস্তার ও সমাজহিতকর প্রতিটি কার্যকলাপ প্রতিপদক্ষেপে তাঁর প্রতি বর্ষিত হয়েছিল অশ্লীল গালিগালাজ, নিন্দা-বিদ্রূপ, অপমান ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। স্কুল স্থাপনের আঠারো বছর পরেও সমাজের বিরূপতা ও বিরুদ্ধতার অবসান হয়নি। এ সম্পর্কে স্বীয় জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বেগম রোকেয়া বলেছেন, 'এই আঠারো বৎসর ধরিয়া এই গরীব স্কুলকে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য কেবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। দেশের বড় বড় লোক– যাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতে রসনা গৌরব বোধ করে, তাঁহারাও প্রাণপণে শত্রুতা সাধন করিয়াছেন। স্কুলের বিরুদ্ধে কতদিকে কত প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহা একমাত্র আল্লাহ জানেন– তার কিছু কিছু এই দীনতম সেবিকাও সময় সময় শুনিতে পায়। একমাত্র ধর্মই আমাদিগকে বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

স্কুলটা যে এত ঝঞ্ঝাবাত, এত শিলাবৃষ্টি, এত অত্যাচার সহিয়া এখনও টিকিয়া আছে, তাহাই যথেষ্ট। একথা বলি না যে, আমরা সমাজের সম্মুখে অতি উচ্চদরের এক অদ্বিতীয় আদর্শ বিদ্যালয়

www.pathagar.com

উপস্থিত করিয়াছি। আমাদের ন্যায় অবরোধ-বন্দিনীদের পক্ষে যতটা করা সম্ভব তাহাই করিয়াছি এবং অবরোধ বন্দিনী বালিকাদের পক্ষে যাহা শিক্ষা পাওয়া সম্ভব, তাহাই তাহারা পাইয়াছে।'

সমাজের নেতৃস্থানীয় কতকগুলো লোকের অহেতুক বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করে বেগম রোকেয়া অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল যদি অস্তিত্ব বজায় রাখতে না পারতো তাহলে তাতে তাঁর ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি হতো না, এমন নয় যে, স্কুল থেকে প্রচুর অর্থাগম হতো। বরং স্কুলের আর্থিক অবস্থা বরাবরই খারাপ ছিল। স্কুলের আর্থিক ঘাটতি পূরনের জন্য অনন্যোপায় হয়ে বেগম রোকেয়াকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে অর্থ ঢালতে হতো। প্রথমে যে দশ হাজার টাকা নিয়ে স্কুল আরম্ভ করেছিলেন সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ নিঃশেষিত হলে তিনি স্কুলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বার্ষিক হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমনকি স্কুলের সুপারিনটেন্ডেন্ট ও প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যে বেতন তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল পারিশ্রমিকের সেই টাকাও নিজে গ্রহণ না করে তিনি স্কুলের কাজেই বরাবর ব্যয় করেছেন। স্কুলের উন্নয়নের জন্য ছিল তাঁর এমনিই আত্মত্যাগ। অনেকের মনে এমন প্রশ্ন দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, তিনি কেন স্কুলটি রক্ষা করার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন? স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্যই কি তিনি স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন? কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা তাঁর মোটেও উদ্দেশ্য ছিল না। এ সম্পর্কে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'আপনারা সকলেই জানেন যে, এই 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটা না থাকলে আমি মরে যাব না। এমনটি নিশ্চয়ই হবে না যে–

ঘুঘু চরবে আমার বাড়ী
উনুনে উঠবে না হাঁড়ি
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ী
অন্তিম দশায় খাবি খাব।

এই স্কুলটা না থাকলে ক্ষতি নাই। তবে এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই? চাই নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়; চাই স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্য নয়; চাই, বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' শব্দ দুটির জন্য যদি স্কুলের অকল্যাণ হয়, তবে সাইনবোর্ড থেকে ও শব্দ দুটি মুছে ফেলা যাক। অবশ্য মুসলিম সমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ আমার কোন বংশধর নাই যে, তাদের ভাবী দুর্দশার আশঙ্কায় আমি শঙ্কিত হব, কিংবা তাদের দুষ্ক্রিয়া দেখে আমি লজ্জিত হব। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন, এই স্কুল সম্বন্ধে মাথা-ব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই। যাঁদের বংশধর আছে, যাঁদের ভবিষ্যৎ আছে, তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয়া এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গঠিত করুন।'

বেগম রোকেয়া ছিলেন সমাজহিতৈষী। সমাজের কল্যাণ কামনা তাঁর মন-প্রাণ অধিকার করেছিল। নিজের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নয় বরং সমাজের কল্যাণকামনায় তিনি স্কুলটি বাঁচিয়ে রাখতে ছিলেন সচেষ্ট। স্কুলের পিছনে সময় ও অর্থ ব্যয় না করে তিনি জীবনের বাকি দিনগুলো অনায়াসে কাটাতে পারতেন সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে। কিন্তু ভোগীর জীবন ছিল না তাঁর আদর্শ। বিলাস আড়ম্বরপূর্ণ জীবন তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বামী ও সন্তানাদি না থাকায় সংসারের প্রতি তেমন কোন আকর্ষণও তাঁর ছিল না। বস্তুত, বেগম রোকেয়ার জীবন– মরুভূমিতে এই স্কুলটি ছিল 'শান্তির মরুদ্যান'। স্কুলটিই ছিল তাঁর জীবনের ভরসাস্থল। তাঁর সংসার, তাঁর সমাজ। সন্তানহারা বেগম রোকেয়ার সাংসারিক কোন বন্ধন ছিল না। স্কুলের ছাত্রীরাই যেন ছিল তাঁর অগণিত সন্তান। এই ছাত্রীদের তিনি

www.pathagar.com

কন্যাস্নেহে ভালবাসতেন। তাঁদের সুখ-সুবিধার প্রতি তিনি দৃষ্টি দিতেন। তাদের অসুখ-বিসুখের কোন সংবাদ শুনলে তাঁর মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠতো; হতো ব্যাকুল। তিনি তখন আর স্থির থাকতে পারতেন না। তিনি ছুটে যেতেন কন্যা স্থানীয়া রোগাক্রান্তা ছাত্রীদের শয্যাপাশে। স্কুলের নানা জটিল কাজকর্মে তিনি নিয়ত এত ব্যস্ত থাকতেন যে, নিজের বাড়িঘর কিংবা বিষয় সম্পত্তির দিকে খেয়াল রাখা তাঁর পক্ষে মোটেও সম্ভবপর হতো না। স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে বিভিন্ন দিক থেকে যেমন তাঁকে নানা দুর্বিপাকের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তেমনি ভাগ্যও তাঁকে বরাবর প্রতারিত করেছিল নির্মমভাবে। তিনি নিজে এ সম্পর্কে বলেছেন, 'একটা মজার কথা এই যে, স্কুলের জন্য আমি পার্থিব যে কোন জিনিসের প্রতি নির্ভর করিয়াছি, আল্লাহ আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, আমার মাতা সঙ্গে না থাকিলে আমার কলিকাতা থাকা হইবে না। কিন্তু বৎসর অতীত না হইতে না হইতে মাতার মৃত্যু হইল। পরে ভাবিয়াছিলাম টাকা না থাকিলে স্কুল চলিবে না; কিন্তু বিদ্যালয় খুলিবার আট মাস পরেই বার্মা ব্যাংক ফেল হইল, অতঃপর আরও নানা কারণে একাজে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা নষ্ট হইল। তাহার পরে ভাবিয়াছিলাম কলিকাতায় কতিপয় গণ্যমান্য রইসের সহিত মিলিয়া মিশিয়া না থাকিলে বিদ্যালয়সহ কলিকাতায় টিকিয়া থাকিতে পারিব না; কিন্তু সেই গণ্যমান্য লোকেরাও বিমুখ হইয়া দাঁড়াইলেন। সবই গিয়াছে কেবল বিধাতার কৃপায় স্কুল আছে। শুধু কঙ্কালসার হইয়া প্রাণে বাঁচিয়া থাকা নহে- বিদ্যালয় আরম্ভ করিয়াছিলাম মাত্র দুখানা বেঞ্চ ও আটজন ছাত্রী লইয়া অলীউল্লা লেনের একটি ছোট বাড়িতে, এখন স্কুলের প্রায় ঝাড়া আঠার উনিশ হাজার টাকার আসবাব এবং নগত বিশ হাজার টাকা আছে, ছাত্রীসংখ্যাও শত্রুমুখে ছাই দিয়া দেড় শত। 'আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি'– 'কুরআন শরীফের এই বচনটিই আমি জীবনের পরতে পরতে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলাম।' স্কুলের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও বেগম রোকেয়ার অসীম অধ্যবসায় ও আন্তরিক অনুপ্রেরণার ফলস্বরূপ ১৯৩০ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরিণত হয় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে।

বিদ্যালয়টি পরিচালনা করতে গিয়ে বেগম রোকেয়াকে যে কিরূপ নিন্দা, অপবাদ, লাঞ্ছনা, এমনকি অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিদ্যালয়ের আর্থিক অসচ্ছলতা দূরীকরণের জন্য সরকার ও কলকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে বারবার আবেদন জানিয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। বহু বছর পর্যন্ত সরকারী অনুদান থেকে বঞ্চিত ছিল স্কুলটি। অজ্ঞাত কারণে সমাজ পতিরাও মুখ ফিরিয়েছিলেন স্কুলটির প্রতি। ব্যাংক ফেল হওয়ার কারণে অর্থকষ্টে পড়েছেন বেগম রোকেয়া। নিজের সঞ্চিত অর্থের দ্বারা তিনি পূরণ করেছেন স্কুলের ঘাটতি একাধিকবার। তবুও কোন প্রতিবন্ধকতাই হতোদ্যম করতে পারেনি বেগম রোকেয়াকে। স্কুলটির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশ ও সামাজিক ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে তিনি এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন। বেগম রোকেয়ার সাফল্যের রহস্য উন্মোচন করে তাঁর জীবনচরিতকার বলেছেন, '.....রোকেয়ার সাফল্যের প্রধান কারণ তাঁহার কঠিন পণ ও আদর্শের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা।

'সত্য প্রিয় হউক, আর অপ্রিয় হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, সত্যকে বুঝিব ও গ্রহণ করিব, এই ছিল তাঁহার পণ। শুধু ইহাই নয়। তাঁহার আদর্শ ইহার চেয়েও উচ্চ। সত্যকে শুধু গ্রহণ করিয়াই তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। সত্যকে প্রচার করিবেন– দেশের প্রত্যেকটি হতভাগ্য নারীকে জ্ঞানের পথে টানিয়া লইবেন, এই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। জীবনের শেষ পর্যন্ত কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে মুহূর্তের জন্য তাঁহার লৌহের মত দৃঢ় সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।' নারীশিক্ষার উন্নয়নে তিনি ছিলেন দৃঢ় ও একনিষ্ঠ। আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ও আত্মত্যাগের যে অনন্য পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা তাঁর চরিত্রকে করেছে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

www.pathagar.com

নারী মুক্তি-সমকাল–বেগম রোকেয়া

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

তুলনা সব সময়েই অযথার্থ, কিন্তু অনেক সময়েই প্রয়োজনীয়। বেগম রোকেয়ার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যবধান অনেক; কৃতি ও গৌরবে বিদ্যাসাগর অনেক বড়; কিন্তু রোকেয়াও একজন বিদ্যাসাগরই.....তাঁর নিজের এলাকায়। আমরা দেখি সেই একই বিদ্রোহ.....বৃক্ষ ও নদীর। পরিবেশ ও পরিস্থিতির বৈরিতাকে ভেদ করে একইভাবে বের হয়ে এসেছিলেন তারা উভয়ে.....বৃক্ষ যেমন বের হয় আকাশমুখী, নদী যেমন বহমান থাকে সমতল ভূমি দিয়ে।

আমরা জানি বিদ্যাসাগর বাইরে যেমন কঠিন ভেতরে তেমনি কোমল ছিলেন। মধুসূদন তাঁর হৃদয়কে মাতৃহৃদয় বলে উল্লেখ করেছেন। বেগম রোকেয়ার মনোজগতেও ওই একই ঘটনা। এমনিতে অনমনীয়, সম্পূর্ণ আপোসহীন। কেউ তাঁকে পরাস্ত করতে পারলো না; ছিন্নভিন্ন করে বের হয়ে এলেন শান্ত সাহসে। কেবল অমান্য করে নয়, হাস্যকর করে দিয়েও পরাস্ত করেছেন তিনি 'গলা-টেপা' সমাজের শত্রুতাকে; কিন্তু ভেতরে ভেতরে আবার অত্যন্ত কোমল ছিলেন। তাঁর নিজের কোনো সন্তান ছিল না, বহু সন্তানকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা দিয়ে এই আপন করে নেওয়ার পরিমাপ হবে না। অনাগতের জন্য সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছেন তিনি, অপরিচিতের জীবনে প্রবেশ করেছেন, নদীর মতো। তাঁর হৃদয় কাঁদতো মানুষের দুর্দশা দেখে। মুসলিম সমাজ ছিল অধঃপতিত, সেখানকার মেয়েরা দুর্দশাগ্রস্তদের মধ্যেও দুর্দশাগ্রস্ত, সে জন্য তাঁর বিশেষ ক্রন্দন ছিল এই মেয়েদের জন্য।

বেগম রোকেয়ার কল্পকাহিনী 'সুলতানার স্বপ্ন'তে সুলতানা যখন প্রবেশ করছে স্বপ্নরাজ্যে তখন তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে "প্লীহা-স্ফীত ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বাঙ্গালার দরিদ্রদিগের কথা স্মরণ করিয়া।" এ কাহিনী লিখেছেন তিনি ২৫ বছর বয়সে, ১৯০৫ সালে, যখন সমাজ সেবক রোকেয়ার জন্ম হয়নি, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের স্বপ্নও দেখেননি, থাকেন ভাগলপুরে, কথা বলেন উর্দুতে। এই কল্পকাহিনী প্রথমে ইংরেজিতেই লিখেছিলেন তিনি, পরে অনুবাদ করেছেন বাংলায়। ইংরেজি লেখাটি পড়ে তাঁর উর্দুভাষী উচ্চশিক্ষিত স্বামী খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়ার সঙ্গে যাঁর বয়সের ব্যবধান ছিল ২৪ বছরের, রোকেয়ার সঙ্গে বিয়ের আগে যিনি

www.pathagar.com

বিপত্নীক ছিলেন, তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "a terrible revenge"। তাই মনে হয় পড়লে, ব্যক্তিগত নয়, পারিবারিক নয়, সমষ্টিগত প্রতিহিংসাপরায়ণতা বুঝি, নারীর প্রতিশোধ গ্রহণ, পুরুষের ওপর। কিন্তু প্রতিহিংসাটা বড় কথা নয় ওই রচনায়, বড় কথা চরিতার্থতা। 'সুলতানার স্বপ্নে' অবরুদ্ধ নারী চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছে 'নারী স্থানের' সমাজে ও রাষ্ট্রে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। যেমন নানাভাবে বিব্রত ব্যক্তি রোকেয়া চরিতার্থতার সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁর সাহিত্য সাধনায় ও সমাজসেবায়।

কিন্তু নারীস্থানে প্রবেশ করে সুলতানা মুসলমান মেয়েদের কথা আলাদাভাবে ভাবেননি, এমনকি মুসলিম সমাজের কথাও চিন্তা করেননি, তাঁর মনে পড়েছে হতভাগ্য বাঙালীর কথা। সব বাঙালীর, গোটা বাঙালী সমাজের।

একুশ বছর পরে ১৯২৬ সালে রোকেয়া আলীগড় গিয়েছিলেন মহিলাদের একটি সম্মেলনে যোগ দিতে। মুসলিম মহিলাদের সম্মেলন। রোকেয়া তখন প্রতিষ্ঠিতা; আলীগড়ে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। শুনে রোকেয়া তাঁর স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তার সঙ্গে লিখেছেন তাঁর এক আত্মীয়াকে "আরে বোরকা-ঢাকা অবস্থায় দু'একটি কথা বলিয়াছি কি বলি নাই, তাহারই নাম হইল বক্তৃতা। আর ব্যাটারা সব আমার নাম জানিল কি রূপে তাহাও বুঝিতে পারি না। আমি এখানে কাহাকেও বক্তৃতার কথা বলি নাই।" কিন্তু ওই ব্যক্তিগত চিঠিতে তিনি আপনজনকে যা বলেছেন তা আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন আলীগড়ে গিয়ে মহিলাদের উদ্যোগ ও উৎসাহ দেখে তাঁর বড়ই দুঃখ হয়েছে, দেশের কথা ভেবে। মনে হয়েছে, "বলি, আমার বাংলাদেশ। যদি কিছু নাই করিস, তবে দড়ি ও কলসির সাহায্যে তোর অস্তিত্ব লোপ করিতে পারিস তো। সে জন্যও আর বেশী ভাবনা নাই.....ম্যালেরিয়া ও কালা আজার তো ভার লইয়াছে। আহা, বুক ফাটিয়া যাইতে চায়।" কার দুঃখে? না, গোটা বাংলাদেশের।

এই হচ্ছেন আসল রোকেয়া। খাঁটি বাঙালী। এখানেই তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নৈকট্য। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা এসেছিলেন ঘোরতর সামন্তবাদী পরিবেশ থেকে। খুব স্বাভাবিক হতো তিনি যদি অন্যকিছু না হয়ে একজন বিশুদ্ধ পণ্ডিত হতেন; কিন্তু তা না হয়ে তুচ্ছতার সমস্ত বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করে বের হয়ে এলেন বাংলা ভাষার একজন অসামান্য লেখক হিসেবে। বেগম রোকেয়াও তাই করেছেন। তাঁর জন্যও নিষিদ্ধ ছিল বাংলা ভাষার চর্চা, খুব স্বাভাবিক হতো যদি তিনি কিছুই না লিখতেন, কিম্বা উর্দু ভাষার চর্চায় ব্যাপৃত হতেন; কিন্তু তিনি ওই আপাত স্বাভাবিক পথে এগুলেন না, এগুলেন বিপরীত পথে, যে জন্য এতো বড় হলেন, স্মরণীয় হলেন এমনভাবে।

রোকেয়া সমাজসেবক ছিলেন। কিন্তু তথাকথিত সমাজসেবক ছিলেন না। তাঁর সমাজসেবার পেছনে একজন শিল্পীর অনমনীয়তা ও আর্তহৃদয় কাজ করেছে এবং সর্বক্ষণ সক্রিয় থেকেছে সুন্দর জীবনের জন্য একটি ব্যস্ত আকাঙ্ক্ষা। রোকেয়ার সাহিত্যিক পরিচয় তাঁর সমাজসেবক—পরিচয়ের নীচে চাপা পড়ে যেতে চায়। এবং এ কথাও সত্য যে, সমাজ সংস্কারের নানান কর্তব্য তাঁকে লেখার কাজে তেমনভাবে মনোনিবেশ করতে দেয়নি যেমনভাবে করলে তিনি আরো অনেক লেখা রেখে যেতে পারতেন আমাদের জন্য। তবে মূল সত্যটা এই যে, তিনি লেখক বলেই সমাজসেবক ছিলেন, সমাজসেবক বলে লেখক নন। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে যা সত্য, তাঁর ক্ষেত্রেও সেটাই সত্য।

তাঁর স্কুল খোলার ব্যাপারটা পরে এসেছে। অনেক পরে। তাঁর স্বামী মারা গেলেন ১৯০৯ সালে, এরপরেই তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, ভাগলপুরে। সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রী ছিল কারা? উর্দুভাষীরা। পরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলকে তিনি কলকাতায় নিয়ে এসেছেন; কিন্তু আমরা

www.pathagar.com

দেখছি ১৯২৭ সালে এই স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল সর্বমোট ১১৪ জন, যার মধ্যে বাঙালী ছিল মাত্র দুই জন। এই অবাঙালী—পরিবেশ নিয়ে রোকেয়া মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, বরঞ্চ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিলেন। 'মতিচূর' দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশিত হয় ১৯২১-এ; এ বই তিনি উৎসর্গ করেছিলেন জ্যেষ্ঠ ভগিনী করিমুন্নেসা'কে। উৎসর্গপত্র লিখেছেন, "চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে থাকিয়া বঙ্গভাষায় কথাবার্তা কহিবার একটি লোক না পাইয়াও যে বঙ্গভাষা ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমার আশীর্বাদে। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া ১১ বৎসর যাবত এই উর্দু স্কুল পরিচালনা করিতেছি; এখানেও পরিচারিকা, ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি সকলেই উর্দু–ভাষিণী। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত উর্দু ভাষাতেই কথা কহিতে হয়। আবার বলি, এতখানি অত্যাচারেও যে বঙ্গভাষা ভুলিয়া যাই নাই, তাহা বোধ হয় কেবল তোমারই আশীর্বাদের কল্যাণে।" কিন্তু কাহিনীর শুরু তো ভাগলপুরে উর্দুভাষী স্বামীগৃহে নয়, সূত্রপাত পিতৃগৃহেই।

অরণ্যবেষ্টিত সেই বিশাল গৃহে অনেক কিছু ছিল, কিন্তু বাংলা ভাষার চর্চা ছিল না। পিতা ছিলেন ঘোরতর সামন্তবাদী, তাঁর ছিল চার স্ত্রী, যাঁদের একজন ছিলেন অবাঙালী; দুই পুত্রকে তিনি কলকাতায় গিয়ে ইংরেজি পড়বার সুযোগ দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে যাবার কোনো রাস্তা রাখেননি। স্ত্রী শিক্ষায় তিনি আদৌ বিশ্বাস করতেন না। রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসার খুবই আগ্রহ ছিল বাংলা শেখার। একদিন তিনি বাংলা বই পড়ছিলেন। দেখে পিতা ভয় পেয়ে গেলেন। "শুধু পড়াই বন্ধ হইল না.....তখন করিমুন্নেসাকে অন্ধকার কারাগারে [অর্থাৎ মাতামহের প্রাসাদে] পাঠাইয়া দিয়া বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল।" ১৪ বছর বয়সে করিমুন্নেসার বিয়ে আরেক জমিদার বাড়িতে। এক সময়ে বিধবা হয়ে করিমুন্নেসা কলকাতা চলে যান এবং নিজের দুই পুত্রের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। করিমুন্নেসার ভেতরও একজন সাহিত্যিক ছিল। তিনি কবিতা লিখতেন। কিন্তু কবিতা প্রকাশ করবার সুযোগ পাননি। কলকাতার একটি পত্রিকায় দুটি কবিতা দু'বারে প্রকাশিত হয়েছিল, লেখিকার নাম ছিল, 'সাবের বংশের জনৈক কন্যা।' করিমুন্নেসার তুলনায় রোকেয়া অনেক বেশি অনমনীয় ছিলেন, তিনি দমে যাননি, ক্ষান্ত হননি, নিজের সাহিত্য সাধনাকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

করিমুন্নেসার প্রসঙ্গ উঠলে আরেকজনের কথা মনে পড়ে। তিনি মীর মশাররফ হোসেন। মীর মশাররফ অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক ছিলেন, তিনি 'গো-জীবন' লিখেছেন, 'জমীদার দর্পণ' লিখেছেন কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও উদার ছিল না। প্রমাণ 'গাজী মিয়ার বস্তানী' যে বইতে কোথাও কোথাও প্রায় অশ্লীল ভাষায় বেগম রোকেয়ার ভগ্নি করিমুন্নেসাকে তিনি আক্রমণ করেছেন। মহিলার অপরাধ তিনি 'আধুনিকা' ছিলেন। স্মরণীয় যে, বেগম রোকেয়াকেও আক্রমণ কম করা হয়নি। অন্ধকারাচ্ছন্ন সামান্য মানুষেরা তাঁর বিদ্যালয় পরিচালনাকে 'যুবতী বিধবার' রূপ-যৌবনের বিজ্ঞাপন বলে বিদ্রূপ করতে চেয়েছে। সেটা অস্বাভাবিক ছিল না; কিন্তু আক্রমণ যখন মীর মশাররফ হোসেনের কাছ থেকে আসে তখন তো বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, স্ত্রী শিক্ষার প্রশ্নে অন্য ক্ষেত্রে উদার পুরুষরাও যথেষ্ট উদার নন।

মীর মশাররফ গত যুগের মানুষ, কিন্তু এ যুগের লেখক, অত্যন্ত আধুনিক, প্রায়—সাহেব নীরদ সি, চৌধুরী কি বলছেন মেয়েদের সম্পর্কে? 'বাঙালী জীবনে রমণী' নামে বই লিখে তিনি বলতে চেয়েছেন মেয়েরা বাঙালী নয়, রমণীই শুধু বেগম রোকেয়া এ বক্তব্যের জবাব দিতে পারতেন যদি তিনি এ বই পড়তেন। এবং সে জবাবে নীরদ সি. চৌধুরী অবশ্যই একজন হাস্যকর ব্যক্তিতে পরিণত হতেন। কিন্তু জবাব দেওয়া না দেওয়াটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির দৌরাত্ম্য বেগম রোকেয়াকে পদে পদে সহ্য করতে হয়েছে, তাঁর কর্মজীবনে।

www.pathagar.com

এই কর্মজীবনের সূচনাতেই তিনি সাহিত্যিক। নবনূরে তাঁর প্রথম লেখা ছাপা হয় ১৯০৩ সালে। ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতির সম্মিলনীতে তিনি বলছেন "২০/২১ বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজসেবা" করে আসছেন তিনি। সাহিত্য সেবার কথাই প্রথমে উল্লেখ করছেন দেখতে পাচ্ছি, সমাজসেবা আসছে পরে। সাহিত্যসেবার ইতিহাস ২০/২১ বৎসরের নয়, কিছুটা আগেই শুরু হয়েছে আসলে।

এই সাহিত্যিক সাহিত্যিক বলেই বুঝেছিলেন যে তাঁকে বাংলা ভাষায় লিখতে হবে। বাংলার চর্চা করতে পারছেন না দেখে তাঁর মর্মপীড়ার কথা উল্লেখ করেছি, এর সঙ্গে যোগ করতে হয় এই তথ্য যে, তিনি উর্দু ও ইংরেজি দুটোই ভালো জানতেন। Sultana's Dream ইংরেজিতে লেখা, যে লেখার প্রশংসা এই দ্বিতীয় পাঠক স্বামীর ইংরেজ উপরওয়ালা উচ্ছ্বসিত ভাষায় করেছিলেন। তিনি ইংরেজি ও উর্দু লেখা থেকে অনুবাদ করেছেন বাংলায়, কিন্তু বাংলা ভাষারই চর্চা করেছেন সারা জীবন। মাইকেল মধুসূদন ছিলেন না, ইংরেজির পথে বাংলায় আসেননি, সব সময়েই বাঙালী তিনি। বিচ্যুতির আশংকা ছিল দুটো; একটি সামন্তবাদিতার [অর্থাৎ উর্দু চর্চায়, যেমনটা নবাব আব্দুল লতিফেরা করেছেন এবং অন্যদেরকে করবার পরামর্শ দিয়েছেন।] অপরটি বুর্জোয়াপনার [অর্থাৎ ইংরেজি চর্চায়]; কোনো বিচ্যুতিই তাঁকে গ্রাস করতে পারল না, তিনি এগিয়ে গেলেন স্বাভাবিক পথে। সমাজকে অনর্থক আঘাত করাও তাঁর ইপ্সিত ছিল না, তাঁর কৌতুক সব সময়েই প্রসন্ন, কখনোই নিষ্ঠুর নয়। মুসলমান 'ব্রাহ্ম হতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন না; সমাজের ভেতরে থেকে সমাজের জন্যই লিখেছেন।

আর অসাধারণ ছিল মাত্রাজ্ঞান। যেটি সব বড় শিল্পীরই থাকে। তাঁর "উন্নতির পথে" নামের একটি সংক্ষিপ্ত রচনায় এক কল্পলোকযাত্রার কৌতুকে ভরপুর বর্ণনা আছে। বৃদ্ধ লেখক 'ক্রুসেন সল্ট' খেয়ে তরুণ হয়ে গেছেন। চলেছেন তিনি একদল তরুণ-তরুণীর সঙ্গে। প্লেনে। এ হচ্ছে উন্নতির প্লেন। এই প্লেন ঘন্টায় ৬০ হাজার মাইল বেগে ধাবমান। যতই দূরে যাচ্ছে তরুণ-তরুণীদের কাপড় জামা ততই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। লেখক হঠাৎ দেখেন তিনি কালিদাসের কালে পৌঁছে গেছেন। তরুণীদের দিকে আর তাকানো যায় না। 'উন্নতির প্লেন' আরো এগুচ্ছে দেখে ভয় পেয়ে গেছেন তিনি। কাকুতি মিনতি করে বলছেন, 'দোহাই ভায়া তরুণ। আর না। আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা এখন আদি-মাতা হজরত হাওয়ার যুগে এসে পড়বে। আদি পিতা অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে গাছের তিনটা পাতা চেয়ে নিয়ে—একটায় তহবন্দ, একটা দিয়ে জামা আর একটা দিয়ে মাথা ঢাকবার টুপী করেছিলেন। আর আদি-মাতা তার লম্বা চুল দিয়ে সমস্ত গা ঢেকেছিলেন। কিন্তু এখনকার তরুণীদের মাথাতে চুলও নেই—এরা কি দিয়ে গা ঢাকবে।"

মাত্রাজ্ঞানের ভেতরেই অনমনীয় তিনি; এ অনমনীয়তা একজন শিল্পীর। তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিগুলো পড়লে বোঝা যায় এই মহিলার আবেগ কতো প্রবল ছিল, কতো গভীর ছিল তাঁর দুঃখবোধ। মৃত্যুর এক বছর আগে অত্যন্ত স্নেহভাজন এক আত্মীয়ার মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন রোকেয়া তাঁর আরেক আত্মীয়াকে লিখেছেন, "শৈশবে বাপের আদর পাইনি, বিবাহ জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ urine পরীক্ষা করেছি। পথ্য রেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি। দু'বার মা হয়েছিলাম—তাদেরও প্রাণ ভরে কোলে নিতে পারিনি। একজন ৫ মাস বয়সে অপরটি ৪ মাস বয়সে চলে গেছে। আর এই ২২ বৎসর যাবত বৈধব্যের আগুনে পুড়েছি। সুতরাং নূরী আর আমাকে বেশি কি কাঁদাবে। সে ত বোঝার উপর শাকের আটি মাত্র ছিল। আমি আমার ব্যর্থ জীবন নিয়ে হেসে খেলে দিন গুনছি।"

www.pathagar.com

যা চেয়েছেন তার বিপরীতটি ঘটেছে। তিনি চেয়েছেন স্কুলকে বাড়িয়ে তুলবেন, অন্যরা রাজী হয়নি। স্বামীর রেখে যাওয়া ১০ হাজার টাকা ব্যাংকে রেখেছিলেন, সেই ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে। পরে আরেকটি ব্যাংকে টাকা রেখেছিলেন আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল সেটিও উঠে যাবে। স্বামীর ভিটায় থাকতে পারেননি। সপত্নীর কন্যা তাঁকে ভিটাছাড়া করেছে। কলকাতায় উঠে এসে একটি গলির ভেতর স্কুল করেছিলেন। ছাত্রী সংগ্রহ করা কঠিন ছিল। বাড়ি বাড়ি থেকে তাদের রোজ নিয়ে আসতে ও পৌঁছে দিতো হতো। ঘোড়াগুলোর যত্ন নেওয়া হচ্ছে কি না সেদিকেও নজর রাখতে হচ্ছে....আরেক চিঠিতে লিখেছেন তিনি। তবু কলকাতা তাঁকে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। কিন্তু এই কলকাতা সম্পর্কেও তাঁর অহেতুক কোনো মোহ ছিল না। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে লিখছেন, কলকাতায় আমি এত ক্লান্ত বোধ করি যে তা বলতে পারি না। কলকাতা ছাড়া অন্য যে কোন জায়গার আবহওয়াটাই যেন আমাকে সয়। এই যেমন, জলপাইগুঁড়িতে পৌঁছে আমি এতটুকু ক্লান্ত হইনি। কিন্তু জলপাইগুঁড়ি থেকে কলকাতায় নেমে মনে হল যেন আধমরা হয়ে গেছি।" দু'সপ্তাহ পরে লিখছেন, "আমার সব প্রাণখোলা হাসি যেন জলপাইগুঁড়িতে রেখে এসেছি। কলকাতায় নামা মাত্রই সব রকম ঝন্‌ঝাট এসে ঘিরে ধরল।" কলকাতার বাইরে বিহারের ঘাটশিলা থেকে লিখছেন, "দুঃখ লাগছে যে, এই জায়গাটা এখন ক্রমেই সুন্দর হয়ে উঠেছে আর আমাকে চলে যেতে হবে। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে, কাদা শুকিয়ে গেছে আর ধান কাটাও হয়েছে। তাই হেঁটে বেড়াতে আরও আরাম পাওয়া যাচ্ছে।" বলছেন, "লোকে শুনলে হাসবে যে এখন কলকাতা আমার মোটে সয় না। ঘাটশিলা থেকে লেখা আরেক চিঠিতে আছে, "এখন এখানে বেড়াইবার বড় আরাম। ধান কাটা হইয়াছে, সেইসব ক্ষেতের নরম খড়ের উপর হাঁটিতে কি মজা। প্রাণ ভরিয়া হাঁটিয়া বেড়াই। একা হাঁটিতে ভাল লাগে না, কেবল আপনাদের মনে পড়ে।" কলকাতা তাঁর কাছে 'বন্দীখানায়' পরিণত হয়েছে। দুঃখ করে বলছেন, "২৯শে তারিখ ল্যাজ গুটাইতে [অর্থাৎ সমস্ত জিনিসপত্র প্যাক করিতে] হইবে।"

এসব অনুভূতি অবশ্যই একজন শিল্পীর। প্রতিহিংসাপরায়ণতা নয়, ভেতরে ছিল গভীর এক অতৃপ্তি ও দুঃখবোধ। চরিতার্থতা খুঁজছিলেন তিনি। তারই খোঁজে সাহিত্য চর্চা করেছেন, এবং ব্রতী হয়েছেন শিক্ষা বিস্তারের কাজে। দুই কাজের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। অভিন্ন তারা। উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পী তিনি। ভেতরের শিল্পী প্রকাশ খুঁজেছে দুই পথে। সমাজ যদি ভিন্নতর হতো, প্রকাশ হতো অন্যরকম; কিন্তু তিনি শিল্পীই রয়ে যেতেন।

স্কুল কেন গড়েছেন তিনি? কোন স্বার্থে? নিজেই লিখেছেন, "আপনারা সকলেই জানেন যে, এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটা না থাকলে আমি মরে যাব না।.....এই স্কুলটা না থাকলে আমার তিলমাত্র ক্ষতি নাই। তবে এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই?—চাই নিজের খ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়; চাই স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্য নয়; চাই বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য।.....মুসলিম সমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, কারণ আমার কোন বংশধর নাই যে, তাদের ভাবী দুর্দশার আশঙ্কায় আমি শঙ্কিত হব, কিম্বা তাদের দুষ্ক্রিয়া দেখে আমি লজ্জিত হব। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন, এই স্কুল সম্বন্ধে মাথা-ব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই। যাঁদের বংশধর আছে, যাঁদের ভবিষ্যত আছে, তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয় এই বালিকা স্কুলটাকে একটি আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গঠিত করুন।" ["ধ্বংসের পথে বাঙ্গালী মুসলিম"]

খ্যাতির জন্য নয়, ভালোবাসার জন্যই করা। যেমন শিল্পী প্রবেশ করতে চান অন্য মানুষের, অনেক মানুষের জীবনে তেমনি রোকেয়া প্রবেশ করতে চেয়েছেন, শিল্পী হিসাবেই—যেমন বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে, তেমনি লেখার মধ্য দিয়ে; লেখাই প্রধান কাজ তাঁর, বিদ্যালয়

www.pathagar.com

পরিচালনার চেয়েও বড়। খ্যাতি আসুক কি না আসুক সে নিয়ে তাঁর বিশেষ উৎকণ্ঠা ছিল না। কেননা যে কাজ তিনি করেছেন তার আগ্রহটা এসেছে ভেতর থেকে, অন্তর্গত প্রেরণার কারণে। 'সুলতানার স্বপ্নে' সুলতানা বলছে, "জানেন ভগিনী সারা। ভারতবাসীর বুদ্ধি সুপথে চালিত হয় না— জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। আমাদের কার্যের সমাপ্তি বক্তৃতায়, সিদ্ধি করতালি লাভে।" এই করতালি পাওয়া না পাওয়ার বিবেচনাটা কখনো প্রধান হয়ে দেখা দেয়নি বেগম রোকেয়ার জন্য। একটি চিঠিতে লিখছেন, তাঁর চাচাত বোনকে, "রোজ সন্ধ্যাবেলা সহিসেরা ঠিক মত ঘোড়া মলে কিনা তাও আমাকে দেখিতে হয়। ভগিনীরে! এই যে হাড়ভাঙা গাধার খাটুনী— ইহার বিনিময়ে কি জানিস? বিনিময় হইতেছে "ভাঁড় লিপকে হাত কালা" অর্থাৎ উনুন লেপন করিলে উনুন তো বেশ পরিষ্কার হয়, কিন্তু যে লেপন করে তাহার হাত কালিতে কালো হইয়া যায়। আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুলভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর।.....আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেয়ামতের পরদিন দেওয়া হইবে। এখন পড়া তৈরি করিতেছি।"

ওদিকে অকিঞ্চিতকর প্রশংসাও তাঁকে তৃপ্ত করেনি। "রাঙ ও সোনা" নামের একটি লেখায় লিখছেন, "ভাদ্র মাসের 'সওগাত' পত্রিকায় মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী সাহেবের লিখিত 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান মহিলা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে মোহিত ও বিস্মিত হইলাম। তিনি যে কতিপয় বঙ্গলেখিকাকে উদার সার্টিফিকেট দান করিয়াছেন সে জন্য আমি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' কলিকাতার সেক্রেটারীরূপে নারীদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।" আরো লিখেছেন, "নিখিল ভারত সাহিত্য-সংঘ আমার নিকট 'বিদ্যা-বিনোদিনী' ও 'সাহিত্য-সরস্বতী' উপাধি চৌদ্দ টাকায় বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। ফেরিওয়ালার নিকট জিনিস কিনিলে সস্তায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমার প্রয়োজন নাই।"

বলা প্রয়োজন ছিল না। হাততালিতে অতি উৎফুল্ল হবার মানুষ ছিলেন না তিনি, যেমন ছিলেন না বিদ্রূপে পরাভূত হবার পাত্র। যথার্থই শিল্পী ছিলেন একজন। ভগ্নী করিমুন্নেসার কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর আশীর্বাদই সহায় বলেছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উৎসর্গ করেছিলেন 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটি, যার উৎসর্গ পত্রে বলেছেন, "দাদা! আমি আশৈশব তোমার স্নেহ-সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। আমি জানি না, পিতা, মাতা, গুরু শিক্ষক কেমন হয়—আমি কেবল তোমাকেই জানি।" অতি গভীর কৃতজ্ঞতার কথা। এই দুই ভাই-বোনের একজন শেখালেন বাংলা অপরজন শেখালেন ইংরেজি; উভয়ের প্রভাব স্থায়ীভাবে পড়েছিল তাঁর ওপর, কিন্তু রোকেয়া ছিলেন রোকেয়াই, যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন তিনি অন্যদের প্রতি তাঁর আসল কৃতজ্ঞতা থাকবার কথা তাঁর নিজের কাজেই—তা তিনি বলুন আর নাই বলুন। শিল্পী শিল্পী হয় নিজের কারণে; প্রভাব থাকে, কিন্তু তা থাকে প্রভাব গ্রহণ করবার শক্তি থাকে বলেই।

২

লেখক হিসাবে বেগম রোকেয়ার গুণ অনেক ক'টি, প্রথম ও প্রধান গুণ অবশ্যই তাঁর মৌলিকতা। এই মৌলিকতা একাধারে কল্প শক্তির ও যুক্তিবাদিতার। আর আছে কৌতুকবোধ, যাকে বাদ দিয়ে রোকেয়ার কথা ভাবাই যায় না। এখানেও তিনি বিদ্যাসাগরের কাছাকাছি।

'সুলতানার স্বপ্নে'র কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কাহিনীটি যিনি বলছেন তাঁর নাম সুলতানা। তাঁর ধারণা তিনি জেগে ছিলেন, কিন্তু আসলে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। সুলতানা দেখেন আশ্চর্য এক জগতে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নাম তার নারীস্থান। এখানে মশা নেই, পুলিশ নেই, অশান্তি

www.pathagar.com

নেই। সারা নামে যে মহিলা সুলতানার সঙ্গ দিচ্ছেন তিনি বলছেন, স্বয়ং শয়তান যেখানে শৃঙ্খলাবদ্ধ সেখানে শয়তানীর সুযোগ কোথায়? তাই সবাই অত্যন্ত নিরাপদ। পুরুষেরা রয়েছে অন্তঃপুরে। জননিরাপত্তার স্বার্থে হিংস্র পশু ও বদ্ধ উন্মাদদেরকে যেমন চলাফেরার স্বাধীনতা দিতে নেই, তেমনি পুরুষদেরকেও ছেড়ে দেওয়া যাবে না রাস্তায়। তারা থাকবে ঘরে। পুরুষদের কাজ দেহের, মেয়েদের কাজ মস্তিষ্কের। বিভাজনটা এই রকমেরই। পুরুষ বন্দী হলো কেন? হলো নিজের ব্যর্থতায়। পার্শ্ববর্তী স্বেচ্ছাচারী রাজ্য থেকে কয়েকজন বিদ্রোহী পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল এই রাজ্যে। নারীস্থানের রানী তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। দেবেনই তো, তিনি ন্যায়ের পক্ষে, সর্বক্ষেত্রে। ফলে যুদ্ধ লাগল দুই রাজ্যের মধ্যে। এ রাজ্যের বহু সৈন্য [সবাই তারা পুরুষ, বলাই বাহুল্য] আহত ও নিহত হতে থাকলো। কি করা যায়? সবাই ভারি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শেষে এগিয়ে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান। বলার নিশ্চয়ই অপেক্ষা রাখে না যে, তিনি পুরুষ নন, মহিলাই। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ছাত্র নেই, সবাই ছাত্রী। দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবিকা নিয়ে রওনা দিলেন তিনি। না, সীমান্ত পর্যন্ত যাননি। প্রয়োজন হয়নি যাওয়ার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগৃহীত সূর্যের কিরণ দূর থেকে নিক্ষেপ করেছেন শত্রু সীমান্তে। শত সহস্র সূর্য মর্ত্যে নেমে এলে যেমন প্রবল উত্তাপ সৃষ্টি হবার কথা, তেমনটা ঘটেছিল। শত্রুপক্ষ দগ্ধ হয়ে পলায়ন করলো। যুদ্ধযাত্রার আগে অধ্যক্ষা শর্ত দিয়েছিলেন পুরুষদের সবাইকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করার। পর্দার প্রয়োজনে এটা আবশ্যক। সেই থেকে এ রাজ্যে পুরুষেরা ঘরে থাকে; মেয়েরা রয়েছে বাইরে। সুলতানা পুরুষশাসিত ভারতবর্ষের মেয়ে; চলাফেরায় দ্বিধা ছিল প্রবল, লজ্জা ও সংকোচে জড়িয়ে যাচ্ছিল পা; ভগিনী সারা বললেন, "এ রাজ্যে অমন পুরুষপনা চলবে না, মেয়েরা এখানে স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।"

রোকেয়ার সুপারিশ হচ্ছে প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের কাজে ব্যবহারের। পুরুষকে জব্দ করা তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মুক্তি; পুরুষ পারে না উপরন্তু বাধার সৃষ্টি করে; তাই তাকে ঘরে আটকে রাখার বিধান। ওই কল্পরাজ্যে দু'টি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আমাদের দেশের মৌলবাদীদের একাংশ স্বতন্ত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষপাতী, রোকেয়ার বিশ্ববিদ্যালয় মৌলবাদী নয়; তাঁর লক্ষ্য মেয়েদেরকে পেছনে ঠেলে নেয়া নয়, সামনে এগুতে দেয়া। বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে বিজ্ঞানের গবেষণা চলছে সোৎসাহে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় আবিষ্কার করেছে মেঘ থেকে পানি সংগ্রহের পদ্ধতি, যার ফলে মানুষকে আর আকাশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। অপরটি আবিষ্কার করেছে সৌর শক্তি সংগ্রহের পদ্ধতি। যে শক্তি দিয়ে রান্নাবান্না থেকে যুদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত সব কিছু করা যায়। ওরা বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে কৃষি কার্যে। স্মরণ করা যেতে পারে, এ লেখা ১৯০৫ সালের; এসব ধারণা যখন ভারতবর্ষে দূরে থাক, অন্যদেশেও আসেনি।

উদ্ভাবনা, যুক্তিবাদিতা, কৌতুকপ্রিয়তা—সবই রয়েছে এই রচনায়। যেমন আছে তাঁর উপন্যাস 'পদ্মরাগে।' 'পদ্মরাগের' শুরুতেই নৈহাটি স্টেশনে রাত ১১টায় সাহেবী পোশাকে সজ্জিত যে রহস্যময় যুবককে দেখি আসলে তিনি পুরুষ নন, মহিলা একজন। সেটা আমরা জানতে পারি, তখন নয়, অনেক পরে। ইংরেজ নীলকর চার্লস রবিন সনের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে পলায়ন তৎপর ও আত্মগোপনকারী এই মেয়েটির আসল নাম জয়নাব, কিন্তু যে 'তারিণীভবনে' তিনি আশ্রয় নিলো সেখানে নাম নিয়েছে সিদ্দিকা। একজনের বাগদত্তা ছিল সে। ওই লোকটি সম্পত্তির কারণে ও আত্মীয়দের চাপে সিদ্দিকাকে ত্যাগ করে আরেকজনকে বিয়ে করে। তার সে বিয়ে সুখের হয়নি। ঘটনাক্রমে ওই ভদ্রলোক মি. লতীফ আলমাস, সিদ্দিকার আশ্রয়ে এসে পড়ে। আরো পরে লতীফের স্ত্রী যখন মারা গেলো, লতীফ তখন সিদ্দিকাকে বিয়ে করতে চায়। সিদ্দিকার যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল এখন তার সঙ্গেই সংসার করার। আপত্তি কোথায়? এতো হবে সোনায় সোহাগা। সিদ্দিকা কি লতীফকে ঘৃণা করে? না, তা নয়। 'আল্লাহ জানে,

www.pathagar.com

আমার মনে কোন বিদ্বেষভাব নাই", বলেছে সে। বান্ধবী সৌদামিনীর যুক্তি, "কিন্তু মিঃ আলমাস তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। তাহার জীবনটা অভিশপ্ত করিবে?" সিদ্দিকার উত্তর, "কি আর করা যায়।" তারপর অতিনিম্ন স্বরে বলে, "না হয় প্রতিদানে আমিও তাঁহাকে ভালবাসি।" ভালোবাসেও বটে গোপনে, অন্য কেউ জানে না, সিদ্দিকা জানে।

ভালবাসবে কিন্তু গৃহে যাবে না গৃহিণী হবে না। অনুনয়-কাতর ব্যারিস্টার লতীফ আলমাসকে বলছে সে শান্ত কণ্ঠে, "না। তুমি তোমার পথ দেখ, আমি আমার পথ দেখি"। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছদের নাম, সহযাত্রী। একই ট্রেনে যাচ্ছে সিদ্দিকা ও লতীফ আলমাস, এক সঙ্গে। লতীফ আশা করেছিল সিদ্দিকা তার মত বদলাবে। পাঠকও আশা করে মিলনান্ত হবে কাহিনী। কিন্তু তা হলো না। বেগম রোকেয়া লিখছেন, লতীফ কিছুক্ষণ পরে উত্তর শ্রবণের আশায় বঞ্চিত হইয়া মুক্ত বাতায়ন দিয়া মুখ বাহির করিয়া নিবিষ্টচিত্তে মাঠের দৃশ্য দেখিতেছিলেন বটে, কিন্তু একবার 'চুরি করিয়া' সিদ্দিকার লজ্জানম্র পদ্মরাগবৎ আরক্ত বদনখানি দেখিতেছিলেন আর হয়ত ভাবিতেছিলেন, 'প্রণয়ের পুরস্কার/থাকে যদি অভাগার/এ রোদন পশে যদি বিধাতার শ্রবণে/জন্মান্তরে পাব আমি এ রমণী রতনে।" আহা। 'জন্মান্তর' তো পরের কথা—এখন যে ইহ-জীবনের দেখা সাক্ষাৎ ফুরাইতে চলিল।—ট্রেন চুয়াডাঙ্গায় আসিয়া পৌঁছিল আর কি। সত্যিই চুয়াডাঙ্গা স্টেশন। লতীফ সিদ্দিকার হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামাইলেন। এই তাহাদের শেষ দেখা।"

বুঝি বা অপ্রত্যাশিত; লতীফের জন্য তো বটেই, পাঠকের জন্যও বটে। ওইখানেই শেষ। ভালোবাসা মিথ্যা নয়, কিন্তু প্রত্যাখ্যানকারী স্বামীর গৃহিণী হওয়াও সম্ভব নয়।

সন্দেহ কী সিদ্দিকা রোকেয়ার উপাদান দিয়ে গড়া। সিদ্দিকারা আপোস করে না। 'তারিণীভবনের' মেয়েরা কেউ কেউ সিদ্দিকাকে পরামর্শ দিয়েছে। ফিরে যেতে। বলেছে স্বামী গৃহে গিয়ে স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর করুক। ব্যারিস্টার মিঃ আলমাস যদি 'তারিণীভবন'কে সাহায্য করে সেও হবে একটি উপরি পাওনা। জবাবে সিদ্দিকা বলছে, সেটা সম্ভব নয়। "আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকু মা সব উদীয়মান তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন, 'আর রাখ তোমাদের পথ ও তেজ—ওই দেখ না, এতখানি বিড়ম্বনার পর জয়নাব [সিদ্দিকার আসল নাম] আবার স্বামী সেবাই জীবনের সার করিয়াছিল। আর পুরুষ সমাজ সগর্বে বলিবেন, 'নারী যতই উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহীয়সী হোক না কেন—ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে।' আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সার ধর্ম নহে।"

তাহলে কি তারিণীভবনেই থাকবে সিদ্দিকা, বাকি জীবনভর? না, তাও নয়। বলছে সে, "এই তারিণীভবনেরও বদনাম করিব না যে, "যত লক্ষ্মীছাড়ীর দল ওইখানে গিয়া জুটিয়াছে।" আমি চুয়াডাঙ্গায় ফিরিয়া যাইব। সিদ্দিকা সেখানে গিয়ে ভ্রাতষ্পুত্রকে লালন করবে, জমিদারী দেখবে এবং সেই সঙ্গে "পতিত মুসলমান সমাজের ললনাবৃন্দকে জাগ্রত করিতে প্রাণপণে" চেষ্টা করবে।

সিদ্দিকার এই সিদ্ধান্ত কি আরোপিত? না, তা নয়। লেখিকা সিদ্দিকাকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, যদি স্বামীর সঙ্গে সে সন্ধি করে ফেলতো তাহলেই বরঞ্চ ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হতো। সিদ্দিকার নিজের মধ্যে এবং তার পরিবারের সংস্কৃতিতে বিদ্রোহ আছে। তার ভাই নীলকর রবিনসনের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে, কিন্তু আপোস করেনি।

'পদ্মরাগেও' একটি কল্পলোক রয়েছে; 'সুলতানার স্বপ্নে' যেটি রাষ্ট্র, সেটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে নানা জায়গা থেকে আশ্রয়হীন ও লাঞ্ছিত মেয়েরা আসে। এখানে সকলেই সকলের

www.pathagar.com

বোন, দিদি কিংবা বু। নারীস্থানে যেমন এখানেও তেমনি, স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবহার নেই। অলংকার কেউ পরে না, কুসংস্কারবশত দুয়েকজন শুধু শাখা রাখে হাতে।

বেগম রোকেয়ার পরিহাসপ্রিয়তার কথা যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন তাঁরা সবাই উল্লেখ করেছেন। সেই গুণটি 'পদ্মরাগে'ও বিদ্যমান।

তাঁর 'অবরোধবাসিনীতে যে ৪৭টি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুস সত্য ঘটনার বিবরণ আছে তাদের প্রত্যেকটিই করুণ। কিন্তু কাহিনীগুলো বলেছেন তিনি বড় সরস করে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন নিজের মাতাকে, উৎসর্গপত্রে রয়েছে, "এই গ্রন্থখানি আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ জননী মোসাম্মত রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী মরহুমার স্মৃতির চরণে ভক্তির সহিত সমর্পিত হইল। আমার স্নেহময় জননী অবরোধ প্রথার অত্যন্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন।" তারপর আপন শৈশবের একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন রোকেয়া যেটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পরিণত হতে পারতো। এই যে তাঁর মাতার অবরোধপ্রিয়তা এর কারণও রোকেয়ার জানা ছিল। জানতেন তিনি যে, ব্যাপারটা সাংস্কৃতিক। যে-কথা ১৯০৫ সালে লিখিত একটি অত্যন্ত মৌলিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' নামের এই লেখাটিতে তিনি দেখাচ্ছেন মেয়েরা পুরুষের কর্তৃত্ব কি ভাবে মেনে নেয়। কেবল অর্থনৈতিক কারণে নয়, সাংস্কৃতিক কারণেও। নইলে যে স্ত্রী "দাসীবৃত্তির দ্বারা অর্থ উপার্জন করে পতিপুত্রকে প্রতিপালন করে" সেও কেন অকর্মণ্য পুরুষকে 'স্বামী' বলে মেনে নেয়? তিনি বলেছেন, "ইহার কারণ বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তরে বাহিরে মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে।"

মেয়েদের অলংকারপ্রীতি সম্পর্কে বলেছেন, এ হচ্ছে দাসত্বের নির্দশন, অন্য কিছু নয়। কৌতুক করে বলেছেন, "অলংকার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহাতে কোন তন্বী আমাকে পুরুষের গুপ্তচর ভাবিতে পারেন"। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যে পুরুষকে সাহায্য করা নয়, নারীকে মুক্ত করাই। "কারাগারে বন্দিগণ পায়ে লৌহনির্মিত বেড়ী পরে, আমরা আদরের জিনিস বলিয়া স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ 'মল' পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহনির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত চুড়ি। বলাবাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না। কুকুরের গলে গলাবদ্ধ [Dog Collar] দেখি, উহাদের অনুকরণের বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে। অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহশৃংখলে আবদ্ধ থাকে, সেই রূপ আমরা স্বর্ণশৃংখলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি হার পরিয়াছি। গো স্বামী বলদের নাসিকাবিদ্ধ করিয়া 'নাক দড়ি' পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে 'নোলক' পরাইয়াছেন.....অতএব দেখিলেন ভগিনী, আপনাদের ঐ বহুমূল্য অলংকারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আবার মজা দেখুন, যাহার শরীরে দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আবার মজা দেখুন, যাহার শরীরে দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক তিনি সমাজে ততোধিক মান্যগণ্য।"

চিন্তার যুক্তিবাদিতা এবং উপস্থাপনের ভঙ্গি দুটোই মৌলিক। আরো দু'টি ছোট উদাহরণ নিতে পারি অন্য দু'টি রচনা থেকে— একটি 'অর্ধাঙ্গী', অন্যটি 'জ্ঞানফল'। 'অর্ধাঙ্গী'তে তিনি রাম ও সীতার সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত ধারণাটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রোকেয়া বলছেন রাম অবশ্যই সীতাকে ভালোবাসে। কিন্তু এই ভালোবাসা হচ্ছে বালকের ভালোবাসা, তার পুতুলের জন্য। পুতুলটি হারিয়ে গেলে সে মন খারাপ করবে, অবশ্যই; চুরি হয়ে গেলে চোরকে শাস্তি দেবার জন্য অস্থির হবে; কিন্তু পুতুল তো পুতুলই, যতই প্রিয় হোক। সীতা রামের হাতের পুতুল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। 'জ্ঞানফলে'র বক্তব্যটি আরো সাহসী। আদি-মাতা হাওয়াকে সেখানে পাপী

www.pathagar.com

হিসাবে দেখানো হচ্ছে না, দেখানো হচ্ছে প্রথম জ্ঞানলাভকারী হিসাবে। রোকেয়ার ওই 'স্বর্গে' শয়তানের স্থান সেই। তিনি লিখছেন, "একদিন হাওয়া অন্যমনস্ক হয়ে সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলেন। ফল ভক্ষণ করা মাত্র হাওয়ার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হ'ল। এক প্রকার মর্মবেদনায় তাঁর হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হ'ল। পত্নীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানফল ভক্ষণ করে আদমেরও জ্ঞানোদয় হ'ল। তিনিও নিজের দৈন্যদশা হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করতে লাগলেন। ক্রমে আদম ও হাওয়ার মনে স্বাধীন হওয়ার চেতনা জাগলো। স্বর্গের নিরবচ্ছিন্ন সুখ তাদের কারো মনঃপুত হলো না। "এই কি স্বর্গ? প্রেমহীন, কর্মহীন, অলস জীবন—ইহাই স্বর্গ সুখ?" এরপর জগদীশ্বর আদম, দম্পত্তির মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। পৃথিবীতে "তাঁহারা অভাব স্বাচ্ছন্দ্য, শোক হর্ষ-রোগ, আরোগ্য, দুঃখ, সুখ প্রভৃতি বিবিধ আলো আঁধারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রকৃত দাম্পত্য জীবন লাভ করিলেন।"

এই ব্যাখ্যার মৌলিকত্বে সন্দেহ করবে কে।

বেগম রোকেয়া রাষ্ট্রের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন না। 'সুলতানার স্বপ্নে'র 'নারীস্থান' একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। স্বাধীন বলেই তার নিয়ম কানুন আলাদা হতে পেরেছে। 'পদ্মরাগে' সিদ্দিকার প্রেমিক ব্যারিস্টার লতীফ আলমাস ইংরেজের আইন সম্বন্ধে বলছে, "দৈব ঘটনাবলী কতকটা আমাদের ব্রিটিশ বিচারের মত—রামের পাপের জন্য শ্যামকে ভুগিতে হইবে, আর শ্যামের পূণ্যফল ভোগ করিবে কানাই।" 'মতিচূর' প্রথম খণ্ডের নিবেদনে রয়েছে, "বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, ডেকান [হায়দারাবাদ], বোম্বাই, ইংল্যান্ড—সর্বত্র হইতে একই ভাবে উচ্ছ্বাস উত্থিত হয় কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, ইহার কারণ সম্ভবত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবলাদের আধ্যাত্মিক একতা"। 'নিরীহ বাঙালী' প্রবন্ধে 'আত্মপ্রশংসা' করতে গিয়ে বলেছেন বাঙালীরা হচ্ছে "মূর্ত্তিমতী" কবিতা, এবং "যদি ভারতবর্ষকে একখানা উপন্যাস মনে করেন তবে বাঙালী তাহার নায়িকা।" "ভারতের পুরুষ সমাজে বাঙালী পুরুষিকা। অতএব আমরা মূর্ত্তিমান কাব্য।" যোগ করেছেন, "আমরা.....অনেক প্রকার সহজ কাজ নির্বাহ করিয়া থাকি। যথা—১. রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা 'রাজা' উপাধি লাভ করা সহজ।.....৩. অল্পবিস্তর অর্থ ব্যয়ে দেশে কোন মহৎ কার্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা 'খা বাহাদুর' বা 'রায় বাহাদুর' উপাধির জন্য অর্থ ব্যয় করা সহজ।.....৮. কাহারও নিকট প্রহার লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহুবলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ।" এ প্রবন্ধ ১৯০৩ সালে লেখা। পাঁচ বছর পরে এর সঙ্গে একটি পাদটীকা যোগ করেন, "সুখের বিষয় বর্তমান সালে আর বাঙালী 'পুরুষিকা' নহেন। এই পাঁচ বছরের মধ্যে এমন শুভ পরিবর্তন হইবে, ইহা কে জানিত? জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন আমরা সাহসী বাঙালী।" কি ঘটেছে এই পাঁচ বছরে? ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের উদ্যোগ, তারপরে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ—ঘটনা হচ্ছে এই রকমের। তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে এই যে, রোকেয়া মুসলিম লীগের দৃষ্টিতে ওইসব ঘটনাকে দেখছেন না। মুসলিম লীগ ইতোমধ্যেই গঠিত হয়ে গেছে, কিন্তু রোকেয়া তার সঙ্গে নেই। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'নিরীহ বাঙালী'ই তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা।

১৯০৮ সালে সন্ত্রাসবাদী কানাইলাল বোমা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে প্রাণ দেন, ফাঁসীকাষ্ঠে। কানাইলাল আপীল করেননি। এই বীরকে স্মরণ করে রোকেয়া একটি কবিতা লেখেন 'নিরুপায় বীর' নাম দিয়ে। বলেছেন, কানাইলালের বিপুল আদর হয়নি সত্যি, কিন্তু তার প্রতি গোপন ভালোবাসা রয়ে গেছে মানুষের। উল্লেখযোগ্য যে, এই কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু' সাপ্তাহিকে, ১৯২২ সালে। অন্য একটি কবিতাতে বেগম রোকেয়া বিদ্রূপ

www.pathagar.com

করছেন আপীলকামী বাঙালীদের, যারা নিজেদের নাম স্বাক্ষর করে এইভাবেঃ "যত ভূমি অধিকারী/ যে ক'টি লাঙুলধারী/যার আছে জমিদারী/যত সভ্য অনাহারী?' 'মুক্তিফল' নামে গদ্য রচনায় এই দরখাস্তকারীদের তিনি ঠাট্টা করেছেন।

আসলে বেগম রোকেয়া বিদ্যাসাগরকেও ছাড়িয়ে যান তাঁর বাঙালীত্বে; বিদ্যাসাগরের জগতে মুসলমানেরা ছিল না, রোকেয়ার জগতে কেবল মুসলমানই নয়, হিন্দু রয়েছে। 'নিরীহ বাঙালী' কোনো একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ নয়, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। রোকেয়ার 'তারিণীভবনে' অস্পৃশ্য কেউ নয়।

৩

বেগম রোকেয়ার সময়ে যাঁরা গদ্য লিখেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ও মীর মশাররফ হোসেন। এঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে আলাদা। এঁদের কারো লেখায় বাগ্মিতা রয়েছে, কারো বৈশিষ্ট্য বাস্তবাদিতায়, কেউ বিশেষভাবে যুক্তিবাদী। বেগম রোকেয়ার লেখায় ওই সব গুণ দেখি, কিন্তু তিনিও এঁদের সবার থেকে স্বতন্ত্র। এই লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মীর মশাররফ হোসেন। বলা যায় তিনিই প্রধান; বেগম রোকেয়া তার চেয়ে অধিক যুক্তিবাদী। করিমুন্নেসা সম্পর্কে মীর সাহেবের বিরূপতার কথা উল্লেখ করেছি, এও উল্লেখ করা যায় যে, মীর মশাররফ ইংরেজের প্রতি যতটা দুর্বল ছিলেন, রোকেয়া মোটেই ততটা ছিলেন না। অথচ তিনি ইংরেজভক্ত হলে বিস্ময়ের কারণ হতো না। রোকেয়া খুব ভালো ইংরেজি জানতেন, এবং ইংরেজি জানা প্রয়োজনীয় মনে করতেন, তার স্বামী ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, বিলাতফেরত উচ্চপদস্থ কর্মচারী, খান বাহাদুর উপাধিও পেয়েছিলেন তিনি। পর্দার আড়ালে থেকেও বেগম রোকেয়া সাম্রাজ্যবাদকে ঠিকই চিনে নিয়েছিলেন মীর মশাররফ যা চিনতে চাননি। দীনবন্ধু মিত্রকে মীর মশাররফ গালমন্দ করেছিলেন 'নীলদর্পণ' নাটকে ইংরেজের সমালোচনা করার দরুন, বলেছিলেন 'পাতফোঁড়, যে পাতে খায় সেই পাত ফুটো করে ফেলে, এবং তাঁর নিজের লেখা 'জমীদার দর্পণ' শেষ হয়েছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভক্তিপূর্ণ আবেদনের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তিগত জীবনে বেগম রোকেয়া যে একজন সুখী মানুষ ছিলেন তা মোটেই নয়। তাঁর দুঃখের স্থানগুলোর কয়েকটি আমরা দেখতে পাই তাঁর চিঠিতে। সাহিত্যিক দিক দিয়েও তিনি যে আক্রান্ত হননি তা নয়। বলা হয় যে, তাঁর ভাব ও ভাষা অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকদের থেকে গৃহীত। রোকেয়ার জবাবটি ছিল বড় শান্ত; "অপরের ভাব কিংবা ভাষা স্বায়ত্ত করিতে যে সাহস ও নিপুণতার প্রয়োজন তাহা আমার নাই। সুতরাং অদৃশ চেষ্টা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

সম্ভব যা ছিল তাই করেছেন। নিজের দুঃখগুলোকে জয় করেছেন সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। মৃত্যুর চার বছর আগে, ১৯২৮ সালে 'অবরোধবাসিনী'র নিবেদনে রোকেয়া লিখেছেন, "আমি কারসি ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুন্দর পাথর কুড়াইয়াছি, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে গিয়া বিচিত্রবর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়াছি, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে গিয়া বিচিত্রবর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের ২৫ বছর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি। হজরত রাবিয়া বসরী বলিয়াছেন, 'আল্লাহ! যদি আমি দোজখের ভয়ে এবাদত করি, তবে আমাকে দোজখে নিক্ষেপ কর; আর যদি বেহেশতের আশায় এবাদত করি তবে আমার জন্য বেহেশত হারাম হউক। আল্লার ফজলে সমাজসেবা সম্বন্ধে আমিও এখন ঐরূপ বলিতে পারি।"

www.pathagar.com

না কোনো কিছু পাবার লোভে নয়, কাজ করেছেন অন্তর্গত প্রেরণায়। যে রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সে রাতেও লিখছিলেন তিনি, একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ টেবিলে রেখে গেছেন, চাপা দিয়ে।

আসলে তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন, যিনি লেখার ভেতর দিয়ে ও প্রতিষ্ঠান গড়ে সমাজের সেবা করেছেন। লেখক বলেই তিনি সমাজসেবক, সমাজসেবক বলে লেখক নন। সাহিত্যিক প্রেরণা তাঁকে অবসর দেয়নি, এবং দুঃখকে শক্তিতে পরিণত করতে শিখিয়েছে। তাঁর মৃত্যু ১৯৩২ এ; কিন্তু তিনি মনে হয় অনেক দূরের মানুষ। তার কারণ তাঁর সময়ে সমাজ ছিল অনেক পিছিয়ে। সেই পশ্চাৎপদতা তাঁকে চারদিক থেকে পেছনে টেনেছে। একশ' একটা কারণ ছিল তাঁর জন্য, পরাভূত হবার; কিন্তু একটা কারণ ছিল পরাভূত না-হবার। সেটি এই যে, তিনি একজন শিল্পী ছিলেন। পাখি গান গায় নিজের সুখে, অভ্যাসে, শিল্পী সৃষ্টি করেন ভেতরের অনুপ্রেরণায় এবং অন্যের জীবনে প্রবেশের আগ্রহে। বেগম রোকেয়া তাই করেছেন।

তথ্যের উৎস

১. "রোকেয়া রচনাবলী" সম্পাদক আবদুল কাদির, ১৯৭৩
২. "রোকেয়া জীবনী", শামসুন নাহার মাহমুদ, ১৯৪৮
৩. "পত্রে রোকেয়া পরিচিতি", মোশফেকা মাহমুদ, ১৯৬৫
৪. "বেগম রোকেয়া, জীবন ও সাহিত্য", মোতাহার হোসেন সুফী, ১৯৮৬

[সংকলিত, ঈদ সংখ্যা বিচিত্রার সৌজন্যে।]

ডাঃ মোঃ আবদুল ওহাব শিকদার
বিডিএস (ঢাকা) বিসিএস (স্বাস্থ্য)
শাখা প্রধান রোগ নির্ণয় বিভাগ
ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল মিরপুর, ঢাকা।

চেম্বার ঃ শ্যামলী ডেন্টাল ক্লিনিক
শ্যামলী সিনেমা হলের দোতলায় (মেইন গেটের পশ্চিম পার্শ্বে)
সময় ঃ বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা ৩০ মিঃ
ফোন ঃ (ক্লিনিক) ৮১১০৯৫৩, (বাসা) ৮০১৪৭৬৫
শুক্রবার বন্ধ সকল সরকারি ছুটির দিন খোলা

www.pathagar.com

নারী-সূর্য রোকেয়া

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

আমার এই লেখা ধরি মাছ না ছুঁই পানির মত লেখা হবে। কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান না লাভ করে সে সম্বন্ধে লেখাকে আমি অন্যায় মনে করি। তবু রোকেয়া সম্বন্ধে এ লেখাটি খন্দকার আবদুল মোমেন সাহেবের অনুরোধে লিখতে হল। এর আগে সম্ভবত আল মুজাদ্দেদ-এর কোন সংখ্যায় পোস্ট হিসাবে রোকেয়ার উপর একটি লেখা লিখেছিলাম। আমার মনে আছে সেই লেখায় আমি রোকেয়ার পর্দা সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। সে উপমাটি যে একটি অতি কল্পশক্তি বিদগ্ধ মনের ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। রোকেয়া পর্দার বাড়াবাড়িতে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তবে পর্দার কোন প্রয়োজন নেই সে কথা তিনি বলেননি। তিনি নারী মুক্তি; নারী স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। কিন্তু নারী-বর্বরতা বা নারী–অশ্লিলতা চাননি। তিনি সভ্যতা বর্জিত নারী স্বাধীনতা চাননি, তিনি চেয়েছিলেন ভব্যতা আবৃত রুচি-সংস্কৃত নারী-সংস্কৃত নারী স্বাধীনতা। অলঙ্কার-প্রদর্শনকারী অহঙ্কারের নারী স্বাধীনতা নয় জ্ঞানের অলঙ্কার সুশোভিত নারী স্বাধীনতা। এ ব্যাপারে রোকেয়ার দু'টি উপমার উদ্ধৃতি আমি প্রাসঙ্গিক মনে করছি—

১. মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই সকল সভ্য জাতিদেরই কোন না কোন রূপ অবরোধ প্রথা আছে। এই অবরোধ প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে? এমন পবিত্র অবরোধ প্রথাকে যিনি "জঘন্য" বলেন, তাঁহার কথার ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম।

সভ্যতা [civilization]-ই জগতে পর্দা বৃদ্ধি করিতেছে। যেমন পূর্বে লোকে চিঠিপত্র কেবল ভাঁজ করিয়া পাঠাইত, এখন সভ্যলোকে [civilized] লোকে চিঠির উপর লেফাফার আবরণ দেন। চাষারা ভাতের থালা ঢাকে না; অপেক্ষাকৃত সভ্যলোকে খাদ্য-সামগ্রীর তিন চারিপাত্র একখানা বড় থালায় [tray-তে] রাখিয়া উপরে একটা "খানপোষ" বা "সরপোষ" ঢাকা দেন; যাঁহারা আরও বেশী সভ্য তাঁহাদের খাদ্যবস্তুর প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র আবরণ থাকে। এইরূপ আরও

www.pathagar.com

উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন টেবিলের আবরণ, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি। –[বোরকা ঃ মতিচূর]

২. এখন ভ্রাতাদের সমীপে নিবেদন এই,—তাহারা যে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কন্যাকে জড় স্বর্ণ-মুক্তার অলঙ্কারে সজ্জিত করেন। ঐ টাকা দ্বারা তাহাদিগকে জ্ঞান-ভূষণে অলঙ্কৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্বচনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না। অতএব নারীর শোভন অলঙ্কার ছাড়িয়া জ্ঞানভূষণ লাভের জন্য ললনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। –[ঐ ঃ ঐ]

এই অনায়াস বৈদগ্ধ্য অলঙ্কারে সজ্জিত মহানারীর দুচারটি প্রবন্ধ পড়ে–প্রায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে– আমার যেটুকু জ্ঞান অর্জন হয়েছে তাতে তাঁকে বাঙালী মুসলিম নারীদের শির মুকুট বললে বোধ হয় সামান্য বলা হয়। সহজাত রচনাশক্তিও ছিল তাঁর অসাধারণ। একটি বাক্যকে কতটা শ্লীলভাবে পরিবেশন করতে হয় সে শিক্ষাটাও তিনি স্বভাবজাত প্রতিভা থেকে অর্জন করেছিলেন। বলাবাহুল্য তাঁর লেখা প্রবন্ধগ্রন্থ 'মতিচূরে'র 'স্ত্রী জাতির অবনতি', 'নিরীহ বাঙালী', 'অর্ধাঙ্গী', 'বোরকা'–প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি যে ভাষার ব্যবহার করেছেন তা বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৩১২ সনের [১৯০৫] 'নবনূরে' গ্রন্থ সমালোচনায় 'মতিচূর' সম্পর্কে বলা হয়—

> "এই গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং রচনাভঙ্গি অতি মনোরম। কোন পুরুষ লেখকের পক্ষেত এইরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা শ্লাঘার বিষয়। লেখিকা তাঁহার বক্তব্য ভালো করিয়াই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন না।"

নারী বলে 'নবনূর' কিন্তু রোকেয়াকে সমালোচনা করতে ছাড়েনি। অনেক প্রশংসার পরে [এ প্রশংসা অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য ছিল] তাঁকে এইভাবে সমালোচনা করা হয়েছিল—

> "মতিচূর রচয়িত্রীর একটি দোষের কথা এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গ্রন্থে মাদ্রাজের Christian Tract Society-র প্রকাশিত Indian Reform সম্বন্ধীয় পুস্তিকাসমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়াই আমাদের ধারণা। খৃস্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া আমাদের সম্বন্ধে পাদরী সাহেবগণ যাহা বলেন বা বলিয়াছেন, লেখিকার নিকট তাহা অভ্রান্ত সত্য রূপেই পরিগণিত হইয়াছে। তাঁহার মতে আমাদের সবই কু, আর ইউরোপ আমেরিকার সবই সু।"

এই সমালোচনার আংশিক কথাও সত্য নয়। সাহসিনী রোকেয়া নারী সমাজের প্রতি মমতাবশত শুধু মুসলিম সমাজ নয় খ্রীস্টান সমাজকে পর্যন্ত কটাক্ষ করতে পিছপা হন নি। তিনি তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে বলেছেন—

> "খ্রীস্টিয়ান সমাজে যদিও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে। তবু রমণী আপন স্বত্ব ষোল আনা ভোগ করিতে পায় না। তাহাদের মন দাসত্ব হইতে মুক্তি পায় না। স্বামী ও স্ত্রী কতক পরিমাণে জীবনের পাশাপাশি চলিয়া থাকেন বটে; কিন্তু প্রত্যেক উত্তমার্ধই [Better half] তাঁহার অংশীদার [Partner-এর] জীবনে আপন জীবন বিলাইয়া তন্ময়ী হইয়া যান না। স্বামী যখন ঋণজালে ভাবিয়া ভাবিয়া মরমে মরিতেছেন, স্ত্রী তখন একটা নূতন টুপীর [bonnet-এর] চিন্তা করিতেছেন। কারণ তাহাকে যেমন মূর্ত্তিমতী কবিতা হইতে শিক্ষা দেওয়া

www.pathagar.com

হইয়াছে—তাই তিনি মনোরমা কবিতা সাজিয়া থাকিতে চাহেন। ঋণদায়রূপ গদ্য [prosaic] অবস্থা তিনি বুঝিতে অক্ষম।"

এই লেখায় খ্রীস্টান প্রশস্তি প্রকাশ পায়নি। বরং এতে প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্টবাদী চরিত্রের স্বরূপ, তাঁর মৌলিক চিন্তা। সমালোচকের এই কথাই সেখানে সত্য হয়ে উঠেছে— "তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতখানি সামজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই।"

ভাবতে অবাক লাগে সেই প্রায় অন্ধকার যুগে; মুসলিমরা যখন ইংরেজি শেখাটাকে প্রায় অপরাধ বলে গণ্য করতেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই গোধূলি-লগ্নে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে শিক্ষালাভ না করেও রোকেয়া ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ইংরেজি শিক্ষা অর্জন হয়েছিল ত সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়া তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহীম সাবেরের সাহচর্যে ও প্রণোদনায়। পরবর্তীকালে তাঁর স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সাহচর্যও হয়ত তাঁকে ইংরেজি শিক্ষায় উদ্বোধিত করে থাকতে পারে; কিন্তু আল্লাহ্-দত্ত মেধা ও প্রতিভাই যে ঐ বিদেশী ভাষাটিকে অনেকখানি নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করতে সাহায্য করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর Sultana's Dream-এর উপর 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত সমালোচনাটির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করলে তাঁর ইংরেজি জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাবে—

> এই ছোট গল্পটি ইংরেজিতে লিখিত। 'মতিচূর' রচয়িত্রীকে আমরা বাংলা সাহিত্যের একজন সুনিপুণ লেখিকা বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু এমন সরল সুন্দর ইংরেজীও যে তিনি লিখিতে পারেন, তাহা জানা ছিল না।

আসলে 'প্রতিভা' শব্দটি নজরুল ইসলামের জন্য যেমন সুপ্রয়োগ তেমনি রোকেয়ার জন্যও সুপ্রয়োগ। রোকেয়ার লেখা পড়তে পড়তে আর একটি বিষয় চোখে পড়বে সেটি নারী জাতি প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে জাতি প্রীতি। Sultana's Dream সম্পর্কে উপরে উক্ত সমালোচকের আর একটি বক্তব্যও রোকেয়ার সামগ্রিক চেতনার শ্রেষ্ঠত্বকে নিরূপণ করবে—

> "সংসারে নারী যে পুরুষের প্রাধান্য না মানিয়াও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের কৃতিত্ব দেখাইতে পারে, এমনকি বিদেশীর আক্রমণ হইতে স্বদেশের গৌরব রক্ষা করিতে পারে, তাহাই লেখিকা দেখাইয়াছেন।"

বুঝতে অসুবিধা হয় না 'সুলতানার স্বপ্ন' ছিল রোকেয়ার স্বপ্ন। নজরুল তাঁর "নারী" কবিতায় লিখেছিলেন— 'সেদিন সুদূর নয় যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।' আজকের বিশ্বে বিভিন্ন দেশে নারীর উর্ধ্বারোহণ ও সর্বোত্তম আসনে উপবেশনের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলা যায় যে নজরুলের ১৯২৫-এ উক্ত বক্তব্য কতটা সত্য ছিল। নারী গুণগ্রাহী নজরুল 'গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়' গানটিতে হযরত খাদিজা, ফাতিমা, রহিমা, রিজিয়া, চাঁদ সুলতানা, জাহানারা, জেবুন্নিসা- প্রমুখের কথা বলেছিলেন— এই গানে তিনি বলেছিলেন— 'জেবুন্নেসার তুলনা কোথায় জ্ঞানের উপাখ্যান'। 'রোকেয়া রচনাবলী' পড়তে পড়তে মনে হয় এই কথাটি রোকেয়া সম্বন্ধেও বোধ হয় তিনি বলতে পারতেন।

পরিশেষে বলি বাংলা একাডেমী তার সমগ্র জীবনে যে কয়টি পুণ্যময় কাজ করেছে কবি সম্পাদক, ছন্দ বিশারদ আবদুল কাদির সম্পাদিত— 'রোকেয়া রচনাবলী' এবং মুহম্মদ শামসুল আলম রচিত "রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্য' তাদের অন্যতম। বাস্তবিকই শিক্ষা, জ্ঞান, নারী মুক্তি চর্চায় মুসলিম সমাজে তাঁর অবদান ছিল নিশি অবসানের সূর্যের মত।

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়া ও ইসলাম

আতিকুর রহমান
সাবেক প্রভাষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা ঃ ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে যে কয়জন মহিয়সী রমণী জন্মগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে বেগম রোকেয়া সবার অগ্রগণ্য। তা সত্ত্বেও বেগম রোকেয়ার প্রকৃত পরিচয় অস্পষ্টতায় ঘেরা। বেগম রোকেয়া ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও মহৎ শিক্ষাবিদ। তার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে মুসলিম মহিলাদেরকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনা, যাকে ইসলামের মূল শিক্ষা বলে মনে করা হয়।

জীবন ও সময়কাল ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রোকেয়ার জন্ম। সেই সময়কাল ছিল বাঙালি মুসলিম সমাজ তথা সমগ্র ভারতীয় মুসলিম সমাজের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সংকটময় সময়কাল। ইংরেজ সরকার কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন [১৭৯৩], লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ আইন [১৮২৮] এবং অন্যান্য পদক্ষেপ মুসলমানদের আর্থ সামাজিক জীবনে মারাত্মক আঘাত হানে। বিশেষ করে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে। কারণ মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা লাখেরাজ সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল [W.W. Hunter, The Indian Musalmans, p.167]। ব্রিটিশকর্তৃক ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রাচ্য শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন ও ফারসীর স্থলে ইংরেজিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ মুসলমানদের অনগ্রসরতার দিকে ঠেলে দেয়।

শিক্ষার অভাবে মুসলমান সমাজ নানাবিধ কুসংস্কার জালে জড়িয়ে পড়ে। ইসলামের মূল আদর্শ সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্বের নীতি থেকে ভারতীয় মুসলিম তথা বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় তখন অনেক দূরে সরে যায়। ধর্মীয় অনুশাসনের বিকৃত ব্যাখ্যার প্রসার ছিল ব্যাপক। আর সত্যিকার সাহসী সংস্কারকের অভাব ছিল প্রকট। [বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন- চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম', তাহমিনা আলম, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত, পৃঃ ১-৩]

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়ার এক ঘনিষ্ঠ ছাত্রী সুসাহিত্যিক শামসুন নাহার তার রচিত "রোকেয়া জীবনী'তে লিখেন- "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভিতর দিয়া আসিয়াছিল জাতির সব চেয়ে বড় অকল্যাণ। ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ভুলিয়া হৃতসর্বস্ব মুসলমান সেদিন হাবুডুবু খাইতেছিল কুসংস্কার আর গোঁড়ামির পাঁকে।" ['রোকেয়া-জীবনী', শামসুন নাহার, পৃ. ২২]

"সর্ববন্ধন থেকে মুক্তি, সর্বদাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি এবং সর্বমানের প্রকৃত আযাদি দান করাই ইসলামের অবদান।" কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন–

অন্যেরে দাস করতে কিংবা নিজে দাস হতে
ওরে-
আসেনি কো মুসলিম দুনিয়ায় ভুলিলি
কেমন করে!

কিন্তু দুঃখ। হাজার আফসোস! ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম জাতি শুধু নাম সর্বস্ব মুসলিম বলে পরিচিত ছিল। সামন্তবাদ, রাজতন্ত্র, পীরতন্ত্র, গোত্রবাদ, কৌলিণ্য প্রথা গোটা জাতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। রক্ষণশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও পশ্চাদমুখিতা সর্বদিক দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে গ্রাস করেছিল।" ['নারী আন্দোলন ও বেগম রোকেয়া', অধ্যাপক মওলানা মুনীরুয্যামান ফরিদী, দৈনিক সংগ্রাম, ৬ই পৌষ, ১৩৮৭]

বেগম রোকেয়া তাঁর তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গোঁড়ামিপূর্ণ অন্ধত্ব ও বিকৃতধর্ম ব্যাখ্যারসে নিমজ্জিত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বক্তব্য রেখেছেন- যার অপব্যাখ্যায় কিছু লোকের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি এমন এক সময়ে আন্দোলন শুরু করেন, যে সময়ে নারী- হিন্দু হোক কিংবা মুসলমান হোক-নানা রকম নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও শোষণের বেড়াজালে আবদ্ধ, বন্দীত্বদশায় মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আর এক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়া নেতাদের অপব্যাখ্যা, Anti Women Sentiment এবং ইসলামের সত্যিকার মূল্যবোধ হারানোর ফলে এ মহিয়সী নারীর বক্তব্যে কিছু ধর্মীয় নেতা ও গোষ্ঠীর দিকে তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ আঘাত, এ আক্রমণ ধর্মের বিপক্ষে তো নয়ই বরং মহান ইসলাম ধর্মের শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন। আর আমাদের বেগম রোকেয়া সেই কাজটি করতেই জিহাদে নেমে পড়েন। আজ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আধুনিক কালের কিছু গোষ্ঠী এরকম একজন সত্যিকার ইসলামী নেত্রীর ভূমিকাকে অপব্যাখ্যা করে তাঁকে পরোক্ষভাবে ইসলামকে আক্রমণ করার হাতিয়ার বানিয়েছে। এটি সত্যিই দুঃখজনক।

বিশ্বাসী নারী ঃ বেগম রোকেয়া তাঁর লেখনীতে নারী-পুরুষকে ইসলামের মৌল ধারার দিকে নিয়ে আসার জন্য আহ্বান করেছেন; দিক নির্দেশনা দিয়েছেন কিভাবে ধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। তার লেখনী দেখে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রচণ্ড আল্লাহ্ভক্ত এবং ইসলামের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল রমণী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে মহান রাব্বুল আলামীনকে অত্যন্ত সম্মানজনক ভাষায় স্মরণ করেছেন; দুর্দশাগ্রস্ত নারী সমাজের মুক্তির জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা চেয়েছেন; ইনশাল্লাহ্ বলা, কারো মৃত্যুতে ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন পড়া, সোবাহান আল্লাহ ['অবরোধ-বাসিনী', পৃ: ৪৯১], শুকুর আলহামদুলিল্লাহ ['পঁয়ত্রিশ মণ খানা', পৃ: ৫৪৪] ইত্যাদি। অন্যত্র,

"তামাম জাহান যদি হয় এক দিকে,
কি করিতে পারে তার আল্লাহ্ যদি থাকে।" ['পদ্মরাগ', পৃ: ৪৫৪]

আবার, "স্কুলের বিরুদ্ধে কতদিকে কতপ্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে তাহা একমাত্র আল্লাহ জানেন। একমাত্র ধর্মই আমাদিগকে বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতেছে।" ['রোকেয়া– জীবনী', শামসুন

www.pathagar.com

নাহার, পৃ: ৭৪]; অন্যত্র স্কুলের আঠার বৎসর পূর্তিতে তিনি বলেন, ".....আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি-কোরান শরীফের এই বচনটিই আমি জীবনের পরতে পরতে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলাম।" ['রো-জী', শামসুন নাহার, পৃ: ৮৩]

এই পূণ্যশীলা মহীয়সী মহিলার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের এক পুরাতন ছাত্রী তার বহু যত্ন ও সাধনায় গঠিত এক আদর্শ বালিকা, রওশন আরা বলেন, "মনে পড়ে তাঁর আদেশ মত দৈনিক ক্লাস আরম্ভের পূর্বে বিস্তীর্ণ হলে আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইতাম। তিনি একটা দোয়া পড়িতেন, আমরা সকলে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতাম। ঐ দোয়াটি তিনি যখন পড়িতেন, তখন মনে হইত যেন তিনি হৃদয় দিয়া আমাদের সেদিনের সাফল্যের জন্য খোদাকে ডাকতেন। সে যে কি গভীর আন্তরিকতা-ভরা আবেদন, তাহা বুকের মধ্যে অনুভব করা যায় - মুখে বলা যায় না!" ['রো-জী', শামসুন নাহার, পৃ: ১২৬]

নারীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি ১০০% অবহেলা দেখে তিনি মহানবী [স.]-কে ডেকেছেন "হায় পিতা মুহাম্মদ [স.]", ['গৃহ' পৃ: ৭২]; কোথায়ও ধর্মগুরু মুহাম্মদ [স.] ['মতিচূর', পৃ: ৪২]; মহাত্মা মোহাম্মদ [দ.] ['রসনা-পূজা', ২৫৬]-এভাবে মহানবী [স.]-কে তিনি স্মরণ করেছেন বার বার।

কোরআনের মাহাত্ম্য ও অধ্যয়নের তাগিদ ঃ পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি একজন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মহিলা ছিলেন এবং কোরান-সুন্নাহর সত্যিকার প্রয়োগ ও বিধানের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। নিম্নে তাঁর লেখনী হতে কয়েকটি উদাহরণ দিলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবেঃ-

১। "আমাদের জন্য এদেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এইরূপ-প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কোরআন শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণ শক্তির সাহায্যে টিয়া পাখীর মত আবৃত্তি কর।" ['মতিচূর', রো-র পৃঃ ৪১]

২। "গও। আমিও সহঙ্কারে বলি, তোমার স্ত্রীর বিশ্বাস [ঈমান] টলিতে পারে কিন্তু আমার স্ত্রীর বিশ্বাস অটল!

জাফ। আমার স্ত্রীর বিশ্বাস অস্থায়ী হইল কিসে?

গও। যেহেতু তিনি আপন ধর্মের কোন তত্ত্বই অবগত নহেন। কেবল টিয়া পাখীর মত নামাজ পড়েন, কোন শব্দের অর্থ বুঝেন না। তাঁহাকে যদি তুমি স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ না রাখ, তবে একবার কোন মিশনারী মেমের সহিত দেখা হইলেই তিনি মনে করিবেন "বাঃ! যিশুর কি মহিমা!" সুতরাং সাবধান! যদি পার ত লৌহসিন্দুকে বন্ধ রাখিও।" ['মতিচূর', ২য় খণ্ড,--১২০]

৩। 'নার্স নেলী' সত্যিকার গল্পেও তিনি উপরে গওহরেরও সৌরজগৎ আশঙ্কার বাস্তবতা দেখিয়েছেন ঃ নার্স নেলী ছিল কুলীন মুসলিম। অসুস্থতার সময় গেরস্থ ঘরের বউকে 'পাদ্রীমাগীরা ফুসলিয়ে খ্রিস্টান করে ওকে ঘরের বার করেছে।' এবং পরবর্তীতে জানা যায় 'নেলী নাকি দিব্বি কোরান পড়তে পারে।' তখন লেখিকার নিজের অনুভূতি নিম্নরূপ ছিল, "নেলী কোরান শরীফ পাঠ করিতে পারে শুনিয়া আমার মনে আরও কেমন খট্‌কা লাগিল। না জানি সে কোন মুসলমান কুলে কালী দিয়া পতিত হইয়াছে! .....হায়! কোরান শরীফের এই অবমাননা। খ্রিস্টান নেলী, মেথরানী নেলী যে হস্তে ঘৃণিত রক্ত পুঁজ পরিপূর্ণ বালতি পরিষ্কার করে, সেই হস্তে কোরান শরীফ স্পর্শ করে।" [নার্স নেলী', পৃ : ১৯৪]

৪। শামসুন নাহার বলেন, "কতবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, 'শৈশব হইতে আমাদিগকে কোরান মুখস্থ করানো হয়, কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জন তাহার একবর্ণেরও অর্থ বলিতে পারে না। যাঁহারা অর্থ শিখিয়াছেন, তাঁহারাও শোচনীয়রূপে ভ্রান্ত। ইসলামের মর্ম তাঁহাদের কাছে এক বর্ণও ধরা পড়ে নাই, ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?' এই প্রসঙ্গে তিনি একটি সুন্দর

www.pathagar.com

উপমা দিতেন। তিনি বলিতেন "নারিকেলের চমৎকার স্বাদ তাহার দুর্ভেদ্য আবরণের ভিতরে আবদ্ধ। অন্ধ মানুষ সেই কঠিন আবরণ ভেদ করিবার চেষ্টা না করিয়া সারাজীবন শুধু ত্বকের উপরিভাগটাই লেহন করিয়া মরিল।" ['রো-জী', শামসুন নাহার, পৃ: ১২০]

৫। এক বক্তব্যে তিনি বলেন, "মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরান শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কোরান শিক্ষা অর্থে শুধু টিয়া পাখীর মত আরবী শব্দ আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরানের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে। সম্ভবত এজন্য গভর্ণমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাশ না করিলে আমাদের সমাজ মেয়েদের কোরান শিক্ষাও দিবে না! যদি কেহ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থাপত্র [Prescription] লয়, কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার না করিয়া সে ব্যবস্থাপত্রখানাকে মাদুলীরূপে গলায় পরিয়া থাকে, আর দৈনিক তিনবার করিয়া পাঠ করে, তাহাতে কি সে উপকার পাইবে? আমরা পবিত্র কোরান শরীফের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন কার্য করি না, শুধু তাহা পাখির মত পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে [জুযদানে] পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি।" ['বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি', পৃ: ২৮২]। এ থেকে বুঝা যায় যে তিনি শুধু কোরান তিলাওয়াত সমর্থন করতেন না, বরং তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা জরুরী মনে করতেন যাতে লোকেরা কোরানকে জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করতে পারে। এমনকি তিনি কোরান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি আইনের পক্ষে ছিলেন। তিনি শুধু নারীদের কোরান বুঝে পড়ার কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, এক্ষেত্রে পুরুষদের দৈন্যদশাও ব্যক্ত করেছেন, "কিছুদিন হইলো, মিসর হইতে আগত বিদূষী মহিলা মিস্ যাকিয়া সুলেমান এলাহাবাদে এক বিরাট মুসলিম সভায় বক্তৃতাদান কালে বলিয়াছিলেন, "উপস্থিত যে যে ভদ্রলোক কোরানের অর্থ বুঝেন, তাঁহারা হাত তুলুন। তাহাতে মাত্র তিন জন ভদ্রলোক হাত তুলিয়াছিলেন। কোরান-জ্ঞানে যখন পুরুষদের এইরূপ দীনতা। তখন আমাদের দৈন্য যে কত ভীষণ, তাহা না বলাই ভাল।" ['ব.না.শি.স', পৃ: ২৮২]

৬। "আর পর্দার কথা বলেছেন? পর্দা আমাদের বোম্বাইয়ে যথেষ্ট আছে। নাই বরং আপনাদেরই! সকল রকম অধিকার বঞ্চিতা হয়ে চার দেওয়ালের মাঝখানে বন্দিনী হয়ে থাকার নাম পর্দা নয়।" ['তিন কুড়ে', রো-র পৃ: ৫৩১]

একজন বোম্বায়ে মহিলা স্কুল পরিদর্শন কালে লেখিকাকে বলেন, "আপনারা কোরান শরীফ পড়েন কি? না শুধু তাবিজ [হেমায়েল শরীফ] করে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন?" ['তিন কুড়ে', রো-র, পৃ: ৫৩১]

৭। পরিশেষে তিনি বলেন, "আমার অমুসলমান ভগিনীগণ! আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরান শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামীর পরিচয় দিলাম। তাহা নহে, আমি গোঁড়ামী হইতে বহুদূরে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরানে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম ও সমাজ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য কোরান শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।" [ব.না.শি.স. লো পৃ: ২৮২]

৮। তিনি আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। লেখিকার বড় বোন ৬৭ বৎসর বয়সে রীতিমত আরবী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বড় বোন করিমুন্নেসার এক চিঠি রোকেয়া তার 'লুকানো রতন' [রো-র পৃ: ২৮৭]-এ উদ্ধৃত করেছেন এভাবে, "মন্ত্রপাঠের মত কোরানের বুলি আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তি হয় না, তাই আমি যথাবিধি আরবী পড়িতেছি।"

সম্পদের উত্তরাধিকার ও মোহর ঃ আপনারা "মোহাম্মদীয় আইনে দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিংবা জমীদারী পরিদর্শন করিতে যান, তবে দেখিবেন কার্যত কন্যার ভাগে শূন্য [০]

www.pathagar.com

কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।" ['অর্ধাঙ্গী', রো-র পৃঃ ৪১]। এ প্রসংগে তিনি অন্যত্র ['গৃহ', রো-র পৃঃ ৭২] লিখেন যে, "হায় পিতা মোহাম্মদ [দ.]! তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্ত পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী করিয়াছ, কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যগণ নানা উপায়ে কুলবালাদের সর্বনাশ করিতেছে। আহা! "মহম্মদীয় আইন" পুস্তকের মসি-রেখারূপে পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার, আইন তাহারই। আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের নহে।"

এখানে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইসলাম প্রদত্ত সম্পত্তির অধিকার বা উত্তরাধিকার থেকে সে সময়ের নারীরা নিদারুণভাবে বঞ্চিত ছিলো। তিনি তার কঠোর নিন্দা করেছেন এবং নারীর অধিকার বহালের জন্য আবেদন করেছেন। তিনি ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর ভরণ-পোষণ, মোহরানা, দায়িত্ব এবং উত্তরাধিকার মিলিয়ে দেখলে নারীর প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হয়নি। বর্তমানে এ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে যদিও এ সমস্যা এখনও বিরাজমান।

"কোন জাতি কন্যাকে সম্পত্তির ভাগ দেয় নাই, ইসলাম কন্যাকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভ্রাতার অর্ধেক অংশভাগিনী করিয়াছে। অন্যান্য জাতির স্ত্রীর সম্পত্তি রাখিবার অধিকার নাই। স্ত্রী যদি কিছু টাকা কড়ি পিত্রালয় হইতে আনে তাহা স্বামীর কবলে পড়ে - স্ত্রী ভোগ করিতে পায় না। মুসলিম স্ত্রী নিজের সম্পত্তি স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবার অধিকারিণী। কেবল তাহাই নহে, সে বিবাহের সময় স্বামীর অবস্থা-অনুসারে 'দেন-মোহর' বাবদ নগদ টাকা বা বিষয়ের অধিকারিণী হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র-কন্যা প্রভৃতি অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অংশ-বিভাগের পূর্বে স্ত্রীর "মোহর" [স্ত্রীধন] এবং তাহার প্রাপ্য অষ্টমাংশ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে। অতঃপর সম্পত্তির যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অপর সকলে পায়।" [রানী ভিখারিণী, রো-র, পৃ: ২৯০]

স্বামী-স্ত্রীর সমতা ঃ বেগম রোকেয়া বলেন, "There is a saying, "Man proposes, God disposes," but my bitter experience shows that God gives, man robs. That is, Allah has made no distinction on the general life of male and female - both are equally bound to seek food, drink, sleep, etc. necessary for animal life. Islam also teaches that male and female are equally bound to say their daily prayers five times, and so on."

['God gives, man robs'; দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ, পৃঃ ২৩]

আমাদের সমাজে স্ত্রীর বক্তব্য ধর্তব্যতুল্য ছিল না, কেননা তাদের প্রতি পুরুষদের প্রভুসূচক চেতনা সর্বদাই সজাগ থাকত। আজকের সমাজেও এর খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেনি, হতে পারে তার স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু নির্যাতন তা নবসাজে নির্যাতনই রয়ে গেছে। তিনি তার "অর্ধাঙ্গী" প্রবন্ধে সুন্দর উপমার সমাহারে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সমন্বয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি পরিবারকে দ্বিচক্র গতির সাথে তুলনা করে বলেন যে, "যে শকটের এক চক্র বড় [পতি] আর এক চক্র ছোট [পত্নী] হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না; ... সে কেবল একই স্থানে [গৃহ-কোণেই] ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।" [অর্ধাঙ্গী, রো-র, পৃ: ৩৮]। এ প্রবন্ধেরই অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন যে, "স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতা বশত; নারী জাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ "প্রভু" হইতে পারে না।"

মূলত "অর্ধাঙ্গী" প্রবন্ধে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, "নারী ও নর উভয়ে একই বস্তুর অঙ্গবিশেষ। যেমন একজনের দুইটি হাত কিংবা শকটের দুইটি চক্র, সুতরাং উভয়ে সমতুল্য অথবা উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।" [সুগৃহিণী, রো-র পৃ: ৪৫]। অন্যত্র,

www.pathagar.com

"কা। মহাপণ্ডিতই হও, আর যাহাই হও, তোমরা আমাদের সমতুল্য হইতে পারিবে না- কখনই না।

সু। সমতুল্য কেন, আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

কা। তা কি হয়? "মানবের মানসিক বল তাহার ব্রেন-এর [মস্তিষ্কের] উপর নির্ভর করে পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের ব্রেন ওজন ও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের ব্রেন অনেক পরিমাণে অধিক।" [ভ্রাতা-ভগ্নী, রো-র পৃ: ৫২৬]

কাজেব নারীকে 'যত দুষ্কর্মের মূল কারণ' বলে অভিহীত করেছেন। কাজেবের বক্তব্য "তা' ঝালের পরিমাণ– বিষের পরিমাণ ত তোমাদের ভাগেই বেশী পড়িয়াছে'। ক্রুর বুদ্ধি, কপটতা ছলনা - এই সব উপাদানেই ত তোমরা গঠিত। যত দুষ্কর্মের মূল কারণ তোমরা!

সিদ্দিকা। হাঁ, যত সব প্রসিদ্ধ ডাকাত আমরাই; যত জালিয়ত, সিদ্ধহস্ত জুয়াচোর, রাজবিদ্রোহী, সব আমরাই! জেলে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোকই পচে! নমরুদ, ফেরাউন এবং সুবিখ্যাত তান্তিয়া ভীলও স্ত্রীলোক ছিল!

কা। দুষ্কর্মে স্ত্রীলোকের হাত প্রকাশ্যে না থাকুক, মূলে তাহারা থাকে। "স্বর্গোদ্যানে তোমরাই আমাদের পতনের পথপ্রদর্শক ছিলে, ট্রয় সমরের তোমরাই নায়িকা ছিলে, লঙ্কাকাণ্ড তোমাদেরই পদানুসারে ঘটিয়াছিল, কারবালার সে ভীষণ কাণ্ডেও তোমরাই অভিনেত্রী ছিলে!"

সি। হাঁ, মাবিয়ার কন্যার সহিত হজরত আলীর কন্যার যুদ্ধ হইয়াছিল। আর সেনাপতি ছিলেন হজরতা শহরবানু!!

কা। "স্ত্রীলোক যে যুক্তিজ্ঞানহীনা ইহা তাহাদের প্রকৃতি।" তোমরা প্রতি কথায় যুক্তিহীনতার পরিচয় দাও! পুরুষ জাতি স্বভাবতঃই যুক্তিশক্তিবিশিষ্ট।" [ভ্রাতা-ভগ্নী, রো-র পৃঃ ৫২৬-৫২৭]

আবার, "আমাদিগকে 'নাকে সুল আকেল' বলিয়া দুনিয়ার সমস্ত দোষ আমাদের স্কন্ধে চাপানো হয়। আমরা মূক বলিয়া কোন কালে এইসব অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করি নাই।" [সুবেহ্ সাদেক, রো-র, পৃ: ২৯৮]

নারীকে পুরুষেরা যে ভুলভাবে বিচার করত-এটাই তার প্রমাণ। ইসলাম এটা সমর্থন করে না। যত দুষ্কর্মের মূল হিসেবে নারীকে আখ্যা দেয়া সম্পূর্ণ অনুচিত। স্বর্গোদ্যানে আদম হাওয়ার বেহেশত্ থেকে বের হবার জন্য [ইহুদী ধারণা] হাওয়াকে দায়ী করা হয় এবং লজ্জাজনক হলেও সত্য যে আজও আমাদের একদল অজ্ঞ, বিচার-বিবেচনা প্রয়োগহীন আলেম সমাজে এ মিথ্যাচার ছড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ এটা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। [সূরা ত্বাহা : ১১৭-১২৩]

মূলত লেখিকার উপরোক্ত বক্তব্য কোরানেরই বক্তব্যের প্রতিবিম্ব। কোরানে [সূরা বাকারা : ১৮৭] আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যে, তারা [নারী-পুরুষ] একে অপরের পোশাক। ইসলামে পরিবারের পুরো দায়িত্ব পুরুষের করে ন্যস্ত করেছেন এবং এজন্যই তাকে পরিবারের পরিচালক বলা হয়েছে।

রোকেয়ার উপরের এ বক্তব্য কোরানের নারী-পুরুষ সম্পর্ক সংক্রান্ত সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতের [তওবা : ৭১] প্রতিধ্বনি যাতে বলা হয়েছে যে "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের সংরক্ষণকারী বন্ধু এবং অভিভাবক [বা'দুহুম আউলিয়াউ বা'দিন]। রোকেয়ার কথা কোরানের অসংখ্য স্থানে যে সামগ্রিক Gender equality & equity-র কথা বলা হয়েছে তারই প্রতিধ্বনি। দু'একটির ব্যতিক্রমধর্মী ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ আয়াতকে কোরানের উপরোক্ত সামগ্রিক Spirit এর আলোকে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হবে। 'আনুগত্য স্বামীর প্রতি, না খোদার প্রতি?' প্রসঙ্গে আল্লামা ড. কাওকাব সিদ্দিক বলেন, "সূরা নিসার ৩৪ আয়াতে নারীদেরকে

www.pathagar.com

"আন্তরিকভাবে অনুগত" [ক্বানিতাত] বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের পণ্ডিতগণ দাবী করেন, এই আনুগত্য হলো স্বামীর প্রতি আনুগত্য। বস্তুত স্বামীর আনুগত্য করার এমন ইচ্ছা না থাকলে কোন স্ত্রী প্রহৃত হবে, আবার প্রহারকারী স্বামীর সাথে বিবাহিত জীবনযাপন করবে এমন অবস্থায় নিজকে সমর্পণ করতে পারত না। বিবাহ সম্পর্কে আমাদের পণ্ডিতগণের এই হলো পুরুষপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি। অন্য কথায়, আমাদের পণ্ডিতগণ চান যেন মুসলিম নারীরা পরাভব এবং নির্যাতনকে আল্লাহর হুকুম বলে মেনে নেয়।" [মুসলিম নারী সংগ্রাম, ড. কাওকাব সিদ্দিক, পৃ: ২৭]

তিনি আরো বলেন, "আমাদের পণ্ডিতগণ সূরা তওবার ৭১ আয়াতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন আর সব প্রচেষ্টা সূরা নিসায় ৩৪ আয়াতে নিবদ্ধ রেখে মারাত্মক গোনাহ্‌র কাজ করেছেন। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন। আর আল্লাহই সবচেয়ে উত্তম জ্ঞান রাখেন।" [পৃ: ৩৩]

আমাদের সমাজে এ ধারা প্রচলিত ছিল [এখনও কমবেশি বিরাজমান] যে ছেলের তুলনায় মেয়েকে কম গুরুত্ব, সুবিধা, শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি প্রদান। পার্থিব অপার্থিব সম্পত্তিতে একই কথা। তিনি নারীর পার্থিব সম্পত্তির অপ্রাপ্তির বা বঞ্চিত হবার কথা উল্লেখ করেছেন। অপার্থিব সম্পত্তির প্রসঙ্গে উনার বক্তব্য হচ্ছে- "আমি এখন অপার্থিব সম্পত্তির কথা বলিব। পিতার স্নেহ, যত্ন ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি। এখানেও পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশী। ঐ যত্ন, স্নেহ হিতৈষিতার অর্ধেকই আমরা পাই কই? যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দুইজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যে স্থলে ভ্রাতা "শমস-উল-ওলামা" সে স্থলে ভগিনী "নজম্-উল-ওলামা" হইয়াছেন কি?" [অর্ধাঙ্গী, রো-র, পৃ: ৪১]

বেগম রোকেয়া সে সময়ের পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলেছেন, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও অমানবিক। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়টি ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য ইসলামী আইন মোতাবেক করতে পারেন না। এ কথাটি রোকেয়া জানতেন বলেই তার আক্ষেপ আরো বেশি ছিল।

উপরোক্ত প্রশ্নবাণের পরে তিনি মুসলমানদেরকে মহানবী [স.] এর সামনে জবাবদিহি করবার ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, "যদি ধর্মগুরু মোহাম্মদ [স.] আপনাদের হিসাব-নিকাশ লয়েন যে, 'তোমরা কন্যার প্রতি কিরূপ ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ?' তবে আপনারা কি বলিবেন?"

মহানবী [স.] যে কন্যাকুলের রক্ষক ছিলেন, ছিলেন আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ মহাপুরুষ এতে কোন সন্দেহ নাই। বেগম রোকেয়া মহানবী [স.]-কে 'কন্যাকুলের রক্ষক' হিসাবে ব্যক্ত করে তৎকালীন নারী-কন্যার প্রতি ভক্ষক ও নির্যাতনকারী সমাজের পুরুষ প্রতিনিধিদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে ইসলামের মৌলিকত্ব সর্বদাই নারীর প্রতি Favourable, unfavourable হবার কোন যৌক্তিকতাই নাই। যারা ইসলামকে না জেনে, না বুঝে, অল্প জ্ঞানে ভ্রান্তব্যাখ্যার দ্বারা নারীর সম্মান, অধিকার, মর্যাদা, অবস্থানকে অবদমিত করতে চান, তারা সত্যিকার অর্থেই ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, আর রোকেয়া সে সত্যই চোখে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে রোগাক্রান্ত সমাজের প্রতিকারের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ দৃষ্টিভঙ্গীকে সমাজের কিছু মহল সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে প্রদর্শনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং বেগম রোকেয়াকে ইসলামের সমালোচক হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

রোকেয়া তার "অর্ধাঙ্গী"-তে নারীদের প্রতি মহানবী [স.]-এর আদর্শ উপস্থাপন করেন : "পয়গম্বরদের ইতিহাসে শুনা যায়, জগতে যখনই মানুষ বেশী অত্যাচার অনাচার করিয়াছে, তখনই এক-একজন পয়গম্বর আসিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছেন। আরবে স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিল, আরববাসীগণ কন্যা হত্যা করিতেছিল, তখন হযরত

www.pathagar.com

মোহাম্মদ [স.] কন্যা কুলের রক্ষক স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধ ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। সে আদর, সে স্নেহ জগতে অতুল।" [রো-র, পৃ: ৪২]

এর পর পরই তিনি আক্ষেপ তুলেন আর বলেন, "আহা! তিনি নাই বলিয়া আমাদের এ দুর্দশা। তবে আইস ভগিনীগণ, আমরা সকলে সমস্বরে বলি ঃ

করিম [ঈশ্বর] অবশ্যই কৃপা করিবেন। যেহেতু "সাধনায় সিদ্ধি"। আমরা করিমের অনুগ্রহ লাভের জন্য যত্ন করিলে অবশ্যই তাঁহার করুণা লাভ করিব। আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের 'অর্ধেক' নহি। তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত-পুত্র যেখানে দশমাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস! পুত্রের জন্য যতখানি দুগ্ধ আমদানী হয়, কন্যার জন্য তাহার অর্ধেক। সেরূপ ত নিয়ম নাই! আমরা জননীর স্নেহ-মমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃ-হৃদয়ে পক্ষপাতিত্ব নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব, ঈশ্বর পক্ষপাতী? তিনি কি মাতা অপেক্ষা অধিক করুণাময় নহেন?" [রো-র, পৃ: ৪৩]। তিনি বলেন, "তবে কেবল শারীরিক বলের দোহাই দিয়া অদূরদর্শী ভ্রাতৃমহোদয়গণ যেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী না করেন। আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি।" [রো-র, পৃ: ৪৩]

তিনি নারীদের এ বলেও সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, "এগিয়ে যাবার নাম করে অনিয়ম, বাড়াবাড়ি যেন না হয়। আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না।" [অর্ধাঙ্গী-৪৪]

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আলী সিদ্দিক বলেন, "মূলত: নারী বহুবিধা জনগোষ্ঠী কর্তৃক দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের শিকার। আবার, ধর্মগ্রন্থে বিধৃত বাণীর অপব্যবহার এবং ভুল উদ্ধৃতির মাধ্যমে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানগুলো এসকল নির্যাতনেরই যথার্থতা প্রমাণ করে থাকে।

ইসলামের নবী মোহাম্মদ [স.] যখন তাঁর মিশন শুরু করেন, সেই সময়েও নারীর প্রতি আচরণ কিছুমাত্র ভাল ছিল না। ইসলাম নারীকে মুক্তি দিয়েছে এবং তার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। মহানবী [স.] তাঁর মিশন চলাকালীন সমগ্র সময়ে তাঁর অনুসারীদেরকে জোর দিয়ে বলে গেছেন তারা যেন নারীকে সম্মান করে, তাদেরকে মানুষ বলে গণ্য করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান করে এবং জাতির ক্রিয়াকলাপে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়।" [মুসলিম নারীর সংগ্রাম, মুখবন্ধ, পৃ: ৯]

বেগম রোকেয়ার মত বর্তমানের পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল সিদ্দিকী [২২ মার্চ, ১৯৮৬]-ও একই বক্তব্য রাখছেন। মূলত নারীকে এগিয়ে আসতে হবে, শিক্ষিত হতে হবে এ আহ্বানই ছিল রোকেয়ার মূলমন্ত্র। রোকেয়ার মতে 'আমাদের হস্ত, মন, পদ, চক্ষু ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করা হয় না। দশজন রমণীরত্ন একত্র হইলে ইহার উহার বিশেষত আপন আপন অর্ধাঙ্গীর নিন্দা কিংবা প্রশংসা করিয়া বাকপটুতা দেখায়।' [অর্ধাঙ্গী, রো-র, পৃ: ৪৪] "

প্রকৃত পক্ষে মুসলিম নারীরাও একথা অনুধাবনে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে যে, ইসলামই তাদের মুক্তিদাতা। তারা বুঝতে পারছে না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামকে এবং তাদের উদ্দেশ্যে ইসলামপ্রদত্ত অধিকারসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা না পারবে আপন জগতের কোন উন্নতিবিধান করতে আর না পারবে আখেরাতে মুক্তির আশা করতে।" আলী সিদ্দিকীর মত বেগম রোকেয়াও তৎকালীন সমাজে এ ব্যাপারে নারীর জাগরণের কথা বলতে চেয়েছেন।

www.pathagar.com

স্বামী-স্ত্রীর সম অস্তিত্বের প্রসঙ্গে 'সৌরজগৎ' উপন্যাসে তিনি সচেতন পুরুষ গওহরের কণ্ঠ দিয়ে সমাজকে জানাতে চেয়েছেন, "আমাদের ছাড়া তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কই? এবং তাঁহাদের ছাড়া আমাদেরও নিরপেক্ষ অস্তিত্ব কই?" [সৌরজগৎ, রো-র, পৃ: ১২১]

রোকেয়া সুন্দর উপমার মাধ্যমে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রসঙ্গ টেনে আনেন। গ্রহমালা স্ব-স্ব কক্ষে থাকিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণ কার্যে গ্রহদের সাদৃশ্য ও একতা আছে অর্থাৎ সকলেই ঘুরে, এই হইল সাদৃশ্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল গ্রহই একই সঙ্গে উঠে, একই সঙ্গে বসে, তাহা নহে! তাহাদের আবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে।

.....জাফর ভাই যে বলেন, সৌরপরিবারে অবলারূপ গ্রহদের 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা নাই, ইহা তাঁহার ভ্রম। মূলত রোকেয়া নারীকে তার নিজস্ব মর্যাদাপ্রাপ্তির কথা বলতে চেয়েছেন।

নারী পুরুষের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সৌরজগতের প্রদক্ষিণ করতে বুধের তিন মাস, শুক্রের আটমাস, বৃহস্পতির ১২ বৎসর এবং শনির ৩০ বৎসর লাগে। ইহাই তাহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য বা স্বাধীনতা। শনিগ্রহকে কেহ আরক্তনেত্রে আদেশ করিতে পারে না যে, "তোমাকেও বুধের মত ৩ মাসেই সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতে হইবে।" এবং এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বৈষম্য আছে, ...এইরূপ মানবের সৌরপরিবারেও পরস্পরের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য আছে এবং কতকগুলি বৈসাদৃশ্যও আছে।" [সৌরজগৎ রো-র, পৃ: ১৩০]

নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার ইসলাম প্রদত্ত। নারীদের অবলা বলে গণ্য করা হয়। রোকেয়া বলেন, "অবলাদেরও চক্ষুকর্ণ আছে, চিন্তাশক্তি আছে, উক্ত শক্তিগুলি অনুশীলন যথানিয়মে হওয়া উচিত। তাহাদের বাক্‌শক্তি কেবল আমাদের শিখান বুলি উচ্চারণ করিবার জন্য নহে।": [সৌরজগৎ, রো-র, পৃ: ১৩১]

রোকেয়া তখনকার সমাজের প্রচলিত ধারণায় মেয়েদেরকে অবলা বলেছেন। কিন্তু আমি মনে করি, ইসলাম নারীকে কোথাও অবলা বলেনি। হতে পারে নারীদের শারীরিক শক্তি পুরুষদের তুলনায় কিছুটা কম। কিন্তু এরকম ছোট-খাট পার্থক্যতো পুরুষে-পুরুষেও বিরাজ করছে।

এ ব্যক্তি স্বাধীনতা মানে গাঁটহীন, বাঁধনহারা হয়ে চলা, বলা, খেলা নয়– নর-নারীর উভয়কেই একটি সীমারেখা মেনে চলতে হবে এবং এ সীমারেখা মেনে চলাটা মানব সভ্যতার সুষ্ঠু বিকাশ ও শৃঙ্খলার জন্য অতীব প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজনের কথাকে সামনে রেখেই রোকেয়া তার 'সৌরজগৎ'-এর বিবেকবান গ্রহের মাধ্যমে উচ্চারিত করেছেন, "সৌরচক্রের গ্রহমালা যেমন সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া আপন কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, তদ্রূপ আমাদেরও উচিত যে সত্য - অর্থাৎ ঈশ্বরে লক্ষ্য রাখিয়া - তাঁহার উপর অটল বিশ্বাস সহকারে নির্ভর করিয়া স্ব-স্ব কর্তব্য পথে চলি। যে কোন অবস্থায় সত্য ত্যাগ করা উচিত নহে– সত্যভ্রষ্ট হইলেই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সত্যরূপ কেন্দ্রে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ....পরস্পরে একতা থাকাও একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই ঐক্য যেন সত্যের উপর স্থাপিত হয়। একতার মূলে একটা মহৎ গুণ থাকা আবশ্যক।" [সৌরজগৎ, রো-র, পৃ: ১৩১-১৩২]

কতই না অপূর্ব সত্য লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন তার লেখনীর চরিত্রের বক্তব্য দ্বারা। রোকেয়া অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলামের এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন নারী-পুরুষের কর্মের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মৌলিক দায়িত্ব-কর্তব্যের কোন পার্থক্য নাই। [সূরা তওবা:৭১]

www.pathagar.com

নেতা নয়, বন্ধু ঃ রোকেয়া নারী-পুরুষদের মধ্যেকার পারস্পরিকতা ও সমত্বের কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন। সূরা বাকারাহ্ : ১৮৭ আয়াতে মুসলিম পুরুষ ও নারীদেরকে পরস্পরের অলংকার ও পোশাক বলে বর্ণনা করা হয়েছে , "তারা তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ।" লক্ষণীয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অপরিহার্য যৌন সংযোগের মধ্যে এখানে যে সমত্বের সম্পর্ক বিরাজমান তা তর্কাতীত।" [মুসলিম নারীর সংগ্রাম, ড. কাওকাব সিদ্দিক, পৃ. ৩২]

নারী-পুরুষ উভয়েরই কাজে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। কর্মে সমতা বিরাজমান। রোকেয়ার কণ্ঠে তাই ফুটে উঠেছে, "জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু অন্ন বস্ত্র; সুতরাং রন্ধন ও সেলাই অবশ্য শিক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনকে শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে।" [অর্ধাঙ্গী, রো-র, পৃ. ৪৩]

'মূলতঃ নারীর স্থান হলো রান্নাঘরে কিংবা সন্তান প্রতিপালন ভিন্ন আর কিছু করার নেই– এরকম বক্তব্য অনৈসলামী বক্তব্য। সূরা আল-ইমরানের ১৯১-১৯৫ আয়াতে আল্লাহ্তাআলা হিযরত এবং জিহাদ, বিশেষতঃ জিহাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকসহ সামগ্রিক ইসলামী সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। উপরোল্লিখিত আয়াতের এক অংশ নারী পুরুষের পারস্পরিকতার উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, 'পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তোমরা সবাই সমগোত্রীয়। [৩:১৯৫] [মু,না,স, পৃ. ৩৩]

'সূরা তওবাহ-র ৭১নং আয়াত এ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রত্যাদেশ। এতে বলা হয়, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা পরস্পরের আউলিয়া, সংরক্ষণকারী, বন্ধু ও তত্ত্বাবধায়ক। পরস্পরের আউলিয়া হিসাবে ইসলামী জিন্দেগীর যে ব্যাপক বিস্তৃত ক্ষেত্রে তারা অংশগ্রহণ করে আয়াতটিতে সেদিকেও আলোকপাত করা হয়।' [প্রাগুক্ত]

মুলত ইসলামে নারী পুরুষের মধ্যে প্রভু বলে কেউ নেই। রোকেয়ার কলমের ভাষায়, "স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ 'প্রভু' হইতে পারে না।" [অর্ধাঙ্গী, রো-র পৃ. ৪৩]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ৪:৩৪ আয়াতের 'কাওয়াম' শব্দের মাধ্যমে কেউ কেউ পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নারীর অধঃস্তন অবস্থার কথা বলে থাকেন। কিন্তু এ যুগের অধিকাংশ তফসীরকার এর অর্থ করেছেন 'ভরণ-পোষণ এবং নিরাপত্তাবিধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি' [Maintainer & Protector]। ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তা বিধান দ্বারা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব নয় বরং দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। তদুপরি কোরানের অসংখ্য আয়াতের সামগ্রিক gender equity-কে আমরা কিছু ব্যক্তির কথায় পরিত্যাগ করতে পারি না।

"আল্লাহ্তায়ালা নেতৃত্ব প্রসঙ্গে একটা নীতি বাত্লে দিয়েছেন, যা কোন রকম 'যদি' এবং 'কিন্তু' ছাড়াই সুস্পষ্টভাবে লিঙ্গ, বংশ এবং জাতির ভিত্তিতে নেতৃত্বের সকল শিকড় কর্তন করে দেয়। এই নীতি সম্বলিত আয়াতটি কখনো কখনো জাতীয়তাবাদ নাকচ করার উদ্দেশ্যে পঠিত হয়ে থাকে, কিন্তু লিঙ্গবাদ [লিঙ্গভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা] নাকচের বিষয়টি সাধারণতঃ বাদ পড়ে যায় ঃ

'হে মানবজাতি! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাত্র একজোড়া নারী-পুরুষ থেকে; পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো [এজন্য নয় যে তোমরা পরস্পরকে অবজ্ঞা করবে] নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ। অবশ্যই আল্লাহ সকল ব্যাপারে পূর্ণজ্ঞানী এবং উত্তমরূপে অবহিত।" [সূরা হুজরাত-১৩; নবম হিজরীতে নাজিলকৃত]। [মু.না. স. পৃ. ৪৫]

www.pathagar.com

নগ্নতা ঃ আব্দুল কাদির [সম্পাদক, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী] বলেন, "বেগম রোকেয়া 'অবরোধবাসিনী' শিরোনামে 'অবরোধের' বিষয়ে তাঁর "ব্যক্তিগত কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার" দেন মাসিক মোহাম্মদীতে। রোকেয়া অবরোধ-প্রথার উচ্ছেদ চেয়েছিলেন; কিন্তু নারী পর্দা অর্থাৎ সুরুচি ও শালীনতা বিসর্জন দিয়ে, এটা তিনি কোনোদিনই কাম্য মনে করেননি। অতি-আধুনিক রীতির বেলেল্লাপনা তাঁর কাছে কিরূপ শ্লেষের বিষয় ছিল, তাঁর 'উন্নতির পথে' শীর্ষক রম্যরচনাটিতেও তার অভিব্যক্তি ইঙ্গিতবহ ও তাৎপর্যময়।" উন্নতির পথে চলতে গিয়ে অবনতির কথা তিনি ব্যঙ্গ করে ফুটিয়ে তুলেছেন। "যাক, আমাদের প্লেন বোঁ বোঁ ক'রে রওয়ানা হলো। তাতে আরও অনেক যাত্রী ছিল-ইরানী, তুরানী, তুর্কী, আলবানিয়ান, ইরাকী, কাবুলী ইত্যাদি ইত্যাদি।" উল্লেখ্য এখানে যাত্রীদের সবাই মুসলিম দেশের অধিবাসী। আর এদের মধ্যে "কেবল তরুণ নয়, তরুণীরাও ছিল। সবাই নওজোয়ান, - বুড়ো [আমি ছাড়া আর] একটাও না। আমার মাথার ভিতর কেবলই গুঞ্জন করছিল-

'নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শতবার খসে খসে পড়ে-'
কখনও ঐ গানটাই উলট-পালট হ'য়ে মনে ভেসে বেড়াচ্ছিল–
'পাগড়ী নাই, টুপি নাই, লজ্জা নাই ধড়ে-' ইত্যাদি।

ও বাবা! কতক্ষণ পরে দেখি কি, সত্য সত্যই তরুণদের কাছা-কোঁচা একেবারে খসে পড়ে গেছে - আর-

রোদ বৃষ্টি হিম হতে বাঁচাইতে কায়
একমাত্র হ্যাট তার রয়েছে মাথায়!
শেষে দেখি, সোবহান আল্লাহ! তরুণীরাও অর্ধ-দিগম্বরী!!

যাক, হ্যাট দিয়ে লজ্জা যদি নাও নিবারণ হয়, তবু রোদ বৃষ্টি হিম হতে মাথাটা বাঁচাবে। কিন্তু তরুণীদের মাথায় যে হ্যাটও নাই! আর চেপে থাকতে না পেরে বলে ফেললুম-

"ভাই তরুণ, উন্নতির পথে চলেছ, তা উলঙ্গ হয়ে কেন?"

সে বললো, "আমরা এখন দেশোদ্ধার করতে চলেছি - আমাদের কি আর কাছা-কোঁচা জ্ঞান আছে? তুচ্ছ বেশ-ভূষা, তুচ্ছ বাস - সব বিসর্জন দাও স্বাধীনতা পাবার আশায়। আমরা চাই কেবল উন্নতি আর উন্নতি। ....বোঁ বোঁ করে প্লেন উন্নতির পথে ছুটেছে! এখন দেখি কি, সেই তরুণী তরুণের কথাই সত্য, অর্থাৎ প্লেনটা চক্রাকার পথে ঘুরে ক্রমে কালিদাসের বর্ণিত শকুন্তলার যুগে - যখন মুণি-কন্যারা গাছের বাকল পরতেন, তাও আবার সবসময় লম্বায় চওড়ায় যথেষ্ট হত না বলে টেনে টুনে পরতে হত - সেই যুগে এসে পড়েছে। তরুণীদের দিকে আর চাওয়া যায় না।

.....আমি কাকুতি করে বললুম, "দোহাই ভায়া তরুণ আর না। আমি বুঝতে পেরেছি ঃ তোমরা এখন আদি-মাতা হযরত হাওয়ার যুগে এসে পড়বে। আদি-পিতা অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে গাছের তিনটা পাতা চেয়ে নিয়ে - একটায় তহবন্দ, একটা দিয়ে জামা আর একটা দিয়ে মাথা ঢাকবার টুপী করেছিলেন। আর আদি-মাতা তাঁর লম্বা চুল খুলে দিয়ে সমস্ত গা ঢেকেছিলেন। কিন্তু এখনকার তরুণীদের মাথায় ত চুলও নেই - এরা কি দিয়ে গা ঢাকবে?" [মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৩৫]

www.pathagar.com

তিনি অশালীনতা, নগ্নতা এবং স্বল্প পোশাকের কতটুকু বিরোধী ছিলেন, তা এ লেখা থেকে একবারেই সুস্পষ্ট। শালীনতার পক্ষে এত অপূর্ব একটি বক্তব্য, আলোচনা বা লেখা এ যুগের খুব কম বিজ্ঞ লেখক বা ইসলামী পণ্ডিতের লেখনিতেই দেখা যায়।

লেখিকা তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত বক্তব্যগুলো রসালোভাবে উপস্থাপন করে তার ক্ষেদোক্তি করেন এবং আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়ার নেশায় বুঁদ হয়ে যাওয়ার অজ্ঞ প্রবণতা দেখে তিনি ব্যথিত হয়ে পড়েন। মূলত বিশ্বের মুসলিম সমাজ কোরআনের সত্যিকার শিক্ষা হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল এবং এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের পূর্বপুরুষদের অবদানকে ভুলে সত্যিকার প্রগতির পথকে মাড়িয়ে পাশ্চাত্যের বাহ্যিক ঐশ্বর্য দেখে সত্য-মিথ্যা, ভুল-সঠিক নির্বিচারে গ্রহণ করার প্রতিযোগিতায় তারা মত্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান প্রসঙ্গে 'নূর-ইসলাম'-এ উল্লেখ আছে যে, "ওদিকে মুসলমানেরা দেশ-সংক্রান্ত কর্তব্য সাধনে মগ্ন ছিলেন, এদিকে হযরত আলীর শিষ্যবর্গ শিক্ষা বিস্তার করতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা যেখানেই যাইতেন শিক্ষার মশাল সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহার ফলে এই হইল যে, খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের শিশুদের হস্তে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রদীপ দেওয়া হইয়াছিল। যেখানে তাঁহারা দেশ জয় করিতেন, সেইখানেই পাঠশালা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ কাহেরা, বাগদাদ, হিসপানিয়া এবং কর্ডোভার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রদর্শন করিতেছি।" [রো-র, পৃ: ১০৩]

এর পরিপ্রেক্ষিতে রোকেয়া লিখেন, "আমাদের সদাশয় বৃটিশ প্রভুরা দাবী করেন যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন বলিয়াই আমরা [বর্বরেরা] শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছি। আর আমরাও নত মস্তকে স্বীকার করিয়া বলি যে- 'ইয়ে হয় আহলে মগরেবকে বরকৎ কদমকী' [ইহা পশ্চিম দেশবাসীদিগের শ্রীচরণের প্রসাদ]। কিন্তু মিসেস বেশান্ত ত বলেন যে, শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে মুসলমানেরাই ইউরোপের শিক্ষা-গুরু।" [প্রাগুক্ত] অথচ - সত্যিকার উন্নতির পথ, প্রকৃত প্রগতি, প্রয়োজনীয় মানবিক মূল্যবোধ ও নিজস্ব সত্তার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে চোরাবালিকে ডিঙ্গাতে যাচ্ছিল একদল শিক্ষিত গোষ্ঠী। কিন্তু এটা যে সঠিক ছিল না, বেগম রোকেয়া তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। 'ডেলিশিয়া-হত্যায় তিনি পশ্চিমার মেকী সভ্যতার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "অদ্য আমরা ইংল্যান্ডের সামাজিক অবস্থার সহিত আমাদের সমাজের দুরবস্থার তুলনা করিয়া দেখিব, অবলা পীড়নে কোন সমাজ কিরূপ সিদ্ধহস্ত।

ইংরাজ রমণীর জীবন কিরূপ? আমরা মনে করি, তাহারা স্বাধীন, বিদূষী, পুরুষের সমকক্ষ, সমাজে আদৃতা - তাঁহাদের আরও কত কি সুখ সৌভাগ্যের চাকচিক্যময় মূর্তি মানস-নয়নে দেখি। কিন্তু একবার তাহাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলে বুঝি সব ফাঁকা। দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতি মধুর।" [রো-র, পৃ. ১৫৩]

'পদ্মরাগ' উপন্যাসে বলেন, "এই ইংলেন্ড - এই পুঁতিগন্ধময় পচা ইংলেন্ড আবার সভ্যতার দাবী করে!" [রো-র, পৃ: ৩৮৫]

আর প্রকৃতপক্ষে অধঃপতিত সমাজ সভ্যতার উৎকর্ষপ্রাপ্তির লোভে, 'চকচক করিলেই সোনা হয় না' - প্রবাদটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য লাভে ব্যর্থ হয়ে পশ্চিমা সভ্যতার অনৈসলামিক উপাদানসমূহকেও আপন করে নেয়। আর এরূপ করতে চেয়ে চরম বাড়াবাড়ির পরিচয় দিয়েছিলেন তুরস্কের মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক, আফগানিস্তানের শাহ-আমানুল্লাহ প্রমুখ। ফলে হ্যাটসর্বস্ব হওয়াতেই যেন উন্নতি-প্রগতি; নগ্নতাতেই যেন আধুনিকতা, মানবতার মুক্তি! আজকের সমাজেও সেই একই প্রবণতা। বেগম রোকেয়া এর নিম্নগতি কামনা করেছিলেন।

www.pathagar.com

দুঃখজনক হলেও সত্যি, আজকের সমাজে এর উর্ধ্বমুখী গতি অনেক ব্যাপক। পাশ্চাত্য ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে নিজের বুকে স্থান করে নিচ্ছে অনেকেই, অথচ চোখ তুলে একবারের জন্যেও তাকায় না, দেখে না যে পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা কতটা নাজুক অবস্থায় পতিত। সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, নারীর মর্যাদা, পারিবারিক বন্ধন, নারী-পুরুষের বৈবাহিক জীবন ইত্যাদি সকল মানবীয় দিকগুলোতে বিশাল খাদ পরিলক্ষিত হয়। তখনকার নগ্নতা দেখে রোকেয়ার যে আক্ষেপ, আজকের অবস্থা দর্শনে হয়তো তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড গ্রহণে বাধ্য হতেন!

ইসলাম নগ্নতাকে পরিহার করতে বলেছে। দেহ ঠিকমত আচ্ছাদন করা ও ভূষণের মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত। পুরুষ ও স্ত্রীলোক অবশ্যই শালীনতাপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে। নবী [স.]-এর সুন্নাহ হচ্ছে যে, মানুষ তার দেহ যথাযথভাবে আচ্ছাদন করবে। আর এর ব্যত্যয় ঘটলে, ভারসাম্য নষ্ট হলে শয়তানের পথ অনুসরণ করা হবে। "ফ্যাশনের নামে অনেক কিশোরী ও যুবতী ওড়না পরা বাদ দিয়েছে। অনেকে আবার গামছার মতো ওড়না গলায় জড়িয়ে রাখছে অথবা একদিক দিয়ে ঝুলিয়ে রাখছে। ওড়না গামছা নয়। যা দিয়ে ভাল করে মাথা ও বুক ঢাকা হয় না তাকে ওড়না বলা চলে না। এই প্রবণতা রোধ করা প্রয়োজন।" ['নারীর সমস্যা ও ইসলাম', শাহ আব্দুল হান্নান, পৃ. ২৭]। বেগম রোকেয়া তার "স্ত্রীজাতির অবনতি "প্রবন্ধে বলেছেন, "বরং এই বলি, কুমারের মস্তক শিরস্ত্রাণে সাজাইতে যতখানি যত্ন ও ব্যয় করা হয়, কুমারীর মাথা ঢাকিবার ওড়নাখানা প্রস্তুতের নিমিত্তও ততখানি যত্ন ব্যয় করা হউক।" [রো-র, পৃ: ৩০]

সূরা নূরের ৩১নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক নারীদের ওড়না পরার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "মুসলিম নারীদেরকে বলুন যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ব্যতীত তাদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার ওড়না দিয়ে আবৃত করে।" [সূরা নূর : ৩১]। উপরের বিধান ঘরে-বাইরে দু'খানেই প্রযোজ্য। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সূরা নূরের ৩০নং আয়াতে পুরুষদেরকেও তাদের দৃষ্টি সংযত রাখার ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এখন দেখা যাক, এ ব্যাপারে রোকেয়ার চিন্তাধারা কি ছিল। তিনি 'বোরকা' প্রবন্ধে বলেন, "ইংরাজী আদব-কায়দাও আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, ভদ্রমহিলাগণ আড়ম্বর রহিত [Simple] পোষাক ব্যবহার করিবেন - বিশেষতঃ পদব্রজে ভ্রমণ কালে চাকচিক্যময় বা জাঁকজমক-বিশিষ্ট কিছু ব্যবহার করা তাঁহাদের উচিত নহে! ঐ উপদেশে আমরা কোরান শরীফের অষ্টাদশ "পারার" "সূরা নূরের" একটি উক্তির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। যথা- "বিশ্বাসী স্ত্রীলোকদিগকে বল, তাহারা যেন দৃষ্টি সতত নীচের দিকে রাখে। [অর্থাৎ চঞ্চল নয়নে ইতস্তত: না দেখে।] এবং তাহারা যেন আভরণ [বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত] অন্য লোককে না দেখায়।" [বোরকা, রো-র, পৃ: ৫৮]

ইসলামে শালীনতা প্রসঙ্গে, উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট বলা যায় যে, মাথা ও বুক ঢেকে নারী ও কিশোরীদের ওড়না পরার নির্দেশ কোরান থেকে এসেছে। এটা কারো বানানো বিধান নয়। অথচ অধিকাংশ লোক জানে না যে, ওড়না পরা কুরআনের নির্ধারিত অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে গায়রে মাহরেমদের [অর্থাৎ যাদের সংগে কোন নারীর বিবাহ বৈধ] সামনে মাথা ঢাকা ফরজ এবং চেহারা হাতের সামনের অংশ ও পায়ের পাতা ব্যতীত শরীরের কোন অংশ খোলা রাখা বৈধ নয় [আবু দাউদ ও হিদায়া, নজর অধ্যায়]। ইসলাম স্ত্রী লোকদের সম্ভ্রমের প্রতি মর্যাদা দেয় এবং খারাপ লোকদের ক্ষুধার্ত চক্ষু থেকে নিরাপদে রাখতে

www.pathagar.com

চায়। তাই ইসলামে স্ত্রীলোকদের তার সাধারণ পোষাকের উপরে চাদর ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে, যখন সে কাজের জন্য ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে বাইরে যায়। এ সম্পর্কে কোরান বলেছে, "হে নবী! আপনার পত্নী, কন্যা ও মুমিনদের স্ত্রীলোকদিগকে চাদর [মাথা ও বুক আচ্ছাদন করে] পরিধান করতে বলুন। এটাই ভালো স্ত্রীলোকের পরিচয়ের উত্তমপথ এবং এতে করে তাদের কখনও বিব্রত করা হবে না।" [সূরা আল-আহযাব : ৫৯]। [নারীর সমস্যা ও ইসলাম, পৃ: ২৯]। যদি মানব জাতি ইসলাম প্রদত্ত পোশাক পরিচ্ছদের নীতি মেনে চলে, তাহলে তা অবশ্যই পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম নিশ্চিত করবে এবং একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। বেগম রোকেয়া তার 'বোরকা প্রবন্ধে কিছু বিতর্কের অবসানকল্পে শালীন পোশাক হিসেবে বোরকার পক্ষে বলতে গিয়ে বলেন, "কেহ বলিয়াছেন যে, 'সুন্দর দেহকে বোরকাজাতীয় এক কদর্য ঘোমটা দিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া এক কিম্ভুতকিমাকার জীব সাজা যে কি হাস্যকর যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন' - ইত্যাদি। তাহা ঠিক! কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, রেলওয়ে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐরূপ কুৎসিত জীব সাজিয়া দর্শকের ঘৃণা উদ্রেক করিলে কোন ক্ষতি নাই। ....রেলওয়ে ভ্রমণকালে সাধারণের দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘোমটা কিম্বা বোরকার দরকার হয়।"

এখানে উল্লেখ্য যে তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদের রীতি অনুযায়ী তিনি বোরকার কথা বলেছেন। কোরানে অবশ্য 'চাদর' এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বোরকার মাধ্যমেও সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে।

অবরোধ প্রথা বনাম পর্দা প্রথা ঃ 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি'-তে সভানেত্রীর অভিভাষণকালে তিনি শেখ আবদুল্লাহ সাহেবের বক্তব্য উল্লেখ করেন - "আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, তাহা এই ঃ

ভারতবর্ষের অবরোধ-প্রথা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। অবরোধ-প্রথা আমাদের সমাজের সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত। ভ্রাতৃগণ! পর্দার নাম শুনিবামাত্র আপনারা হয়ত একযোগে বলিয়া উঠিবেন, 'তবে কি আমরা ইংরাজদের অনুকরণে বিবিদের রাজপথে বেড়াইতে দিব?' তদুত্তরে বলি, আমি মুসলমান শাস্ত্রের সীমার মধ্যে থাকিয়া আপনাদের সহিত কথা বলিতে চাই। ভারতীয় পর্দার সহিত শাস্ত্রীয় পর্দার কোন সম্বন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।" [বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি, রো-র, পৃ: ২৮১]

'পদ্মরাগ' উপন্যাসের অভিনেত্রীদের পারস্পরিক কথোপকথন লক্ষ্য করুন-

"স। .... মানব-জীবন খোদাতালার অতি মূল্যবান দান - তাহা শুধু "রাঁধা-উনুনে ফু-পাড়া আর কাঁদার" জন্য অপব্যয় করিবার জিনিস নহে! সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করিতেই হইবে!

উ। তাহা হইলে শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অশান্তির চিতা জ্বলিবে যে!

রা। চাহি না, শান্তি! চাহি না, মৃত্যুর মত নিষ্ক্রিয় ক্লীব শান্তি!! আর এই 'অবরোধ'-প্রথার মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে - এইটাই যত অনিষ্টের মূল! লাথি ঝাঁটা হজম করিয়া 'অবরোধ' প্রথার সম্মানরক্ষা, - আর নহে!" [রো-র, পৃ: ৩৯২]।

লেখিকার উপরোক্ত বক্তব্য সমাহারে অবুঝ বা নেগেটিভ-বুঝধারীরা বিরূপ মন্তব্য করতে দ্বিধা করবেন না বা এখন কেউ কেউ করেও থাকেন। অথচ বেগম রোকেয়া আদর্শ ইসলামী নারীর মত তার বক্তব্য এ উপন্যাসেরই সাথে সংযুক্ত করে বলেছেন,

www.pathagar.com

জ] "সবে মাত্র ৫ বছর হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই; অথচ পর্দা করিতে হইত। পুরুষের ত অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ। সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়ে মানুষের অবাধ গতি - অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত; অমনি বাড়ীর কোন লোক চক্ষুর ইসারা করিত। আমি যেন প্রাণ ভয়ে যত্রতত্র - কখনও রান্নাঘরে ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরাণীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম।" [রো-র, পৃ: ৪৮৮-৪৮৯]

ঝ] "আমাদের ন্যায় আমাদের নামগুলি পর্যন্ত পর্দানশীনা। মেয়েদের নাম জানা যায়, কেবল তাহাদের বিবাহের কাবিন লিখিবার সময়।" [রো-র, পৃ: ৪৯১]

ঞ] "রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর গত ১৩৩৫ সনে লিখিয়াছেন ঃ ....একটা যোগ উপলক্ষে গঙ্গা-স্নানের ব্যবস্থা ছিল। ....ঘাটে দাঁড়িয়ে লোক সমারোহ দেখছি, আর ভাবছি এই দারুণ শীতের মধ্যে কেমন করে গঙ্গাস্নান করব। এমন সময় দেখি ....পাল্কী ঘাটে এল .....কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহিণী বা কন্যা বা পুত্রবধূ।

আমি মনে করেছিলাম, গঙ্গার জলের কিনারে পাল্কী নামানো হবে এবং আরোহিনীরা অবতরণ করে গঙ্গাস্নান করে আসবেন। ...কিন্তু দাসী দুইটি পাল্কী নিয়ে জলের মধ্যে নেমে গেল। .....বুক সমান জল। বেহারারা তখন পাল্কীখানিকে একেবারে জলে ডুবিয়ে তৎক্ষণাৎ উপরে তুললো এবং তারপরেই পাল্কী নিয়ে তীরে উঠে এসে, যেভাবে আগমন, সেইভাবেই প্রতিগমন। .....এরই নাম পর্দা!" [রো-র, পৃ: ৫০৫-৫০৭]

লেখিকাপ্রদত্ত উপরের ঘটনারাশি তৎকালীন মুসলমান-হিন্দু সমাজে পর্দার নামে কিরূপ বাড়াবাড়ি হয়েছে তা ফুটিয়ে তোলে। রোকেয়া তার 'বোরকা' প্রবন্ধে অবরোধ-প্রথার বিপক্ষে কিন্তু শরিয়তী পর্দার পক্ষে তার মতামত বর্ণনা করেছেন। তিনি পর্দার স্থলে বোরকার প্রয়োগ দেখিয়েছেন কেননা এটা বেশী প্রচলিত ছিল। কিন্তু বোরকা নিয়ে যে বাড়াবাড়ি তার বিরুদ্ধাচরণও দেখা গেছে তার লেখনীতে-

"উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভগ্নীদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে 'বোরকা' ছাড়িতে বলেন। বলি, উন্নতি জিনিসটা কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে বুঝিবে যে জেলেনী, চামারনী, কি ডুমুনি প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে?" [বোরকা, রো-র পৃ: ৫৬]

"কেহ কেহ বোরকা ভারী বলিয়া আপত্তি করেন। কিন্তু তুলনায় দেখা গিয়াছে ইংরাজ মহিলাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্যাট অপেক্ষা আমাদের বোরকা অধিক ভারী নহে।" [রো-র, পৃ: ৫৭]

"পর্দা অর্থে তো আমরা বুঝি গোপন হওয়া, বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি - কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালমত শরীর আবৃত না করাকেই 'বেপর্দা' বলি। যাঁহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা ভালমত পোশাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হন, তাঁহাদের পর্দা বেশী রক্ষা পায়।" [বোরকা, রো-র, পৃ: ৫৭] লেখিকা তার 'পদ্মরাগ' উপন্যাসেও এ বক্তব্যের প্রয়োগ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণপ্রিয়দের উদ্দেশ্যে করে তিনি বলেন, "কিন্তু এদেশের যে ভগ্নীরা বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাঁহাদের না আছে ইউরোপীয়দের মত শয়নকক্ষের স্বাতন্ত্র [Bed-room privacy] না আছে আমাদের মত বোরকা।" [রো-র পৃ: ৫৮]

www.pathagar.com

"সময় সময় ইউরোপীয় ভগ্নীগণও বলিয়া থাকেন, 'আপনি কেন পর্দা ছাড়েন না" [Why don't you break off purdah]?"

কি জ্বালা! মানুষ নাকি পর্দা ছাড়িতে পারে? ইহাদের মতে পর্দা অর্থে কেবল অন্তঃপুরে থাকা বুঝায়। নচেৎ তাঁহারা যদি বুঝিতেন যে, তাঁহারা নিজেও পর্দার [অর্থাৎ Privacy-র] হাত এড়াইতে পারে না, তবে ওরূপ বলিতেন না। যদিও তাঁহাদের পোশাকেও সম্পূর্ণ পর্দা রক্ষা হয় না, বিশেষতঃ সান্ধ্য-পরিধেয় [evening dress] ত নিতান্তই আপত্তিজনক। তবু তাহা বহু কামিনীর একহারা মিহি শাড়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" [রো-র, পৃ: ৫৮-৫৯]

"সকল সভ্য জাতিদেরই কোন না কোন রূপ অবরোধ প্রথা আছে। এই অবরোধ প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে? এমন পবিত্র অবরোধ প্রথাকে যিনি 'জঘন্য' বলেন, তাঁহার কথার ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম।" [রো-র, পৃ: ৫৯]

"সভ্যতার সহিত অবরোধ প্রথার বিরোধ নাই। তবে সকল নিয়মেরই একটা সীমা আছে। এদেশে আমাদের অবরোধ-প্রথাটা বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে।" [রো-র, পৃ: ৫৯]

নারীর কূপমণ্ডুকতা হ্রাস করার জন্য নারীসমাজের প্রতি বেগম রোকেয়ার পরামর্শ হচ্ছে, "পুরুষেরা যেমন সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদেরও তদ্রূপ করা উচিত। অবশ্য যাঁহাদিগকে আমরা ভদ্র-শিষ্ট বলিয়া জানি, কেবল তাঁহাদের সঙ্গে মিশিব, তাঁহারা যে-কোন ধর্মাবলম্বিনী [ইয়াহুদী, নাসারা, বুৎপরস্ত বা যাই] হউন, ক্ষতি নাই। ....আমাদের ধর্ম ত ভঙ্গপ্রবণ নহে, তবে অন্য ধর্মাবলম্বিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হইলে ধর্ম নষ্ট হইবে এরূপ আশংকার কারণ কি?"

'নার্স নেলী' নামক সত্যিকার কাহিনীতেও তিনি ইসলাম ধর্ম যে ভঙ্গপ্রবণ নয়, তা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের ন্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন যে খ্রিস্টান হলেও ভিতরে ইসলামের প্রতি তার কি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল।

মুসলিম মেয়ে নয়ীমার খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া প্রসংগে তিনি লিখেন, 'তাঁহারা [মিশনারী ললনারা] সন্ধ্যার সময় ভজন গাহিয়া যীশুর অপার মহিমা বর্ণনা করিয়া তাহাকে অনন্ত নরক হইতে রক্ষা পাইবার পথ প্রদর্শন করিতেন। নয়ীমা নিজের ধর্ম সম্বন্ধীয় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস কিছুই জানেন না .....তাঁহার নির্মল অন্তরে যীশু-মহিমার গভীর রেখা অঙ্কিত হইল। তিনি ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর কলুষিত হইতে আরম্ভ করিল। যে কখনও আলোক দেখে নাই, তাঁহার নিকট জোনাকীর আলোই সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ হয়।" [নার্স নেলী, রো-র, পৃ.২০০]। আর তাই নয়ীমা হয়ে গেল নেলী, নার্স নেলী। নার্স নেলী খ্রিস্টান হবার পরে যখন ভুল বুঝতে পারল তখন রীতিমত কোরান পড়ত আর কাঁদত।

পর্দা বা শালীনতায় থেকে যে কোন শালীন কাজ করা অন্যায় নয় বরং প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় তা করা উচিত। "আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন [ওরফে বোরকা] সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরকা পরিয়া চলাফেরায় কোন অসুবিধা হয় না। তবে সে জন্য সামান্য রকমের একটু অভ্যাস [Practice] চাই; বিনা অভ্যাসে কোন কাজটা হয়?"

তিনি আরো বলেন, "প্রকৃত সুশিক্ষার অভাবেই আমরা এমন নিস্তেজ, সঙ্কীর্ণমনা ও ভীত হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধে থাকার জন্য হয় নাই। ....যতদিন আমরা আধুনিক জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকলপ্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।" [রো-র, পৃ: ৬১]

www.pathagar.com

'বোরকা প্রবন্ধের সর্বশেষে তিনি বলেন, "আশা করি, এখন আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তা ভগ্নীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বোরকা জিনিসটা মোটের উপর মন্দ নহে।" [রো-র, পৃ. ৬৩]

বেগম রোকেয়ার যে সমস্ত বক্তব্য আমরা এখানে উপস্থাপন করেছি তাতে যে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা ইসলামের আলোকে তিনি বর্ণনা করেছেন, তার চেয়েও অনেক অধিক অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে বলে বর্তমান কালের অনেক শ্রেষ্ঠ আলেম ও পণ্ডিত তাদের প্রকাশিত পুস্তকাদিতে উল্লেখ করেছেন।

[দ্রষ্টব্য ঃ 'রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা', আব্দুল হালিম আবু শুক্কাহ [১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড]

'ইসলামের হালাল-হারামের বিধান', ইউসুফ কারযাভী;

'Islamic Teaching Course', ড. জামাল বাদাবী [২য়, ৩য় খণ্ড]

'মুসলিম নারীর সংগ্রাম', ড. কাওকাব সিদ্দিক;

'The Family Structure in Islam; Hammudah Abdul Ati; ইত্যাদি

অনৈসলামিক অবরোধ প্রথা প্রসঙ্গে 'ভ্রাতা-ভগ্নী' গল্পে আমরা এক সাহসী চ্যালেঞ্জের পরিচয় পাই। সুফিয়া, সিদ্দিকা ও কাজেব এর কথা কাটাকাটিটি নিম্নরূপ-

"সু। ....আর চতুষ্প্রাচীরের ভিতর কয়েদ থাকার সহিত "মুসলমান শাস্ত্রের" সংশ্রব কি? কোন মুসলমান প্রধান দেশেই ত ঈদৃশ অন্তঃপুর প্রথা নাই, এই ভারতে ও-প্রথা হইয়াছে কেবল অবলা-পীড়নের উদ্দেশ্যে। মক্কাশরীফে কি শিবিকা আছে? সে দেশে "উল্টা গাধা" ছাড়া আর বাহন কই?

কা। কি বলিলে? অবরোধ-প্রথা শাস্ত্রের বিধান নহে? তোমরা কোরান শরীফ দেখাইয়া এ-কথা প্রমাণ করিতে পার?

সি। অবশ্য পারি। কিন্তু আমাদের কথা প্রমাণের পূর্বে তোমরা প্রমাণিত কর-ভারতের বর্তমান পর্দা কোরান শরীফের অনুমোদিত। আমাদের ত রাঙা চক্ষু দেখাইয়া চুপ করাইতে পার; কিন্তু গত অক্টোবর মাসের [১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের] "দি ইন্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিন" "ভারত ললনার পত্রিকা"] দেখ নাই? মাননীয় মীর সুলতান মহিউদ্দীন সাহেব বাহাদুর ৫০০.০০ টাকা পুরস্কার দিবেন, যদি কেহ বর্তমান অবরোধ-প্রথাকে কোরান শরীফের বিধান বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারেন। ঐ কৃত্রিম অন্তঃপুর-বন্ধন মোচন হইলে সমাজে অবাধে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে। তখন এ শিক্ষার গতিরোধ করা অসম্ভব হইবে।" [রো-র, পৃ. ৫২১]

নূর ইসলাম ঃ বেগম রোকেয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ কর্ম করিয়াছেন। মিসেস এ্যানি বেশান্তের ইসলাম শীর্ষক বক্তৃতাটিও তিনি 'নূর ইসলাম' [বা ইসলাম জ্যোতির] নামে তার সাহিত্যধারায় সংযোজন করেছেন। "তিনি নূর ইসলামের এমন উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাহার তুলনা হয় না। এমনকি প্রিয় বঙ্গভাষায় ইহার মর্মোদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।" মূলত এ অনুবাদ কর্মে লেখিকার চিন্তাধারার অনুসরণ ঘটেছিল। রোকেয়া তার জীবনে, কর্মে, সাহিত্যে - সর্বত্রই ইসলামকে সবার উপরে স্থান দিয়ে তার পদচারণা করেছেন। "প্রত্যেক দেশের জাতীয় উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নৈতিক উন্নতির যাবতীয় কারণসমূহের মধ্যে প্রধান কারণ হইতেছে ধর্ম। ধর্ম ব্যতিরেকে মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি কিংবা সভ্যতা লাভ করিতে পারে না। [রো-র, পৃ. ৮২]।

এ প্রবন্ধে মহানবী [স.] এর অনুপম চরিত্র, তার সুমহান ব্যক্তিত্ব ও তার সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। 'প্রতিবেশীবর্গ তাঁহাকে "আমীন" [বিশ্বস্ত] বলিয়া ডাকিত। 'আমীন' শব্দের অর্থ বিশ্বাসভাজন। এমন উচ্চ ভাবপূর্ণ উপাধি কেবল শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিই বিশ্বজগতের নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।' [রো-র, পৃ. ৮৭]।

www.pathagar.com

ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এ্যানি বলেন, "আপনারা আরও একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন, পয়গম্বরের সুপারিশের [শাফা'য়াতের] প্রতি তাহাদের বিশ্বাস কেমন অটল যে, তাহারা মৃত্যুভয় একেবারে জয় করিয়া ফেলিয়াছে। ....কোন্ উদ্দীপনা ছিল, যাহা তাঁহাদিগকে এমন ভীষণ মৃত্যুমুখে লইয়া যাইত? তাহা কেবল পয়গম্বরের কোরআনের মহিমা এবং ইসলাম প্রেম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, [তাঁহাদের] এই ভক্তি পৃথিবীতে ভবিষ্যতে অটল রহিবে, বরং বর্তমান যুগ অপেক্ষা ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিবে। [আমীন]।" [রো-র পৃ. ৮৯]

মহানবী [স.] মৃত্যুর পূর্বে সকল ঋণ শোধের ঘোষণা দিলে একজনকে ত্রিশ 'দেরেম' পাওনা পরিশোধ করেন। আর একটি পাওনা পরিশোধ হয় অন্যভাবে, যা 'আক্কাসের তাজিয়ানা' নামে পরিচিত। রোকেয়া এক্ষেত্রে মহানবী [স.]-এর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে যে মন্তব্য করেন তা লক্ষ্য করা যাকঃ

"বলি, আজ পর্যন্ত জগতে কেহ ঐরূপ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছে কি? আমার বিশ্বাস রসুলকে গাত্র বস্ত্র মোচন করিতে দেখিয়া স্বর্গদূত [ফেরেস্তা] পর্যন্ত কম্পিত হইয়াছিলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আরও কোন মহাপুরুষ দেখাইতে পারিয়াছেন কি? ['নূর ইসলাম'-এ রোকেয়ার মন্তব্য, পৃ. ৯৯]

মিসেস এ্যানি আরো বলেন, "এখন আমি আপনাদিগকে আরবীয় পয়গম্বরের প্রতি যেসব অন্যায় দোষারোপ করা হয়, তাহার বিষয় বলিতেছি। অনভিজ্ঞতা ও ন্যায়ান্যায় জ্ঞানাভাবে অথবা শুধু কুসংস্কার বশতঃ রসুলের প্রতি ঐসব দোষারোপ করা হইয়া থাকে।" [নূর-ইসলাম]।

মহানবী [সঃ]-এর বিরুদ্ধাচরণ যারা করেন তাদেরকে উপরের বাক্যটি স্মরণে রাখতে বলি। তিনি বলেন, "তাঁহার একমাত্র দোষ এই বলা হয় যে, তিনি জীবনের শেষভাগে সর্বশুদ্ধ ৯ জন মহিলার পানি গ্রহণ করেন। তিনি বিবাহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আপনারা কি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, সেই ব্যক্তি, যিনি ২৪ বৎসর পর্যন্ত, বয়ঃক্রম পর্যন্ত কোন প্রকার 'মকারাদি' কু অবগত ছিলেন না, পরে নিজের অপেক্ষা অনেক অধিক বয়স্কা একটি বিধবার পানি গ্রহণ করিয়া তাঁহারই সহিত অতি সুখে জীবনের ২৬টি বৎসর যাপন করিলেন; তিনি শেষ বয়সে যখন মানুষের জীবনীশক্তি নির্বাপিত প্রায় হয়, শুধু আত্মসুখের জন্যই যে কতকগুলি বিবাহ করিবেন তাহা কি সম্ভব? যদি ন্যায় বিচারের সহিত বিবেচনা করেন, তবে আপনারা বেশ জানিতে পারিবেন– সে বিবাহের উদ্দেশ্য কি ছিল। প্রথমে দেখিতে হইবে, তাঁহারা [হজরতের পত্নীগণ] কোন্ শ্রেণীর কুলবালা ছিলেন, আর কেনই বা তাঁহাদের রসুলের প্রয়োজন ছিল। -কতিপয় নারী এরূপ ছিলেন যে, তাঁহাদের বিবাহের ফলে রসুলের পক্ষে 'নূর-ইসলাম' প্রচারের সুবিধা হইল। আর কয়েকজন এরূপ ছিলেন যে, বিবাহ ব্যতীত তাঁহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অন্য কোন উপায় ছিল না।" [নূর-ইসলাম, রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ৯৯]

বহুবিবাহ সম্পর্কে খুব অল্প কথায় কোন যথার্থ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে ইসলামের সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গি কি তা বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে অতি উত্তম আলোচনা রয়েছে ড. জামাল বাদাবীর বক্তৃতামালায়, যা পুস্তক আকারে "Islamic Teaching Course" নামে প্রকাশিত হয়েছে। [দ্রষ্টব্যঃ Islamic Teaching Course, Volume-3, G.31 to G.35 অথবা এর বাংলা অনুবাদ ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ ও শারমিন ইসলামকৃত 'ইসলামের সামাজিক বিধান'; 'বিশ্বনবী', কবি গোলাম মোস্তফা]।

www.pathagar.com

মিসেস বেশাস্তের আহ্বান ঃ "হে ভ্রাতৃগণ! কোন ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে তাঁহাকে ঠিক সেইভাবে দেখুন, যে অবস্থায় তিনি বাস্তবিক থাকেন, কুসংস্কারের চশমা পরিয়া দেখিবেন না।" [নূর-ইসলাম, রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ১০১]

দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের প্রতি লেখিকার পরামর্শ, "অদ্য যদি আমার মুসলমান ভ্রাতৃগণ নিজেদের ঐসকল জগন্মান্য পূর্ব-পুরুষদের রচিত শিক্ষাসংক্রান্ত পুস্তকাবলী আধুনিক প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া লয়েন এবং সর্বসাধারণে ঐ শিক্ষা প্রচার করেন, তবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহারা ইসলামী দর্শনকে সমস্ত জগতের শীর্ষস্থানে তুলিতে সক্ষম হইবেন।" [নূর-ইসলাম, রো-র, পৃ. ১০৪]

গত ১৩২৫ সালের শ্রাবণ মাসের 'আল এসলাম' পত্রিকার ১৯৮ পৃষ্ঠায় 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মোহাম্মদ [দ.]' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিতে পাই, "হজরত মুহাম্মদ [দ.] এত দূরদর্শী ছিলেন যে, তিনি বিরুদ্ধ ভোজন এবং অতি ভোজন দোষ দূর করিবার জন্য এক তরকারী দিয়া আহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আজ যদি মানবমণ্ডলী এক তরকারী দিয়া আহার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি বহু সংখ্যক ব্যাধি একেবারে দূরীভূত হইয়া পৃথিবীকে অর্দ্ধস্বর্গে পরিণত করিতে পারে।" [শিশু-পালন, রো-র, পৃ. ২১১]

লেখিকা "পুরাকালের, বিশেষতঃ মুসলমান নিয়মের সংগে এখনকার ডাক্তারী ব্যবস্থার তুলনা করে" দেখিয়েছেন। তিনি কয়েকটি ব্যবস্থার তুলনা দেখান। যেমন- "এই দেখুন না, আমাদের ব্যবস্থা বলে ঃ...

[৪] মুসলমানী মতে ৪০ দিন আর হিন্দু মতে ২১ দিন পর্যন্ত পোয়াতি শুয়ে বসে থাকবে, বেশী নড়াচড়া করবে না। .....আর আধুনিক ডাক্তার কি বলেন? তিনি বলেনঃ..... [৪] ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত প্রসূতির পেটের ভিতরের অংশ বিশেষ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং সে সময় নড়াচড়া করা উচিত নয়। এমন কি বিছানা ছেড়ে উঠতে নাই। [৬ সপ্তাহ অর্থে ৪২ দিন, তবে আমাদের মুসলমানী ব্যবস্থা ৪০ দিন ঘরে থাকতে বলেও কি পাপ করলে?]" [ঐ, পৃ. ২১১-২১২]

অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি যেটিকে ইসলামের বিধান বলে জানতে পেরেছেন তাকে ব্যাখ্যা করার, তার যুক্তি তুলে ধরার এবং তার সৌন্দর্য বিবৃত করার সামগ্রিক চেষ্টা করেছেন।

লুকিয়ে শ্রবণ করা ঃ এটা ইসলামেরই শিক্ষা যে, কারো অগোচরে কোন কথা শ্রবণ করবে না। লেখিকা তার ইসলামী ভাবধারায় পরিপুষ্ট, চরিত্র দ্বারা বিভিন্ন ইসলামী মৌলিক শিক্ষাই পাঠক সমাজের কাছে পৌছাতে প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন–

"বদর। আমরা তাঁহার সম্মুখে যাইব না– পার্শ্বের ঘরে লুকাইয়া শুনিব।

কওসর। ছি বদু! লুকাইয়া কিছু শোনা উচিত নহে; সাবধান!" [সৌরজগৎ, রো-রা, পৃ. ১১০]

নামাজে একাগ্রতা ঃ তিনি নিজে নামাজী ছিলেন। লেখিকার সৃষ্ট বিভিন্ন কেন্দ্রীয় চরিত্রে নামাজী চরিত্র পাওয়া যায়। যেমন– 'সৌরজগৎ'-এর সকল চরিত্র, 'পদ্মরাগ'-এর ছিদ্দিকা, লতিফ প্রমুখ, ...ইত্যাদি। 'সৌরজগৎ-এ গওহর-জাফরের বাদানুবাদের এক পর্যায়ে নারীর জন্য বাঞ্ছনীয় কাজের কথার পরিপ্রেক্ষিতে জাফর বলে যে, "বাঞ্ছনীয় এই, - তাহারা সুচারুরূপে গৃহস্থালী করে, রাঁধে, বাড়ে, খাওয়ায়, খায়, নিয়মিতরূপে রোজা-নামাজ প্রতিপালন করে।" প্রত্যুত্তরে-

"গও। নামাজ কাহার উদ্দেশ্যে?

জাফ। [আরক্ত লোচনে] কাহার উদ্দেশ্যে? - খোদাতালার উদ্দেশ্যে!

গও। বেশ ভাই ঠিক বলিয়াছ। তুমি অবশ্যই জান, একটা পারস্য বয়েৎ আছে- 'চিত্র দেখিয়া চিত্রকরকে স্মরণ কর।' আর ইনি এমনই মহাশিল্পী বলিয়া কাহার প্রশংসা করিলেন।

জাফ। মহাশিল্পী ত ঈশ্বরকে বলা হইয়াছে।

www.pathagar.com

গও। তবে কবিত্ব ধর্মের বিরোধী হইলো কিসে? ঈশ্বরের সৃষ্টি যতই অধিক দেখা যায় ততই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি হয়। চক্ষু, কর্ণ যথাবিধি খাটাইয়া সৃষ্টি-জগতের পরিচয় না লইলে স্রষ্টাকে ভালোমতো চিনিবে কিরূপে? পর্বতচূড়ায় দাঁড়াইলে আপনা হইতেই হৃদয়ে ভক্তি-প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হয়, তখন অজ্ঞাতে হৃদয়-তন্ত্রে বাজিয়া উঠে–

কিন্তু সেই মহাকবি আঁকিয়া এমন ছবি
আপনি অদৃশ্য হয়ে আছেন কোথায়?
পরস্পরে তরুলতা কহিছে তাহারি কথা
যেন বলিতেছে : "বিভু এই ত হেথায়।"
সেদিকে ফিরালে আঁখি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি
বিভু যেন সরে যান মরীচিকা-প্রায়!
কিন্তু সে চরণ-রেখা সর্বত্রই যায় দেখা,
কুসুম-সৌরভে তাঁর গন্ধ পাওয়া যায়।
[ভাব-চক্ষু আছে যার দেখিতে কি বাকি তার?
সে মুদ্রিত চক্ষে তাঁর দরশন পায়।]
অস্ফুট নীরব স্বরে প্রকৃতি প্রচার করে,-
"শিল্পীর মহিমা শিল্প আপনি জানায়!"

["ঈগেল্‌স ক্রেগ" নামক পর্বত-শিখর হইতে মধ্যাহ্নে [আকাশ নির্মল থাকিলে] প্রকৃতির সৌন্দর্য যেরূপ দেখায় তদবলম্বনে রচিত। গিরি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' প্রায় সর্বদা মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে, সুতরাং তাহার দর্শন-লাভ সাধারণ ব্যাপার নহে।] [কাঞ্চনজঙ্ঘা, রো-রা, পৃ. ৫৬৬]।

'ভ্রাতা-ভগ্নি'-তে নামাজের একাগ্রতার গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে তিনি বলেন, "কি তামাসাই হয়, যখন মাতা "মগ্‌রেবের" নামাজ পড়িতে [সন্ধ্যাকালীন উপাসনা করিতে] দাঁড়ান আর বৈঠকখানা হইতে সেতার-সংযোগে পিশাচি-কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত তাঁহার কর্ণকুহরে সুধা ঢালিতে থাকে!" [রো-রা, পৃ. ৫১৮]

রোজার শিক্ষা ঃ "রোজা" [উপবাস] ব্রত আমাদিগকে সংযম শিক্ষা দিয়া থাকে। এই রোজা যথানিয়মে পালন করিলে সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়। মানুষ মাত্রেই সংযম শিক্ষা আবশ্যক।" [রসনা-পূজা, রো-রা, পৃ. ২৫৪]

"আক্ষেপের বিষয়, রমজান মাসে আমাদের খাদ্য-সামগ্রীর ধুমধাম সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়। সমস্ত দিন সাংসারিক কার্য হইতে বিরত থাকিয়া নির্মল চিত্তে উপাসনা করা ত দূরে থাকুক "ইফতারী" [সন্ধ্যাকালীন খাবার] প্রস্তুত করিতেই দিন শেষ হয়। কোথায় রসনা সংযত হইবে, না আরও রসনার সেবা বৃদ্ধি পায়। প্রকারান্তরে রোজার নাম করিয়া রসনা-পূজার মহাআড়ম্বর হয়। পূর্বে মহাপুরুষেরা সামান্য ফল-মূল বা শাক-রুটি দ্বারা সন্ধ্যায় জলপান [ইফতার] করিতেন। রাত্রিতে কি খাইবেন, দিবাভাগে খোদাকে ভুলিয়া সে চিন্তাও করিতেন না। ধর্মগুরু মোহাম্মদ [দ.] নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করিবার আশায় সমস্ত দিন পানভোজন ত্যাগ করিয়া নির্জন স্থানে থাকিতেন। আর এদেশের মুসলমানেরা তাঁহার উপযুক্ত [?] শিষ্য কিনা, "ধর্ম ধর্ম" বলিয়া চিৎকার-স্বরে গগন-মেদিনী কাঁপাইয়া তোলেন, -তাই বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণে ও সন্ধ্যার খাবার-আয়োজনে সমস্ত দিন ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকেন!! ইহাতে রোজার উদ্দেশ্য যে কত দূর সাধিত হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

www.pathagar.com

যত প্রকার উপবাস-ব্রত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে আমাদের রোজা-ব্রতই শ্রেষ্ঠ অবশ্য যদি রোজার সব নিয়মগুলি যথাবিধি প্রতিপালিত হয়। ইহা দ্বারা যত উপকার হয়, তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা অসাধ্য। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝেন। [রো-র, পৃ. ২৫৫]

হজ্জ প্রসঙ্গে ঃ হজ্জ প্রসঙ্গে তার নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলো লক্ষ্য করুন, 'পরিষ্কার বস্ত্র, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন শরীর, সর্বোপরি ভক্তিপূর্ণ বিশুদ্ধ মন, পবিত্র প্রাণ লইয়া হজ্জ করিতে হয়।" [হজ্জের ময়দানে, রো-র, পৃ. ৩০৭]

"ইহাতে দেখা যায় যে, ইহ্‌রাম সমস্ত নরনারীকে তুল্য অবস্থায় রাখে - পুরুষ ও নারীর স্থান সমান। সকলেই সেলাইবিহীন সাদাসিদে কাপড় পরে এবং সকলেই আড়ম্বরশূন্য সাধারণভাবে সাধু জীবনযাপন করে। ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মুর্খ, স্বদেশী, বিদেশী সকলে এক সাম্য-মন্দিরে অবস্থান করে। এই দিন এই স্থানে রাজা, বাদশাহ আর নগণ্য কৃষকে কোন প্রভেদ থাকে না। ইহ্‌রামে পুরুষ ও নারীর স্থান সমান। সেখানে পদ ও বর্ণ, সম্পদ ও জাতি, রাজা ও প্রজায় কোনই প্রভেদ নাই। স্রষ্টার সম্মুখে সকল মানবজাতি সেখানে একই আকার ধারণ করিয়া আছে। সেই কারণে 'আরাফাত' নামক আশ্চর্য মরুভূমিতে সমগ্র মানবজাতির সাম্যই সুন্দর ও মহৎ দৃশ্য। আরাফাতেই মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত পরিচয় পাইতে সক্ষম হয়।" [রো-রা, পৃ. ৩০৮]

"হজ্জের সময় নরনারীর তুল্য অধিকার। উভয়ের পরিধেয় একই প্রকার সেলাইবিহীন দুই খণ্ড বস্ত্র মাত্র।" [প্রাগুক্ত, রো-রা, পৃ. ৩০৯]

কোন এক সংখ্যা মাসিক 'মোহাম্মদী'তে শ্রদ্ধাস্পদ মাওলানা আকরম খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন, "যাহারা নারীর জন্য অবরোধ প্রথাকে ইসলাম ধর্মের অঙ্গ বলে, তাহাদিগকে ফতওয়া দেখাইতে হইবে যে, স্ত্রীলোকের জন্য হজ্জ নিষিদ্ধ। কারণ, হজ্জ করিতে গেলে সর্বপ্রকার ইহ্‌রামের সময় মুখাবরণ খুলিতে হইবে। 'ইত্যাদি! –লেখিকা।" [প্রাগুক্ত]

কোরবানী ঃ "হজ্জ সমাপনান্তে কোরবানীর পালা। কোরবানী বলিতে হাজীগণ পশু হত্যা করেন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা মনের সমস্ত কলুষ, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, দুষ্ক্রিয়ার কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি অন্তরের যাবতীয় কালিমা হত্যা করিয়া নির্বাণ মুক্তিলাভ করেন।" [প্রাগুক্ত]

ঈদ মাহাত্ম্য ঃ ঈদের দিন, উৎসবের দিন, সমুদয় মোস্‌লেম সমাজের সম্মিলনের দিন! ঈদের নামাজের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় তা অপরূপ। তিনি বলেন, "ঈদের নামাজের মূলে কি মহান ঐক্য লক্ষিত হয়! সহস্র সহস্র লোক একই কাবাশরীফ লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নামাজে দাঁড়াইয়াছে; সকলে একই সঙ্গে ওঠে একই সঙ্গে বসে, একই সঙ্গে সহস্রাধিক মস্তক - প্রভুর উদ্দেশে আনত হয়। তারপর? তারপর, নামাজ সমাপ্ত হইলে পরে সকলে ভ্রাতৃভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। কি সুন্দর ভ্রাতৃভাব। যাহারা প্রতিবেশীর প্রতি এতদিন কোনরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করিত, তাহারা আজি সে হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছে। আজি মসজিদে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন এক যোগে সম্মিলিত হইয়াছে! এ দৃশ্য কি চমৎকার! এ দৃশ্য দেখিলে চক্ষু পবিত্র হয়, ক্ষুদ্র স্বার্থ, নীচ ঈর্ষা লজ্জায় দূরীভূত হয়, নিরানন্দ, মৃতপ্রায় প্রাণে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়। জাপানে একতা আছে সত্য, কিন্তু আমাদের এ অপার্থিব একতার তুলনা কোথায়? বৎসরের শুভদিনে এমন শুভ-সম্মিলন কোথায়?" [ঈদ-সম্মিলন, রো-রা, পৃ. ২৫৮]

কিন্তু সে ঐক্য দুঃখজনকভাবে বিরাজ করছে না বা করে না। লেখিকা এ বক্তব্যেরই সুর তুলেছেন নিম্নের অংশে–

"কালের বর্তমানে এরূপ আরও অনেক ঈদ আসিয়াছে; আরও অনেকবার মোসলেম ভ্রাতৃগণ এমনই ঈদের নামাজে যোগ দিয়াছেন, আরও অনেক বৎসর ঈদের নবীন চন্দ্র তাঁহাদের প্রাণে

www.pathagar.com

এমনই করিয়া ঐক্য জাগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দিবাশেষে ঈদ রবির অস্ত-গমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃভাবও ম্লান হইয়াছে। যেন প্রতি বৎসর ঐক্যরূপ অমূল্য রত্নটি আমরা মসজিদ প্রাঙ্গণে রাখিয়া আসি! অথবা একতা যেন মসজিদ প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকে! বলি, এ বৎসর এ বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগেও কি আমাদের ঈদ-সম্মিলন দিবাশেষে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইবে? না, এবার আমরা একতা সযত্নে রক্ষা করিব।" [প্রাগুক্ত]

প্রকৃত মুসলমানের সংজ্ঞা ঃ মুসলমান সমাজ প্রকৃত দশা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সত্যিকার মুসলমানের যে সব বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, তার দৈন্য দশায় আজকের সমাজের মুসলমানরা পিছিয়ে আছে বহুদূর। বেগম রোকেয়া এই মুসলিম উম্মতের দুঃখজনক পরিণতি অবলোকনে আশংকা ব্যক্ত করেছেন বার বার। তার লেখনী শুধুমাত্র নারী জাগরণেরই নয়– মূলত নারী জাগরণের ভিতর দিয়ে সমাজব্যবস্থার মূল 'পরিবার'কে জাগ্রত করে তোলা, আর এভাবে পুরো সমাজকে অচেতন থেকে সচেতন করার জন্য পরিপক্ক ছিল।

মহানবী [স.]-এর সাহাবীদের নিষ্ঠার প্রসঙ্গে 'নূর ইসলাম' এ লেখা আছে "তাঁহার সমবিশ্বাসীগণ এমন নিষ্ঠার সহিত ইলাহীর ধ্যান ও স্মরণে নিমগ্ন হইলেন যে, তাহার আদর্শ অন্য কোন ধর্মে পাওয়া সম্ভবপর কি না সন্দেহ। কারণ, আপনারা একটু চিন্তা করিলে এবং ন্যায়চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যে, অন্য কোন ধর্ম এমন নাই, যাহাতে এমন অকপট হৃদয় সত্যবিশ্বাসী লোক পাওয়া যায়। এই জ্ঞান-বিশ্বাস তাহারা [মুসলমানেরা] আরবের পয়গম্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।" [রো-র, পৃ. ৮৯]

মিসেস এ্যানি বেশান্তে বর্ণিত মুসলমান হচ্ছে, "একজন মুসলমান– যদ্যপি এমন কোন স্থানে এমন কতকগুলি লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, যাহারা তাহাতে ঠাট্টা-বিদ্রূপের স্থানে এমন ছুরিকায় খণ্ড খণ্ড করে এবং তাহার পয়গম্বরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে– নামাজে মস্তক অবনত করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না।" [প্রাগুক্ত]

মুসলমানদের উপরোক্ত সংজ্ঞা শ্রবণে রোকেয়ার অনুভূতির দিকে লক্ষ্য করুন: "মিসেস এ্যানি বেশান্তের বর্ণিত মুসলমান কি আমরাই? ছি! ছি! ধিক্ আমাদের। আমরা মুসলমান নামের কলঙ্ক। বঙ্গদেশে দড়ি ও কলসী একেবারে নাই কি?" [প্রাগুক্ত]

আবার 'ভ্রাতা-ভগ্নীতে কাজেব, সিদ্দিকা ও সুফিয়ার কথোপকথনে মুসলমানের দশা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল–

"কা। .....কিন্তু মুসলমান [সগর্বে] যাহারা মুসলমান শাস্ত্রের নিয়ম মত চলিতে বাধ্য ও তদ্রূপ চালচলনকে ঘৃণা করে না, তাহারা ত সহসা তোমাদের অনুকরণ করিতে অক্ষম!

সি। যাহারা তোমার মত মুসলমান, তাহারা মুসলমান নামের যোগ্য কি না, পূর্বে তাহার মীমাংসা হওয়া চাই। কেবল গো-মাংস ভক্ষণই মুসলমানের চিহ্ন নহে! তোমার বর্ণিত 'মুসলমান' নামধারী ব্যক্তিরা কোন মন্দ কাজ করিতে বাকী রাখে নাই; মিথ্যা বলা, পরস্বাপহরণ করা, জাল-জুয়াচুরি করা– নানা প্রকার অসাধু ব্যবহার করা ত প্রায় তাহাদেরই নিত্যকর্ম। তাহাদের মুসলমান বলিলে পবিত্র 'মুসলমান' শব্দটি কলঙ্কিত হয়।

সুফিয়া। ভাই! তোমার আদর্শ একদল মুসলমান এমন আছেন যে, তাঁহারা কোরান শরীফের এক পৃষ্ঠা দেখিয়াছেন, অপর পৃষ্ঠা দেখেন নাই! তাঁহারা 'সূরা নেসার' ৩৪শ আয়েত দেখিয়াছেন, 'সূরা নূর' এর ২য় এবং 'সূরা মায়দা'র ৯১ আয়েত দেখেন নাই!

সি। ঐ 'সূরা নেসা'রই ২৪শ আয়েতের প্রথমাংশ দেখিয়াছেন, শেষাংশ দেখেন নাই।" [রো-র পৃ. ৫১৬]

www.pathagar.com

কোরানের সামগ্রিক শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা না করে কেবল কোন বিষয়ের কোরান-সুন্নাহ থেকে একটি দিক দেখা এবং অন্যদিক না দেখার যে প্রবণতা মুসলমানদের মধ্যে সে যুগে ছিল [এবং এ যুগেও আছে] এ প্রসঙ্গে রোকেয়ার উপরোক্ত আলোচনা খুবই যথার্থ।

একই গল্পে কোরানবিমুখ মুসলমানদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তিনি বলেন, "বেচারা বিলাত-ফেরতা ভাইয়ের দোষ দিব কি– তিনি ঐ কোরান শরীফের এক পৃষ্ঠাদর্শী মুসলমানদের দলে মিলিয়া 'শিভালরী' [অবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন] ভুলিয়াছেন! অন্ধভাবে গড্ডালিকাপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছেন!" [রো-র, পৃ. ৫২৪]

পীর পূজা ঃ উপমহাদেশে পৌত্তলিকের শিকড়কে উপড়ে ফেলে ইসলামের বীজ বপন করা সত্ত্বেও অনেক মানুষের ভিতরেই রহ-নঁরষঃ কিছু পৌত্তলিকতা বা শিরকের রূপ বিভিন্ন ভড়ৎস-এ বিরাজ করছে। ব্যক্তিপূজা, বস্তুপূজা, আল্লাহর প্রতি বিভিন্নরূপে অনাস্থাশীলতা প্রভৃতি শিরকেরই বিভিন্ন রূপ। বেগম রোকেয়া এসব শিরকের বিভিন্ন উৎসকে সমূলে নির্বাপিত করতে চেয়েছিলেন; অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর পূজা করাকে। তিনি লিখেন, "ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর পূজা করিলে আত্মার অধঃপতন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রকার অবনতিও হয়।" [রসনা-পূজা, রো-র, পৃ. ২৫১]

পীরপ্রথা সম্পর্কে রোকেয়ার ভাষ্য, "যেহেতু দেবতাদের অনুকরণে অনেকগুলি পীরের নাম শুনা যায়– এক এক প্রকার বিপদে এক এক পীরের অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত 'নজর ও নেয়াজ' দিতে হয়! যাহাকে ক্ষিপ্ত কুকুর দংশন করে, সে বেচারা 'কোত্তা [কুকুর] পীরের দরগাহে' [মন্দিরে?] গিয়া 'নজর' [দর্শনী] মানত করিয়া আইসে! হঠাৎ কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে 'আচানক [হঠাৎ] পীরের' উদ্দেশ্যে রোজা রাখা নয়! সম্ভবতঃ পা খোঁড়া হইলে 'লঙ্গর শাহের দরগাহে' 'শিন্নী' লইয়া যাইতে হয়!" [প্রাগুক্ত]। রোকেয়া পুরো মুসলিম সমাজের সামনে এ প্রশ্ন রেখেছেন, "হিন্দুদের নৈবেদ্যের সহিত উক্ত প্রকার 'নজর ও নেয়াজে'র সাদৃশ্য নাই কি?" [প্রাগুক্ত]। 'পঁয়ত্রিশ মণ খানা' রম্যরচনায় তিনি পীর ঝুংঃবস-এর তৎকালীন অবস্থার এক রূপক চিত্র তুলে ধরে মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থান থেকে সবচেয়ে মারাত্মক বিচ্যুতিকে রূপায়িত করেছেন।

মতামত প্রকাশে ভোটাধিকার ঃ নারীর মতামতকে প্রায়শঃই উপেক্ষা করা হয়। আর তাই রোকেয়া 'মুক্তিফল' রূপকথায় শ্রীমতীর কণ্ঠে ঝরিয়েছেন ঃ

"বেশ। দেখিব, সুমতি আর কতদিন তাহার মস্তিষ্কের অস্তিত্ব গোপন রাখে। কিন্তু দাদা, আমাদিগকে মস্তক উত্তোলন করিতে না দিলে তোমাদেরও বলবৃদ্ধি হইবে না যে!" এর পরই নারীর মতামতকে উপেক্ষাকারী পুরুষের প্রতিনিধি নিন্দুকের কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে, চুপ কর শ্রীমতী, তোমার বক্তৃতা শুনিতে চাই না। তুমি নিজের কাজ দেখ, হাঁড়ি বাসন ধোও গিয়া। [রো-র, পৃ. ২২৩]

অন্যত্র নারীর ভোটাধিকারের প্রসঙ্গে রোকেয়া বলেন, "এখন স্ত্রীলোকেরা ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহারে স্বেচ্ছায় বঞ্চিতা রহিয়াছেন। গত ইলেক্শনের সময় দেখা গেল কলিকাতায় মাত্র ৪ জন স্ত্রীলোক ভোট দিয়াছে। ইহা কি মুসলমানের জন্য গৌরবের বিষয়? তাঁহারা কোন সুযোগের আশায় বা অপেক্ষায় বসিয়া আছেন?" [বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি, রো-রা, পৃ. ২৮০]

আজকের বাংলাদেশেও দেখা যায় কোন কোন অঞ্চলে গ্রাম্য মোড়ল দ্বারা গোঁড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে অনেক নারী ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। [সূত্র: ভোরের কাগজ, ২৫ নভেম্বর, ১৯৯৮]। অথচ ইসলাম নারীকে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তার পূর্ণ মত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে।

www.pathagar.com

নারীকে শাস্ত্রীয় অধিকার প্রদান ঃ ইসলাম নারীকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে এবং ভারসাম্যপূর্ণ অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমান সমাজ নারীর প্রতি অতটা সচেতন তখন ছিল না; এখনও এতটা নয়। রোকেয়া এক সভায় সভানেত্রীর বক্তৃতায় ইসলাম প্রদত্ত প্রাপ্য অধিকার প্রদানের জন্য পুরুষদের আহবান জানিয়ে বলেন, "যে পর্যন্ত পুরুষগণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাও দিবে না। যাহারা নিজের সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না, তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? অর্ধাঙ্গীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা পাগলেরই শোভা পায়! ....কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদ্‌রত বা প্রকৃতির নিয়ম অতি চমৎকার! তিনি এ বিশ্ব-জগৎকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন– আমরা পরস্পরের সহিত এরূপভাবে জড়িত আছি যে, একে অপরকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারি না। মুসলিম ভ্রাতৃগণ যতদিন আমাদের দুঃখ-সুখের প্রতি মনোযোগ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের কথাও ভারতের অপর ২২ কোটি লোক শুনিবে না, আর যতদিন ঐ ২২ কোটি লোকে ৮ কোটি মুসলমানকে উপেক্ষা করিবে ততদিন পর্যন্ত তাঁহাদের রোদনও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না!" [রো-র, পৃ. ২৮০-২৮১]

সুগৃহিণী হওয়ার প্রতি আহ্বান ঃ "আমি বলি, সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা [Mental culture] আবশ্যক। এই যে গৃহিণীদের ঘরকন্নার দৈনিক কার্যগুলি, ইহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্যও ত বিশেষ জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন। চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই সমাজের হর্ত্রী, কর্ত্রী ও বিধাত্রী, তাঁহারাই সমাজের গৃহলক্ষ্ম, ভগিনী এবং জননী।" [সুগৃহিণী, রো-র, পৃ. ৪৬]

রোকেয়া স্বামীর কষ্টকর উপার্জনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে গৃহিনীদেরকে আহ্বান করেছেন [পুরুষেরা হয়ত নিম্নোক্ত বক্তব্য শ্রবণে খুশি হবেন] যে, "পরিমিত ব্যয় করা গৃহিণীদের একটা প্রধান গুণ। হতভাগা পুরুষেরা টাকা উপার্জন করিতে কিরূপ শ্রম ও যত্ন করেন, কতখানি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া এক একটি পয়সার মূল্য [পারিশ্রমিক] দিয়া থাকেন, অনেক গৃহিণী তাহা একটু চিন্তা করিয়াও দেখেন না। উপার্জন না করিলে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিবেন, যথাসাধ্য কটুকাটব্য বলিবেন, কিন্তু একটু সহানুভূতি করেন কই? ঐ শ্রমার্জিত টাকাগুলি কন্যার বিবাহে বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে কেবল সাধ [আমোদ] আহলাদে ব্যয় করিবেন, অথবা অলংকার গড়াইতে ঐ টাকা দ্বারা স্বর্ণকারের উদরপূর্তি করিবেন। স্বামী বেচারা এক সময় চাকরীর আশায় সার্টিফিকেট কুড়াইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, বহু আয়াসে সামান্য বেতনের চাকরী প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ-পণে পরিশ্রম করিয়া যে টাকা কয়টি পত্নীর হাতে আনিয়া দেন, তাহার অধিকাংশ মল ও নুপুরের বেশে তাঁহার কন্যাদের চরণ বেড়িয়া রুনু ঝুনু রবে কাঁদিতে থাকে। হায় বালিকা! তোমার চরণ শোভন সেই মল গড়াইতে তোমার পিতার হৃদয়ের কতখানি রক্ত শোষিত হইয়াছে, তাহা তুমি বুঝ না। .....স্বামীর আয় অনুসারে ব্যয় করাই অর্থের সদ্ব্যবহার।" [রো-র, পৃ. ৪৭-৪৮]

স্রষ্টার শিল্প-সৌন্দর্য অনুধাবন ঃ "সৌদামিনী চলিয়া গেলে সিদ্দিকা নিবিষ্টচিত্তে মুগ্ধনেত্রে প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া দেখিয়া মোহিত হইতেছিলেন, আকাশে নানা বর্ণের আলোকমালা, পশ্চিমে সুবর্ণ রবি, নীচে এই বিবিধ তরুলতা-শোভিত সৌম্য মহান পীরপাহাড় - এত সব কাব্য দেখিয়া সৃষ্টিকর্তার শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া কি থাকা যায়?" [পদ্মরাগ, রো-র, পৃ. ৩৯৩]। রোকেয়ার মন্তব্য হতে আমরা বুঝতে পারি, বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ পাকের প্রতি তিনি কত গভীর বিশ্বাসী ছিলেন।

www.pathagar.com

আর এ সৌন্দর্য-সৃষ্টি যতই অধিক দেখা যায়, ততই স্রষ্টার প্রতি ভক্তির প্রসার ঘটে। কোরানে তাই অনেক স্থানে মুসলমানদের আহ্বান করা হয়েছে সৃষ্টি রহস্য অবলোকন করতে, চিন্তা করতে এবং আল্লাহ্‌কে গভীরভাবে চিনে নিতে ইত্যাদি। রোকেয়া নিজেই তাঁর 'সৌরজগৎ'-এ বলেছেন, "চক্ষু, কর্ণ যথাবিধি খাটাইয়া সৃষ্টি-জগতের পরিচয় না লইলে স্রষ্টাকে ভালোমতো চিনিবে কিরূপে?" [রো-রা, পৃ. ১১৯]

যৌতুক প্রথা ঃ ইসলামে যৌতুক প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইসলামী ব্যবস্থায় নারীকে বিয়ের প্রাক্কালে মোহরানা প্রদান অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছে। তৎকালীন সমাজের তথ্য আমার অজানা, কিন্তু আজকে আমরা প্রায় প্রতিদিনই যৌতুকের কারণে নারী নির্যাতনের, নারী হত্যার খবর পেয়ে থাকি।

'পদ্মরাগ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সিদ্দিকা তার আক্‌দ-করা স্বামী লতিফ হতে উপেক্ষিত হয় এবং লতিফ অন্যত্র বিয়ে করে। ঘটনাক্রমে সেই স্বামী নবরূপে সিদ্দিকাকে বরণ করতে চায় - সত্যিকার ভালবাসার সাথে, কেননা ঘটনালগ্নিতে লতিফ নির্দোষ ছিল। কিন্তু সিদ্দিকা পুরোপুরি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। তার মতে, "আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকু'মাগণ উদীয়মনা তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন, "আর রাখ তোমার পণ ও তেজ - এ দেখ না, এতখানি বিড়ম্বনার পরে জয়নব আবার স্বামী-সেবাই জীবনের সার করিয়াছিল।" আর পুরুষ-সমাজ সগর্বে বলিবেন, "নারী যতই উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহীয়সী, গরীয়সী হউক না কেন, -ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে!" - আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে। পক্ষান্তরে আমার এই আত্মত্যাগ ভবিষ্যতে নারীজাতির কল্যাণের কারণ হইবে বলিয়া আশা করি।" [রো-র, পৃ. ৪৫২-৪৫৩] - সিদ্দিকা গ্রন্থকর্ত্রীর মানস-সৃষ্টি।

"উষা। এই যে 'পতি পরম গুরু' - এই ভাবটাই মারাত্মক! পুরুষ যাহাই করুন না কেন, - অবলা সরলার জন্য 'পতি পরম গুরু', 'পতি বিনে নাই গতি'। কেন বাপু? এত বড় বিশাল ধরণী কি তোমাদেরই একচেটিয়া বাসস্থান?

সৌ। সিদ্দিকার এই মহান আত্মত্যাগের ফলে মুসলমান পুরুষগণ ভবিষ্যতে কোন 'আক্‌দ' করা মেয়েকে উপেক্ষা-রূপ পদাঘাত করিবার পূর্বে অন্ততঃ একটু ইতস্ততঃ করিবে! আর বিবাহ যেন সম্পত্তি ও অলংকারের জন্য না হয়। কন্যা পণ্যদ্রব্য নহে যে, তাহার সঙ্গে মোটর গাড়ী ও তেতালা বাড়ী 'ফাউ' দিতে হইবে!" [পদ্মরাগ, রো-র, পৃ. ৪৫২-৪৫৩]

লেখিকা 'পদ্মরাগ'-এ প্রতিষ্ঠিত করেন যে, নারীকে নির্যাতিতা হয়েও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে অথবা সংসারে জীবনযাপন করতে হবে - একথা তিনি সমর্থন করেন না। তিনি মূলত পুরুষ কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতনে পারেননি। অর্থ নর নিন্দা করেছেন এবং সে রকম পরিস্থিতিতে যদি কোন নারী পুনরায় বিবাহ না করতে চায়, তাকে তিনি অসমর্থন করেননি।

খোদার নিকট জবাবদিহিতা ঃ লেখিকার লেখনিতে খোদার নিকট আত্মসমর্পণ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ বেশ কয়েকবার প্রকাশ পেয়েছে। "[পর্দার অনুরোধে?] বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যরশ্মি প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠরীতে পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে যে রক্তবর্ণ, তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা, প্রসন্নামনা যে জড় পুত্তলিকা দেখিতেছেন উহাই দুল্‌হিন্ বেগম [অর্থাৎ বেগমের পুত্রবধূ]। ইহার সর্বাঙ্গে....অলংকার। .....ঐ বধূবেগমের অবস্থা চিন্তা করিতে গিয়া আমি আমাদের সামাজিক অবস্থার এই চিত্র আঁকিতে সক্ষম হইলাম! - যে ইহাদের মন এবং মস্তিষ্ক উভয়ই চিররোগী। যাহা হউক, আমি উক্ত বধূবেগমের জন্য বড় দুঃখিত হইলাম, ভাবিলাম, 'অভাগীর ইহলোক-

www.pathagar.com

পরলোক-উভয়ই নষ্ট।' যদি ঈশ্বর হিসাব-নিকাশ লয়েন যে, "তোমার মন, মস্তিষ্ক, চক্ষু প্রভৃতির কি সদ্ব্যবহার করিয়াছ? তাহার উত্তরে বেগম কি বলিবেন? ....বলিলাম, 'তুমি যে, হস্ত পদ দ্বারা কোন পরিশ্রম কর না, এজন্য খোদার নিকট কি জওবাবদিহি [Explanation] দিবে?" [রো-র, পৃ. ২৫-২৬]

"ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা [Faculty] দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি [Develop] করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ইশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন [Observe] করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তা শক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি - তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। .....দেখিলেন, ভগিনি! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা-মাণিক দেখে! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির-অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কি উত্তর দিব?" [রো-র, পৃ. ২৬-২৭]

বিধবা বিবাহ ঃ একজন খাঁ বাহাদুর খট্‌খটে কপটাচারী ছিলেন। তিনি "নিজের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বিধবা ভগিনীর বিবাহের প্রস্তাবে এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, "আমরা যখন হিন্দুর দেশে আছি, তান তাহাদের আচার নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য। কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিধবার বিবাহ হয় না। ইত্যাদি।" [বলিগর্ত্ত, রো-র, পৃ. ৫৪২]। এখন রোকেয়ার মতামত যাচাই করা যাক। তিনি 'রানী ভিখারিনী' প্রবন্ধে বলেন, "হিন্দু স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সহিত পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা আছে। বিধবাগণ এখন সহমৃতা না হইলেও জীবন্মৃতা হইয়া থাকে। তাহাদের গাড়ী-বোঝাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, "বিধবা শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহ হইতে বিরত থাকিলেই চলিবে না। নারীর উচিত যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সর্বপ্রকার সুখাদ্য ত্যাগ করিয়া মাত্র ফল-মূল খাইয়া কোনরূপে বাঁচিয়া থাকে।" কিন্তু ইসলাম নারীকে পুনর্বিবাহের অনুমতি দিয়াছে, বিধবার প্রতি কোন অত্যাচার নাই; তাহার বসন, ভূষণ, আহার সম্বন্ধে কোন বাঁধা নিয়ম নাই। ...হিন্দুগণ প্রাণপণে বিধবা-বিবাহ প্রচলেনের চেষ্টা করিতেছেন। আর আমাদের তথাকথিত আশরাফগণ সপ্তম বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে চির-বিধবা রাখিয়া গৌরব বোধ করেন।" [রো-র, পৃ. ২৯০-২৯১]

সুদ প্রসঙ্গে ঃ বলিগর্ত্তের জমিদার খাঁ বাহাদুর কশাই-উদ্দীন খট্‌খটে সম্পর্কে বলেন, "মুসলমান ধর্মীয় শাস্ত্রে সুদ প্রদান করা এবং গ্রহণ করা উভয়ই সমান পাপ।" ভাল কথা! কিন্তু, "দরিদ্র প্রজাবৃন্দ অন্যত্র টাকা ধার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ধার করে। তিনি অতি উচ্চহারে সুদ গ্রহণ করেন; কারণ শাস্ত্রে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং ধর্ম বিনিময়ে সুদ লইতে হয়; ধর্ম কি এমন সস্তা যে, তাহা অল্প মূল্যে বিক্রয় করা যায়?" [বলিগর্ত্ত, রো-রা, পৃ. ৫৪০]

এখানে লেখিকা উক্ত বক ধার্মিক জমিদারের কর্মকাণ্ডকে ব্যঙ্গ করে এক সুদখোরের প্রতিবিম্ব অঙ্কন করেছেন। এতে সুদ সমস্যার প্রতি লেখিকার সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আশরাফ-আতরাফ ঃ ইসলাম সাম্যের ধর্ম - এখানে আশরাফ-আতরাফ, ছোট-বড়, সাদায়-কালোয় ভেদাভেদ নেই। বেগম রোকেয়াও এ ধ্রুব সত্য অনুধাবন করেছিলেন। তার 'পঁয়ত্রিশ মণ খানা' রম্যরসে সিক্ত রচনায় তিনি সমাজের আশরাফ-আতরাফগণ অমানবিক ব্যবধানকে তিক্ত ভাষায় আক্রমণ করেছেন, "কিছু দিন হইল মাসিক 'সওগাত'-এর কোন সংখ্যায় "আশরাফ-আতরাফ" শীর্ষক একটি ছবি দেখিয়াছিলাম। ছবির বিষয় এই যে, আশরাফ ঘৃণায় নাক সিটকাইয়া আতরাফকে বলিতেছেন, "তুমি দূরে থাক, আমার নিকট আসিও না।"

www.pathagar.com

আশরাফের এই ব্যবহারে বড্ড রাগ হইল - এত বড় আস্পর্ধা! মানুষকে ঘৃণা! ইচ্ছা হইল, তখনি আশরাফদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিয়া দেই।" [রো-র, পৃ. ৫৪৪]

অধঃপতিত মুসলিম দশা ঃ বেগম রোকেয়া ছিলেন অনেক অনেক ত্যাগী ও মহান সংস্কারক। তার 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলমান নিবন্ধে তিনি তৎকালীন এতদঞ্চলের মুসলিম সমাজের অধঃপতিত দশা বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

"একবার ইতিহাসের পাতা উল্টায়ে দেখুন - এমন একদিন এসেছিল, যখন বাঙ্গালী হিন্দুর আঁধার ঘরে জ্ঞানের আলো এসে উঁকি মারল, তখন তাঁরা চোখ খুললেন, ...অপর দিকে মোসলেম সমাজ কেবল 'পন্দেনামা' আর 'শাহ্নামা' পাঠ করেই তৃপ্ত থাকতে পারলেন না, তাঁরা ছুটলেন হিন্দু আর খ্রীস্টানের স্কুলে। তাঁরা কিন্তু নিজেদের জন্য স্কুল-কলেজ কিছুই করলেন না। তাঁরা খ্রীস্টানের কলেজে লেখা-পড়া শিখে দিব্যি সাহেব হয়ে গেলেন, - বলেন বিলাতি বুলিঃ চাকরকে বলেন বেহারা, আর মুটেকে বলেন কুলী।

তখন পর্যন্ত মোসলেম সমাজের তত বেশী অপকার হয় নাই; কারণ বাপ ক্লাবে গিয়ে চা খান, না চুরুট খান, ছেলে-মেয়েরা তা দেখতে পেত না, - তারা বাড়ীতে নামাজী মুসল্লী মা'কে সর্বক্ষণ দেখ্ত - সেই আদর্শে তারা খেলা করত, নামাজ নামাজ খেলা, আর পূর্ব, দক্ষিণ যে কোন দিকে মুখ করে আজানের অনুকরণে 'আল্লাহু আকবর' বলে আজান দিত।

ক্রমে শিক্ষিত বাপ মেয়েকে আর শুধু 'রাহে-নাজাত' এবং 'সোনাভান' পুঁথি পড়িয়ে ক্ষান্ত থাকতে পারলেন না, - তাই তারা মেয়েদের দিলেন Convent এবং হিন্দু স্কুলে পড়তে। Convent-এ পড়তে গিয়ে লায়লার নাম বদলে হল 'লিলা' আর জয়নব হল 'জেনী'। হিন্দু স্কুলে গিয়ে আয়শার নাম হল 'আশা' আর কুলসুম হয়ে গেল 'কুসুম'! ঐ পর্যন্ত হয়ে থাকলেও ক্ষতি ছিল না, আমাদের অধঃপতনের ঐখানেই শেষ নয়।

পরবর্তী যুগে জেনীর ছেলে-মেয়ে মানুষ করবার জন্য দরকার হল খ্রীস্টান আয়ার, যাতে ছেলে-মেয়েরা শৈশব থেকেই ইংরেজি কথা বলতে শেখে। আর তার মেয়ের নাম হল 'বারবারা আরীফ'। এখন বারবারা ঘরে তো আর মা'কে নামাজ পড়তে দেখে না; সুতরাং তার খেলার আদর্শ হল গীর্জা। আর Convent থেকে গান শিখে বাড়ীতে এসে গায় ঃ

"Jesus saves me this I know
For the Bible tells me so"

কিম্বা ঃ

"মুসলমান বেঈমান,
মারো জুতা, পাক্ড়ো কান!"

সেদিন Bengal Women's Educational Conference উপলক্ষ্যে জনৈক উচ্চশিক্ষিতা 'মুসলমান ব্রাহ্ম' মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি স্পষ্টই বললেন যে, তার শিক্ষা-দীক্ষা যেভাবে হয়েছে, তাতে তিনি কোরান, হাদীস আলোচনা করার সুযোগ পাননি। সুতরাং তিনি নিজেকে মোসলেম সমাজের উপযোগী করতে পারেননি। ....কোন ভদ্রলোক বায়না ধরেছেন যে, আই.এ.পাস পাত্রী চাই। কেউ চান অন্তত; ম্যাট্রিক পাস, তা না হলে তাঁরা খ্রীস্টান বা ব্রাহ্ম হয়ে যাবেন। এসব বিকৃত রুচির প্রধান কারণ বর্তমান ধর্মহীন শিক্ষা।

এই বিংশ শতাব্দীকালে যৎকালে অন্যান্য জাতি নিজেদের প্রাচীন প্রথাকে নানারকমে সংস্কৃত, সংশোধিত ও সুমার্জিত করে আঁকড়ে ধরে আছেন: আমাদেরই উত্তরাধিকার 'তালাক', 'খোলা' প্রভৃতি সামাজিক প্রথা নিজেদের মধ্যে সংযোগ করে, 'পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার

www.pathagar.com

বিল', 'পত্নীত্যাগ বিল', 'পতিত্যাগ বিল' ইত্যাদি নানারকমের বিল পাস করে নেবার চেষ্টা করছেন, তৎকালে আমরা নিজেদের অতি সুন্দর ধর্ম, অতি সুন্দর সামাজিক আচার-প্রথা বিসর্জন দিয়ে এক অদ্ভুত জানোয়ার সাজতে বসেছি। 'সুরেন্দ্র সলিমুল্লা স্যামুয়েল খাঁ' গোছের নাম শুনতে কেমন লাগবে?

ফল কথা, উপরোক্ত দুরবস্থার একমাত্র ওষুধ একটি আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়, যেখানে আমাদের মেয়েরা আধুনিক জগতের অন্যান্য সম্প্রদায় এবং প্রদেশের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলার মত উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেন। ...আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়ে আদর্শ মোসলেম নারী গঠিত হবে, যাদের সন্তান-সন্ততি হবে হযরত ওমর ফারুক, হযরত ফাতেমা জোহরার মতো। এর জন্য কোরান শরীফ শিক্ষার বহুল বিস্তার দরকার। কোরান শরীফ অর্থাৎ তার উর্দু এবং বাংলা অনুবাদের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক।

ছেলেবেলায় আমি মা'র মুখে শুনতুম, 'কোরান শরীফ ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে।" সে কথা অতি সত্য। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, খুব বড় আকারের সুন্দর জেলদ বাঁধা কোরান খানা আমার পিঠে ঢালের মত করে বেঁধে নিতে হবে। বরং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই বুঝি যে, কোরান শরীফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা প্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কোরান শরীফের বিধান অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।" [মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮]

নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা ঃ আমরা জানি, তিনি মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পরে একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও মুসলিম নারীদের একতাবদ্ধ করে সমাজে তাদের নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বেগম রোকেয়া স্থাপন করেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামক এক মুসলিম মহিলা সমিতি, যা তার 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের কল্পিত 'তারিণী ভবন'-এর বাস্তবরূপ। তারিণী বিদ্যালয়ে - "নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।" [রো-র, পৃ. ৩২৯] তিনি দরিদ্র পরিত্যক্তা পথের মেয়েদের কল্যাণের জন্য, পতিতাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন "নারী তীর্থ" নামক প্রতিষ্ঠান। [পথে প্রান্তরে, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩.১২.৯৮]

বাল্য বিবাহ ঃ তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত বাল্য বিবাহ, পণ প্রথা ইত্যাদি কুপ্রথার অবসানকল্পে তিনি তার লেখনী পরিচালনা করেছেন। 'সুলতানার স্বপ্ন' পুস্তিকায় বাল্যবিবাহ রহিতকরণ দাবী জানিয়ে তিনি বলেন, ২১ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না। এটা আইন হওয়া উচিত। 'সুলতানার স্বপ্ন'-এ লেখিকা সমাজসংস্কাররূপী স্বপ্নে দেখেন যে, "শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং বাল্যবিবাহ-প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না। - এই আইন হইল।" [রো-র পৃ. ১৪০]

'রানী ভিখারিনী' প্রবন্ধে বলেন, "হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকের প্রতি গৃহপালিত পশু কিংবা দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে বাধ্য। অষ্টম বর্ষে কন্যা বিবাহ দিলে তাঁহারা গৌরীদানের ফলপ্রাপ্তা হন। ইসলাম ধর্মে স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা গিয়াছে। 'মাতার পদতলে স্বর্গ' বলা হইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত সম্মতি ব্যতীত কোন নারীর বিবাহ হইতে পারে না, ইহাতে পরোক্ষভাবে বাল্যবিবাহ রহিত করা হইয়াছে। ...আর আমাদের সমাজে দেখিতে পাই, ...পাত্রী কিছুতেই 'হুঁ'

www.pathagar.com

বলিবে না, - কিন্তু অভিভাবকও নাছোড়বান্দা - তাঁহারা বলপূর্বক 'হুঁ' বলাইয়া বিবাহের শ্রাদ্ধ করেন।" [রো-র, পৃ. ২৯০-২৯১]

প্রায় একই বক্তব্য রেখেছেন তিনি তার 'God gives, man robes' নিবন্ধে। তিনি লিখেন, "Many a time a bride bitterly bewails her fate on being compelled to marry a bridegroom whom she knows to be a drunkard or an old man of sixty, but the marriage celebration proceeds despite her silent protest." [দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ, লায়লা জামান, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত, ১৯৯৪ইং]

বাল্যবিবাহ অবসানকল্পে বয়স নির্ধারণের জন্য বেগম রোকেয়ার প্রস্তাবের ভিত্তিতে কোন অভিযোগ আনা যেতে পারে না। বরং এ ব্যাপারে রোকেয়াকে অন্যতম পথিকৃৎ বলা যায়। কেননা পরবর্তীকালে প্রায় সকল ইসলামী রাষ্ট্র একই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন।

তালাক নিয়ে বাড়াবাড়ি ঃ তৎকালীন সমাজ নানা কুসংস্কারবশত এবং ইসলামের মৌল শিক্ষা ও সত্যকে না জানার কারণে খুবই নারী বিদ্বেষী ছিল এবং নারীদের অধিকারের ব্যাপারে অসচেতন ছিল। তিনি প্রচণ্ড ক্ষোভের সাথে সেসব বিবৃত করেছেন। তার 'নারীর অধিকার' লেখা [রো. র. পৃ. ৩১৪] পড়লেই তৎকালীন সমাজে নারীর প্রতি কিরূপ আচরণ হত তার স্বরূপ ধরা পড়ে। ইন্তেকালের পূর্বরাতে তিনি অসমাপ্ত লেখাটি পেপার ওয়েটের নীচে রেখে গিয়েছিলেন।

"আমাদের ধর্মমতে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় পাত্র-পাত্রীর সম্মতি দ্বারা। তাই খোদা না করুক, বিচ্ছেদ যদি আসে, তবে সেটা আসবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। কিন্তু এটা কেন হয় এক-তরফা, অর্থাৎ শুধু স্বামী দ্বারা? অন্ততঃ এইটে তো প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে দেখা যায়। আমাদের উত্তর-বঙ্গে দেখেছি, গৃহস্থ শ্রেণীর মধ্যে সর্বদা তালাক হয়, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করে। মেয়েটির কোন ত্রুটি হলেই স্বামী স্ত্রীকে দম্ভ ভরে প্রচার করে, "আমি ওকে তালাক দেব, আজই দেব।" তারপর ঘরের ভিতর বসে কতকগুলি স্ত্রীলোক ঐ ভাগ্যহীনা মেয়েটিকে নিয়ে; সামনে বারান্দায় কিম্বা উঠানে বসে স্বামী নামক জীবটাকে নিয়ে কতকগুলি পুরুষ; এইসব লোকগুলির সামনে স্বামী লোকটি তিনবার উচ্চারণ করে উচ্চস্বরে ঃ

'আয়েন তালাক বায়েন তালাক,
তালাক তালাক, তিন তালাক,
আজ জরুরে দিলাম তালাক।'

এই সময় পুরুষটিকে খুব প্রফুল্ল দেখা যায়। বোধ হয়, নূতন পত্নী লাভ হবে এই আনন্দে। কিন্তু মেয়েটি ভয়ানক কাঁদে। এরপর কোন বয়স্কা স্ত্রীলোক মেয়েটিকে ধরে তার কানের, হাতের অলঙ্কারগুলি খুলে শাড়ীর আঁচলে বেঁধে দেয়। হাতের কাঁচের চুড়িগুলি এক টুকরা ইট বা কাঠের সাহায্যে ভেঙ্গে দেয়, আর বলে, "দেন্-মোহর মাফ করে দিয়ে যা!" মেয়েটি এই সময় ভয়ানক কাঁদে। বেচারী স্বামী হারিয়ে, সাজ-সজ্জা হারিয়ে, হাতে-গড়া সাধের পাতানো সংসার হারিয়ে রিক্ততার দুঃখ নিয়েই কাঁদে।

এর পরের দৃশ্য - পুরুষটি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে কোথাও বেড়াতে যায়। আর মেয়েটির বাপ, ভাই, চাচা বা মামু যে অভিভাবকরূপে উপস্থিত থাকে [কারণ এইরূপ দু'একজনকে পূর্বেই ডেকে আনা হয়] সেই অভিভাবক স্থানীয় লোকটি তখন ঐ ক্রন্দণরতা মেয়েটিকে টেনে হিঁচড়ে পাল্কী কিম্বা গরুর গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।" ['নারীর অধিকার', রো-র পৃ. ৩১৪]

তিনি অকারণ তালাকের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব পেশ করেন। 'পদ্মরাগ'-এ তাই ধ্বনিত হয়। 'অকারণ তালাকের' বিরুদ্ধে কোন আইন নাই কি? [রো-র, পৃ. ৩৯১]

www.pathagar.com

তালাকের নামে সে সময় কি হতো তার একটি চিত্র এখানে আমরা পাচ্ছি। এ চিত্র যে সম্পূর্ণ ইসলামী বিধানের বিপরীত ও বিকৃত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একত্রে তিন তালাক দেওয়া বিদ'আত। তালাক দিয়ে খুশি হওয়া, তা প্রকাশ করা এবং 'এখনি আবার বিবাহ করবো' বলা - সবই ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থি। তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে গৃহ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এসব কারণেই বেগম রোকেয়া অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যা ছিল তার জন্য শিক্ষিতা হিসেবে একেবারে ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। উপরন্তু মুসলিম সমাজের প্রতি আমার আহ্বান, আপনারা ইসলামে নারী পুরুষের তালাক দেয়ার বিভিন্ন বিধানগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করেন এবং সমাজ থেকে অন্যায়ভাবে তালাক প্রয়োগ বন্ধ করার উদ্যোগ নিন। নারীদেরকে এ ব্যাপারে আরো বেশি অগ্রসর হতে হবে।

নারীর শিক্ষা অর্জন ঃ "Our great Prophet has said, 'Talibul Ilm Farizatu ala kulli Muslimeen-o-Muslimat.' [i.e. it is the bounden duty of all Muslim males and females to acquire knowledge]. But our brothers will not give us our proper share in education." 'God gives, man robs'. ইসলাম ধর্মে নারী শিক্ষার্জনে পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত। রোকেয়া সমাজের নিকট প্রশ্ন তোলেন, "মোসলমান - যাঁহারা স্বীয় পয়গম্বরের নামে [কিংবা ভগ্ন মসজিদের এক খণ্ড ইস্টকের অবমাননায়] প্রাণদানে প্রস্তুত হন, তাঁহারা পয়গম্বরের সত্য আদেশ পালনে বিমুখ কেন? ...কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী 'ফরজ' [অবশ্য পালনীয় কর্তব্য] বলিয়াছেন, তবু কেন তাঁহারা কন্যার শিক্ষায় উদাসীন?" [বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি, রো-র, পৃ. ২৭৯]

স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলিতেন - "আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা ভিক্ষা নয়, অনুগ্রহের দান নয় - আমাদের জন্মগত অধিকার। ইসলাম নারীকে সাতশ' বছর আগে যে অধিকার দিয়াছে তার চেয়ে আমাদের দাবী এক বিন্দুও বেশী নয়।" [রোকেয়া-জীবনী, শামসুন নাহার, পৃ. ১২১]

নারী শিক্ষায় পরিবারের পুরুষ গুরুজনদের বিরোধিতা অবলোকনে বেগম রোকেয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেন, "May we challenge such grandfathers, fathers or uncles to show the authority on which they prevent their girls from acquiring education? Can they quote from the Holy Quran or Hadis any injunction prohibiting women from obtaining knowledge?" 'God Gives, man Robs'.

তিনি চেয়েছিলেন ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতা, অধিকার। আর তাই সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্রোহী মনোভাব পরিলক্ষিত হয় তার নিম্নোক্ত বক্তব্যে, "পর্দার দোহাই দিয়ে, অনেক ভালো জিনিসে আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে, আর তা আমরা থাকবো না..... আমরা চাই আমাদের ইসলাম দত্ত স্বাধীনতা, চাই ইসলাম দত্ত অধিকার..... কে আমাদের পথ রোধ করবে? সমাজরূপী শয়তান? কখনই পারবে না।" [পর্দা বনাম প্রবঞ্চনা, সওগাত, ভাদ্র, ১৩৩৬, পৃ. ৬৯-৭১]

বেগম রোকেয়ার "স্কুলে তফসীরসহ কোরান পাঠ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, পার্শী, হোম নার্সিং, ফার্স্ট-এইড, রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি মেয়েদের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমস্তই শিক্ষা দেয়া হত।" [এম. ফাতেমা খানম, 'সপ্তর্ষি', সেলিনা চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা ৬৪ ইং]

প্রসঙ্গতঃ "বেগম রোকেয়া যে 'নারী বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'জেনানা মেডিকেল কলেজ'-এর কথা বলেছিলেন বর্তমানে অনুরূপ প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে, কিন্তু রোকেয়ার কর্মকৌশল মূল্যায়ন করা হয়নি।" [আত্মশক্তির সন্ধানে, অধ্যাপিকা হোসনেআরা কামাল, মুক্তকণ্ঠ, ১২ই ডিসেম্বর ৯৮]

কিছু বিতর্ক ১. ঃ ধর্মের অপপ্রয়োগ নারীর উপর আরোপিত হয়েছিল বার বার; আর তাই রোকেয়ার এক লেখার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ব্যক্তির অভিযোগ রয়েছে। লেখাটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ-

www.pathagar.com

"আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই; তাহার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তকচূর্ণ হইয়াছে! .....আমরা প্রথমত যাহা সহজে মানি নাই তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। ...আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ....এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুণিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুণির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীতে নিয়ম দেখিতে পাইবেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সেরূপ যোগ্যতা কই যে মুণি ঋষি হইতে পারিবেন? ...যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণী জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না?" [বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম, তাহ্‌মিনা আলম, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত, পৃ. ৪১,৪২,৪৪; নবনূর, ভাদ্র, ১৩১১, পৃ. ২১৬-২১৭]

লেখিকা তাহমিনা আলম এক্ষেত্রে লেখিকার একটি বাক্য উল্লেখ না করেই তার বইতে তুলে ধরেন [এটা অস্বাভাবিক কিছু নহে] ও তার ব্যাখ্যা দেন। আমি শুধু বাক্যটি 'রোকেয়া রচনাবলী'র 'সম্পাদকের নিবেদন [পৃ. ১১] থেকে উদ্ধৃত করছি, "...চূর্ণ হইয়াছে! অবশ্য একথা নিশ্চয় বলা যায় না, তবে অনুমানে ঐরূপ মনে হয়। আমরা প্রথমতঃ.....।"

বেগম রোকেয়ার এসব মন্তব্য থেকে কিছু ভুল বুঝাবুঝি হতেই পারে। কিন্তু যদি রোকেয়ার সামগ্রিক সাহিত্যের আলোকে এসব মন্তব্যকে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এসব হচ্ছে মূলত তার ক্ষোভের কথা। তদুপরি এখানে 'এই ধর্মগ্রন্থগুলি' বলতে সুস্পষ্টই কোরান বা হাদিসকে বুঝানো হয়নি; বরং সাধারণভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত ধর্মীয় পুস্তকাদিকে বুঝানো হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা তখনও কুরআন ও হাদীসের বাংলায় তেমন কোন অনুবাদই হয়নি। আর রোকেয়া তাই বারংবার কোরান অনুবাদ ও তার অধ্যয়নের গুরুত্ব দিয়াছেন তার লেখায় ও বক্তব্যে। এ দৃষ্টিতে তার অভিযোগকে ভুল বলা যায় না কেননা তৎকালীন অধিকাংশ পুরুষ রচিত ধর্মীয় পুস্তকাদিতে নারীর প্রতি সুবিচার করা হয়নি এবং কোরান হাদিসের সামগ্রিক নারীর প্রতি সুবিচারের নীতি পরিত্যাগ করে বিশেষ কয়েকটি পার্থক্যকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া এবং প্রচার করা হয়েছে। তেমনিভাবে দূত বলতেও এখানে রসূল [সঃ] মনে করা সংগত হবে না; বরং যেসকল পুরুষ অন্যায়ভাবে এতদঞ্চলে নারীকে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা করেছেন তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে মনে করাই সংগত। কেননা লেখিকা তার বিভিন্ন লেখায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [স.]কে বিভিন্ন প্রসংগে প্রাণভরে স্মরণ করেছেন।

কিছু বিতর্ক ২. ঃ 'ধর্মের নামে পুরুষ যে নারীর উপর প্রভুত্ব করছে এবং এই প্রভুত্ব যে নারীর সহ্য করা উচিত নয়, একথাই উচ্চারিত হয়েছে বিদ্রোহী বেগম রোকেয়ার কণ্ঠে।' [প্রাগুক্ত, তাহমিনা আলম, পৃ. ৪২]। রোকেয়া বলেন, "এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহ্য করা উচিত নহে। যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ - সতীদাহ। [পাদটীকাঃ 'একজন কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাঁহার শতাধিক পত্নী সহমৃতা হইতেন কি?'] যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন। এস্থলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান বুঝিতে হইবে।" এখানে

www.pathagar.com

উল্লেখ্য তাহমিনা আলম এই শেষ বাক্যটি তাঁর বইয়ে উল্লেখ না করে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। যাই হোক, পরের অনুচ্ছেদটি 'রোকেয়া রচনাবলী' থেকে উল্লেখ করছি, "কেহ বলিতে পারেন যে, 'তুমি সামাজিক কথা বলিতে গিয়া ধর্ম লইয়া টানাটানি কর কেন?' 'তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, 'ধর্ম' শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে; ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই 'ধর্ম' লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য ধার্মিকগণ আমায় ক্ষমা করিতে পারেন।" [নবনূর, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ২১৮]

এ লেখা থেকে অবশ্যই মনে হয় যে, তিনি তৎকালের ধর্মীয় কঠোরতা থেকে সমাজের মুক্তি দেখেছেন ধর্মীয় বন্ধন শিথিল হওয়ার মধ্যে; কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে এটি রোকেয়ার ব্যতিক্রমী মন্তব্য। তার সাধারণ বক্তব্য এর বিপরীত; সেসব বক্তব্যে তিনি মূলত ইসলামের প্রমাণিত বিধান মেনে চলতেই মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, যেটা আমরা আমাদের প্রবন্ধে দেখাতে চেয়েছি।

প্রকৃত কথা হলো, এখানে ধর্মীয় বন্ধন বলতে তিনি কোরান-হাদীসের বন্ধন বুঝাতে চাননি বরং ইঙ্গিত করেছেন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দদের নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে রচিত বাড়াবাড়িমূলক নিয়মসমূহের। মূলত ধর্মের নামে তৎকালীন সমাজে যে ধর্ম চলছিল, তার কঠোরতা দূরীকরণে শিথিলতা তো অবশ্যই কাম্য। আর পূর্বেই উল্লেখ করেছি, প্রভু একমাত্র আল্লাহ্ - কোন মানুষই অন্য কোন মানুষের দাস নয় - সবাই এক আল্লার দাস, অনুগত বান্দা এটা ইসলামের মূলতন্ত্র।

পরিশেষে উল্লেখ করতে চাই যে, 'মতিচূর' প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'স্ত্রীজাতির অবনতি' ১৩১১ ভাদ্রের 'নবনূর'-এ প্রকাশিত হয়েছিল 'আমাদের অবনতি' শিরোনামে। মূল প্রবন্ধের ২৩শ থেকে ২৭শ পর্যন্ত পাঁচটি অনুচ্ছেদ গ্রন্থে পরিবর্জিত হয়ে সে-স্থলে নূতন সাতটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে।' [রোকেয়া রচনাবলী, সম্পাদকের নিবেদন, পৃ. ১১] আর উপরের কিছুটা বিতর্কিত ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ লেখিকার অংশটুকু নিয়েই কেউ কেউ রোকেয়াকে বিরূপভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস চালান; যদিও এটা করা অনুচিত কেননা লেখা বা চিন্তা-চেতনার ধারা ক্রমেই সময়ের সাথে পরিবর্তন হতে পারে। এবং যে কোন লেখকের শেষ দিকের মতামতই চূড়ান্ত বলে ধরা হয়।

কিছু বিতর্ক ৩. ঃ 'নারী' গ্রন্থে লেখক হুমায়ুন আজাদ নারীবাদের পথিকৃৎ মেরি ওলসেটানক্র্যাফটের [১৭৫৭-১৭৯৭] সাথে রোকেয়ার তুলনা করেছেন। তার মতে, রোকেয়ার নারীমুক্তির দর্শন নারীবাদ এবং নারীমুক্তি আন্দোলনে তাঁর ভাবমূর্তি; তিনি নারীবাদী। মেরি অপেক্ষা বেগম রোকেয়া কট্টর নারীবাদী।

হুমায়ুন আজাদের এটা একটা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর মন্তব্য, কেননা আজকে নারীবাদ বলতে যা বুঝায় তার কোন কিছুই বেগম রোকেয়া সমর্থন করেননি।

পুরুষতন্ত্র ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মেরি যত না বলেছেন, তার চেয়ে বেশী খড়গহস্ত ছিলেন রোকেয়া। ['নারী', হুমায়ুন আজাদ, প্রথম প্রকাশ]। হুমায়ুন আজাদের মতে, মেরির নারীবাদই রোকেয়ার নারীমুক্তির দর্শন। অথচ লেখিকার কিছু বক্তব্যের সূত্র হিসাবে তৎকালীন সময়ে কেউ কেউ লিখেন যে, রোকেয়া মাদ্রাজের Christian Tract Society-র প্রকাশিত Indian Reform-সম্বন্ধীয় পুস্তিকাসমূহ হতে এ স্বাধীনতার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রোকেয়া তদ্যুত্তরে 'সৌরজগত'-এ লিখেন, "আমি আজি পর্যন্ত উক্ত পুস্তিকার একখানিও পাঠ করি নাই। খৃষ্টানদের নিকট কিছু শিখিতে যাইব কেন? ঈশ্বর কি আমাদের বুদ্ধি দেন নাই? আর আমি ত এই কারসিয়ঙ্গ শৈলে আছি, এই সময় তুমি আমার বাড়ী অনুসন্ধান কর গিয়া, যদি আমার বাড়ীতে 'Christian Tract Society-প্রকাশিত পুস্তিকা' একখানিও দেখিতে পাও, তবে আমি তোমাকে হাজার [১০০০,০০] টাকা দিব।" [রো-র, পৃ. ১৩০]

www.pathagar.com

এবার জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি, "বেগম রোকেয়া নারী মুক্তি আন্দোলনের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস কোন মতবাদ থেকে ধার করা নয়, নারীবাদ থেকে তো নয়ই- কোন মতবাদেই নয় অনুকরণ কিম্বা অনুসরণ।" ['নারীবাদ ও বেগম রোকেয়া', মোতাহার হোসেন সূফী, দৈনিক জণকণ্ঠ ৯ই ডিসেম্বর ৯৮]। মোতাহার হোসেন পরিশেষে প্রশ্ন তুলেন, "নারীবাদের মানবসভ্যতা বিধ্বংসী রূপ এবং নারীবাদীর কুৎসিত মূর্তি কি বেগম রোকেয়ার জন্য সম্মানজনক?" [প্রাগুক্ত]

মূলত ইসলামই নারী মুক্তি দিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত ঈমানদারীত্বের অভাবে সময়ে সময়ে বিভিন্ন স্থানে নারী মুক্তি স্বাধীনতার বিধান চাপা পড়েছিল। রোকেয়া ইসলামী দর্শন দ্বারাই নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে সেসব বিধানের পুনর্জন্মের চেষ্টা করেছেন।

হুমায়ুন আজাদের বিশ্লেষণে রোকেয়ার যে পরিচয় ফুটে উঠে তাতে "তিনি পুরুষ বিদ্বেষী, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী, ধর্মদ্রোহিনী।" [প্রাগুক্ত]। "রোকেয়া কোন বিশেষ ধর্মকে বাতিল করেননি, বাতিল করেছেন সব ধর্মকেই।" ['নারী', পৃ. ২৪৮]

আমাকে পুনরায় বলতে হচ্ছে যে, হুমায়ুন আজাদ বাড়াবাড়িতে অভ্যস্থ এবং সব সময়ই তিনি তা করেছেন। যে কেউ রোকেয়ার সামগ্রিক রচনাগুলি পড়েছেন, তিনি এ ধরনের বক্তব্য পেশ করতে পারেন না যে - 'রোকেয়া..... বাতিল করেছেন সব ধর্মকেই'; - কেবল জঘন্য মিথ্যাবাদী এবং Academically Dishonest ব্যক্তিরাই তা করতে পারেন।

রোকেয়া পুরুষবিদ্বেষী ছিলেন একথাও সত্য নয়। কেননা তিনিই তার স্বামীর স্মরণে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল' স্থাপন করেছিলেন। তিনি পুরুষদের সহযোগিতায় কাজ করেছেন এবং সবসময়ই ঐসব দরদী পুরুষদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন। দৈনিক ইত্তেফাকের গত ১৩ই ডিসেম্বরের উপসম্পাদকীয় 'পথে প্রান্তরে'-এ লিখা হয়, "বর্তমানে বাংলাদেশের নারীদের অধিকার নিয়ে অনেক এনজিও নারীবাদী সংগঠন সোচ্চার। কিন্তু তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে নারী-পুরুষদের অবস্থান চিত্রায়নে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা নারীদের পুরুষদের প্রতিপক্ষ করেছেন। ....বাংলাদেশের নারীরা যতদূর এগিয়েছে তার পেছনে সহযোগিতার হাত রয়েছে পুরুষের। ...১৯৬৪ সালের নির্বাচনে ফিল্ড মার্শাল আইউবের বিরুদ্ধে ফাতিমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করেছিল বাংলাদেশের ইসলামপন্থীসহ সকল রাজনৈতিক দল। ....বাংলাদেশে নারী আন্দোলনে নারীর ভূমিকা নির্ধারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। রাস্তাঘাটে, পত্রপত্রিকায়, চলচ্চিত্রে, টেলিভিশনের পর্দায়, বিজ্ঞাপন চিত্রে বাংলাদেশের নারীদের যেভাবে দেখা যায় বাংলাদেশের নারীরাও তা সমর্থন করে বলে মনে হয় না। নারীদের মর্যাদার আসনে দেখতে চায় সবাই। মহীয়সী বেগম রোকেয়ার আন্দোলন ছিল তার জন্যই।" [দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ই ডিসেম্বর ৯৮]

নিবন্ধটিতে আরো লেখা হয়, "বেগম রোকেয়া পুরুষদের গৃহের কাজে লাগিয়ে নারীদের পুরুষদের স্থানে বসিয়ে মজা করেছেন ঠিকই। কিন্তু বাস্তবে তিনি নারী ও পুরুষকে সহকর্মী হিসাবে পাশাপাশি দেখেছেন।" [প্রাগুক্ত]

তবে বিশেষ করে ইসলামের অপব্যাখ্যা করে যারা পুরুষবাদ স্থাপন করতে চেয়েছেন তাদেরকে তিনি বাধ্য হয়েই বিরোধিতা করেছেন। তা না করে নারীদেরকে মুক্ত করা অসম্ভব ছিল।

হুমায়ুন আজাদের এ বক্তব্যের প্রতিবাদে সূফী সাহেব লিখেন, "বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারার উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সম্ভারে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, বলা সঙ্গত ক্ষোভ

www.pathagar.com

এবং তাতে নেই ধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ। নারীমুক্তি সম্পর্কিত রচনাবলীর কোথাও তিনি অস্বীকার করেননি ধর্মকে।" [জনকণ্ঠ]

সুফী সাহেব আরো বলেন, "তিনি ধর্মের মূলমন্ত্রকে গ্রহণ করে খোলসকে বর্জন করার তাগিদ দিয়েছেন।" [প্রাগুক্ত] এখানে বলা দরকার যে, "তদানীন্তন পরাজিত, বিপর্যস্ত এবং রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে ইসলামী আদর্শবাদের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না।" [নারীশিক্ষা আন্দোলন ও বেগম রোকেয়া, অধ্যাপক মওলানা মুনীরুয্যামান ফরিদী, দৈনিক সংগ্রাম, ৬ই পৌষ, ১৩৮৭]। মওলানা ফরিদী আরো উল্লেখ করেন, "এটা ছিল মুসলিম জাতির নিষ্ক্রিয়তা ও আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতার বিষফল। নতুবা মুসলিম জাতি বিজয়ী জাতি। বিজয়ী ভূমিকায় অবস্থান করলে তার জন্য কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানই ভয়ের কারণ হতে পারে না। পৃথিবীর সব জ্ঞান-বিজ্ঞানই সে আত্মস্থ করে নিজের আদর্শের সাথে খাপ খাইয়ে বৃহত্তর কল্যাণের কাজে তাকে নিয়োজিত করতে পারে। কিন্তু পরাজিত ও পলায়ন মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বা জাতি অন্য সকল কিছুকেই ভয় করে চলতে বাধ্য। ইসলাম কোন কিছুকেই ভয় করে না।" [প্রাগুক্ত]

বেগম রোকেয়ার সাক্ষাৎ সাক্ষী, রোকেয়ার হাতে গড়া রত্ন লেখিকা শামসুন নাহার বলেন, "কিন্তু সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়া ধর্মের সত্যকার শিক্ষার দিকে বারে বারে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইসলামের নির্দেশকে কোরানের পাতায় আবদ্ধ না রাখিয়া বাস্তব জীবনে কাজে লাগাইবার জন্য তিনি পাগল হইয়াছিলেন।" [রোকেয়া-জীবনী, শামসুন নাহার, পৃ. ১২১-১২২]

রোকেয়া পুরুষবিদ্বেষী ছিলেন না। অধ্যাপিকা হোসনে আরা কামাল লিখেন, "বেগম রোকেয়া যুক্তিবাদী ছিলেন, তিনি পুরুষদের বিরুদ্ধে নারীকে উত্তেজিত করতে চাননি। 'পত্নি বিদ্রোহের আয়োজন করা তার লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল নারীকে সুশিক্ষিত করা ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা।" [আত্মশক্তির সন্ধানে, অধ্যাপিকা হোসনে আরা কামাল, মুক্তকণ্ঠ, ১২ই ডিসেম্বর ৯৮] মিসেস কামাল আরো বলেন, "বিশেষত মাতৃক্রোড়েই পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রথম পাঠ নিতে হয়, তাই রোকেয়ার মতে নারী কখনও পুরুষবিদ্বেষী নয়। রোকেয়া ধর্মবিদ্বেষীও ছিলেন না, তবে তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে।" [প্রাগুক্ত]

উপসংহার ঃ ইসলামের প্রতি বেগম রোকেয়ার অনুরাগ এবং আল্লাহর উপর তাঁর দৃঢ় আস্থা প্রমাণের জন্যেই বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর ইসলাম সম্পর্কিত প্রসঙ্গসমূহকে হাইলাইট করা হয়েছে। তিনিই তৎকালীন বঙ্গদেশের মুসলিম সমাজের বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের পথিকৃৎ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক হাবিবুল্লাহ বাহারের ভাষায়, "She [Begum Rokeya] was a shahid in the battle of emancipation - emancipation of women, emancipation of ideas, emancipation of intellect." [The Mussalman, Dec. 11,1932, p.9]

লেখিকা তার 'অবরোধবাসিনী' পুস্তকের নিবেদনে লিখেছিলেন যে, "হযরত রাবিয়া বসরী বলিয়াছেন, 'ইয়া আল্লাহ্! যদি আমি দোজখের ভয়ে এবাদত করি, তবে আমাকে দোজখে নিক্ষেপ কর; আর যদি বেহেশতের আশায় এবাদত করি তবে আমার জন্য বেহেশত হারাম হউক।' আল্লাহ্‌র ফজলে সমাজসেবা সম্বন্ধে আমিও এখন ঐরূপ বলিতে সাহস করি।" [রো-র পৃ. ৪৭১]

www.pathagar.com

সামগ্রিক বিবেচনায় বেগম রোকেয়া ছিলেন সত্যিকার মুসলমান - আদর্শ দায়ী ইলাল্লাহ্। এ মহিয়সী রমণীকে নিয়ে যাঁরা ভবিষ্যতে গবেষণার ইচ্ছা রাখেন তাদের প্রতি আরজ, তাঁরা যেন অনুগ্রহপূর্বক লেখিকার সকল সাহিত্য জীবনাচার, বক্তব্যমালা, প্রশাসনিক পর্যায়ের বিভিন্ন ভূমিকা প্রভৃতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করে নিরপেক্ষভাবে মন্তব্য করেন। লেখিকার দু'একটি উক্তিকে ভিত্তি করে ইসলামের বিরুদ্ধে তাকে দাঁড় করানো সম্পূর্ণ অনুচিত হবে; কেননা তৎকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রচণ্ড ক্ষোভ, গোস্বা ভরে এজাতীয় কিছু মন্তব্য করেছেন। এসব মন্তব্যকে মহাকবি ইকবালের 'শেকোয়াহ্'-র মন্তব্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। লেখিকা একস্থানে এরূপ এক উক্তি করিয়াছেন; 'আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি; উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনে ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইয়াছি।" [রো-র, পৃ. ৪৭১]

'বেগম রোকেয়া ও ইসলাম' বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা হওয়া উচিৎ। তৎকালীন সমাজকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তার সাহিত্যকর্ম গবেষণা করলে অনেক তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য ফুটে উঠবে; আর এসবের ভিত্তিতে আজকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গোঁড়ামীপূর্ণ সমাজের অন্ধকার দূর করতে ব্যাপক সহায়তা করবে।

পরিশেষে, কবি গোলাম মোস্তফার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বাংলাদেশ তথা বিশ্ববাসী শ্রদ্ধাভরে আজীবন এ মহিয়সী নারীকে স্মরণ করবে। কবি স্মরণে–

"তুমি যেন কোন গগণ-পারের স্বপন দেশের মেয়ে
এসেছিল নেমে ঈদের চাঁদের রজত-তরুণী বেয়ে'!
ফিরদৌস্ হতে নিয়ে এসেছিলে নূরের দীপ্ত শিখা,
সেই নূর দিয়ে দূর করে গেলে মৃত্যুর মরীচিকা
মানবীর রূপে তুমি আল্লার মূর্ত আশীর্বাদ;
তুমি না আসিলে ঘুচিত কি এই জড়তা ও অবসাদ?

* * *

তাপসী 'রাবেয়া', তারও চেয়ে তুমি সাধনায় যে গো দড়,
ধর্মের চেয়ে জ্ঞানের সাধনা অজস্র গুণ বড়।
তুমি আমাদের নূতন 'খোদেজা'- সর্বপ্রথমা নারী,
আলোর অমিয় পান করিল যে বলিয়া হৃদয়-ঝারি!
আজিকে মোদের নব-প্রগতির জয়-যাত্রার ভালে
পরাইয়া দিলে তুমি রাজটিকা রহিয়া অন্তরালে!
নারীর পরশে পেয়েছিল প্রাণ ইসলাম দুনিয়ার,-
মোরাও লভিব নব প্রাণ তব স্পর্শের মহিমায়।"

[দুঃসাহসিকা', গোলাম মোস্তফা, মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ, ১৩৩৯; রোকেয়া রচনাবলী, পৃষ্ঠা- ৬০৯]

www.pathagar.com

প্রমাণপঞ্জীঃ

১. রোকেয়া-রচনাবলী; আবদুল কাদির সম্পাদিত; বাংলা একাডেমী; দ্বিতীয় মুদ্রণ; জুন, ১৯৮৪
২. বেগম রোকেয়া, সাখাওয়াত হোসেন - চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম; তাহ্‌মিনা আলম; বাংলা একাডেমী; প্রথম প্রকাশ; জুন, ১৯৯২
৩. রোকেয়া-জীবনী; শামসুন নাহার; বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৪৭, শান্তিনগর, ঢাকা; এপ্রিল, ১৯৮৭
৪. মুসলিম নারীর সংগ্রাম; ড. কাওকাব সিদ্দিক; অসডার, ২৪, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত; মার্চ, ১৯৯২
৫. নারীর সমস্যা ও ইসলাম; শাহ্ আবদুল হান্নান; ৪৩৫, বড় মগবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত; সফর, ১৪১৭ হিজরী।
৬. দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ; লায়লা জামান সম্পাদিত; বাংলা একাডেমী; ডিসেম্বর, ১৯৯৪
৭. দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮
৮. দৈনিক সংগ্রাম, ৬ই পৌষ, ১৩৮৭
৯. দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৯৮
১০. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮

[উৎস: "দি উইটনেস" রোকেয়া সন্ধানে সংখ্যা, প্রকাশকাল ১৯৯৯- থেকে সংকলিত।]

: Compare Products:
(1) Auto Transformer, (For voltage stabilizer)
(2) Inverter Transformer, (For U.P.S./I.P.S)
(3) Baugh-Boost Transformer, (For Industrial stabilizer)
(4) Step-Down Transformer.
(5) Step-Up Transformer.
(6) এ ছাড়াও সকল ধরনের Auto/Isolalion Transformer তৈরি করা হয়।
(7) Automatic Voltage Stabilizer.
(8) Uninterruptible Power Supply (U.P.S)
(9) Emergency Power Supply (I.P.S)
(10) Industrial Voltage Stabilizer (10 KVA to 250 KVA)
Compare Electronics & Technology
916, Ibrahimpur, Dhaka Cantonment, Dhaka-1206
Mobile : 019387058; 019358102

www.pathagar.com

একজন শ্রেষ্ঠ নারী বেগম রোকেয়া

শাহ আবদুল হান্নান

বেগম রোকেয়া একজন চিন্তাবিদ। সেই সাথে সত্যিকার অর্থেই একজন ইসলামী চিন্তাবিদও ছিলেন। যিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও ব্যাখ্যা করেন তিনিই ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি বা ভুল দূর করেন। কাজেই এসব অর্থেই বেগম রোকেয়াকে ইসলামী চিন্তাবিদ বলতে হবে। অবরোধ, নারী স্বাধীনতা, পর্দার প্রশ্নে, অশ্লীলতা, যৌতুক প্রথা, বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ, তালাক নিয়ে ভ্রান্তি ও বাড়াবাড়িসহ বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ইসলামের সঠিক অবস্থান তুলে ধরেছেন।

রোকেয়াকে নিয়ে যারা বিতর্ক সৃষ্টি করতে চান, তারা তার সামগ্রিক লেখনি ও জীবনের শিক্ষা বাদ দিয়ে খণ্ডিত কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। এসব বিতর্ক ইতোমধ্যেই নানাভাবে অত্যন্ত সার্থকতার সাথেই খণ্ডন করা হয়েছে। বেগম রোকেয়ার একটি উদ্ধৃতি দেয়া হয় যাতে তিনি বলেছেন, "আমরা প্রথমত যাহা মানি নাই তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। .....আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগুলোকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।" এখানে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে। কিন্তু যদি রোকেয়ার সামগ্রিক সাহিত্যের আলোকে এ মন্তব্য ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে এসব হচ্ছে মূলত তার ক্ষোভের কথা। এখানে ধর্মগ্রন্থ বলতে কোনোভাবেই কোরআন বা হাদীসকে বোঝানো হয়নি। বরং সে সময় ধর্মগ্রন্থের নামে কিছু অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির বই প্রচলিত ছিল যাতে নারী অধিকারের বিপক্ষে বলা হতো। কোরআনে সামগ্রিকভাবে নারী পুরুষের সাম্যের কথা বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, "যদি ঈশ্বর কোনো দূত রমণী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণী জাতিকে নরের অধীনে থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর?" তার এ কথায় দূত বলতে রাসূল [সা.] কে মনে করা সঙ্গত হবে না। বরং যে সকল পুরুষ অন্যায়ভাবে এ অঞ্চলে নারীকে

www.pathagar.com

দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা রোকেয়া তার বিভিন্ন লেখায় হযরত মোহাম্মদ [সা.] কে বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রাণভরে স্মরণ করেছেন। তারচেয়েও বড় কথা যে 'মতিচুর' প্রথমখণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'স্ত্রী জাতির অবনতি' ১৩১১ ভাদ্রের 'নবনূর' এ প্রকাশিত হয়েছিল 'আমাদের অবনতি' শিরোনামে। এতে মূল প্রবন্ধের ২৩শ থেকে ২৭শ পর্যন্ত পাঁচটি পরিচ্ছদ পরিবর্জিত হয়ে নতুন সাতটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছিল যাতে আর কোনো ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ ছিল না। অথচ আজও রোকেয়ার এই দু'একটি উদ্ধৃতিকে অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে।' [দ্রষ্টব্য : বেগম রোকেয়া ও ইসলাম, এ. এ. রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দি উইটনেস প্রকাশিত 'রোকেয়া সন্ধানে' হতে]।

১৩৩৮ সালের মাসিক মোহাম্মদীতে মুসলমানদের নামের বিকৃতির বিষয়ে কঠোরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মুসলমানদের নাম আরবী ভাষায় হবে এটাই ট্রাডিশন। এটা তাকে সঠিক পরিচয় দেয়। রোকেয়া এর উপর দৃঢ় থাকতে বলেছিলেন। অথচ আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে এ থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা চলছে। এখন আমাদের নামের বিকৃতি থেকে সরে আসতে হবে।

তিনি ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে স্পষ্টভাবে বলেছেন, "ছেলেবেলায় আমি মার মুখে শুনতুম, 'কোরআন শরীফ ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে' সে কথা অতি সত্যি। কোরআন শরীফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কোরআন শরীফের বিধান অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।"

এত স্পষ্ট বক্তব্যের পরও কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর মতে রোকেয়া কোনো বিশেষ ধর্মকে বাতিল করেননি, বাতিল করেছেন সর্ব ধর্মকেই –বস্তুত এ ধরনের মন্তব্য চরম মিথ্যাচার ও একাডেমিক ডিজঅনেস্টি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এরাই বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী সেজে বসে আছে। বেগম রোকেয়া একজন উঁচুমানের সমাজ সংস্কারক ছিলেন। উপমহাদেশের গত হাজার বছরের ইতিহাসে তার মতো এত বড় সমাজ সংস্কারক খুব কম ছিলেন। শুধু উপমহাদেশে নয় সমগ্র বিশ্বের কয়েকজন সেরা সমাজ সংস্কারকের নাম বললে তার নাম বলতে হয়। এটা আমাদের এবং আমাদের সরকারের দায়িত্ব যে এত বড় প্রতিভাকে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত করা।

কোরআনে বলা হয়েছে, সকল মানুষের রূহ একই সঙ্গে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন [সূরা আরাফ : ১৭২ আয়াত]।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, তিনি মানব ও মানবী উভয়কে সর্বোত্তম কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন [সূরা তীন]। এরপরও যারা বলেন যে, নারী পুরুষের চাইতে দুর্বল বা নারীর হৃৎপিণ্ড ছোট কিংবা মগজ ছোট –তারা কোরআনের বিপরীত কথা বলেন। সূরা নিসার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, সকল মানব মানবী হযরত আদম [আ.] থেকে সৃষ্ট। অতএব আমাদের মধ্যে অকারণ বিভাজন কেন?

যারা প্রকৃতই রোকেয়ার চিন্তা-চেতনাকে তুলে ধরতে চান তাদের দায়িত্ব হচ্ছে বেগম রোকেয়া'র অপব্যবহার রোধ করা। বেগম রোকেয়াকে যারা ইসলাম বিরোধীদের দলভুক্ত বলে প্রচারণা চালান তাদের শৃঙ্খল থেকে রোকেয়াকে মুক্ত করে সঠিকভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদেরই।

নারী স্বাধীনতা রাসূলের [সা.] সময় থেকেই শুরু হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আবদুল হালিম আবু শুক্কাহ-এর গবেষণার ফসল ছয় খণ্ডের বিশাল গ্রন্থ 'রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' থেকে এ প্রমাণ পাওয়া যায়, নারী স্বাধীনতা রাসূল [সা.] থেকে শুরু। তবে দুঃখের বিষয় মুসলমানরা রাসূল [সা.]-এর শিক্ষাকে ধারণ করতে পারেনি। রাসূল [সা.] যে দৃষ্টিতে মেয়েদের দেখতেন সে দৃষ্টিতে আমরা দেখি না। প্রাথমিক ইসলামী পৃথিবী ছিল তেমনই এক পৃথিবী সেখানে পুরুষ ও নারী ছিল একে অপরের বন্ধু ও অভিভাবক। তারা একসাথে নামাজ পড়তেন, সামাজিক কাজ করতেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতেন–এমনকি যুদ্ধেও অংশ নিতেন।

বেগম রোকেয়াও সেরকম এক পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজে বিশ্বাস করতেন। তারপরও তাকে ইসলাম বিরোধী হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়। তার ব্যাপারে সমাজে বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। বলা হয় যে তিনি ধর্ম ও পর্দার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন– এটি একেবারেই একটি ভুল ধারণা।

বিশ্বের অন্যান্য স্থানের ন্যায় আমাদের উপমহাদেশের নারীরা বহুকাল যাবৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত ও নির্যাতিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপারে সংকীর্ণতা আমাদের সমাজের বৈশিষ্ট্য। যার প্রধান কারণ হলো কুসংস্কার ও বাড়াবাড়ি। এসবের বিরুদ্ধে যে কণ্ঠটি সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে তাহলো বেগম রোকেয়া। তারই প্রচেষ্টায় একশ' বছর পূর্বের তুলনায় বর্তমানে নারীর অবস্থা কিছুটা উন্নতি লাভ করেছে বলে মনে হয়। বেগম রোকেয়া যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্ধত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে সে বিবেচনায় তার বলিষ্ঠ ও সাহসিকতা আমাদেরকে অভিভূত করে। সে সমাজে এমন বিপ্লবী কথা উচ্চারণ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু বেগম রোকেয়া নির্ভীক চিত্তে তার বক্তৃতায়, লেখায় ও কাজে নারী মুক্তির কথা ব্যক্ত করেছেন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের কথা বলেছেন।

সেসব দিক থেকে বেগম রোকেয়া যে কোনো বিবেচনায় এ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন নারীর একজন।

Better Jechnology Quality Service

Attractive price for all kinds of accessories

TC TECH COMPUTER

আপনার কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং মনিটরের সমস্যার সমাধান আমাদের উপর ছেড়ে দিন

Head Office

75 Green Road, 7th Floor, Farmgate, Dhaka-1215
Phone : 9122277, 327504
Fax : 880-02-816624

www.pathagar.com

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম মহিলা ঃ বেগম রোকেয়া

চেমন আরা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে কয়জন মুসলিম মহিলা শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন বেগম রোকেয়া ছিলেন তাঁদের পুরোধা।

১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক অভিজাত পরিবারে বেগম রোকেয়ার জন্ম হয়। মৃত্যু হয় ১৯৩২ খৃঃ। এই সময়টা ছিল ভারতীয় মুসলমানদের সম্মুখে ঘোর অমানিশার অন্ধকার। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সব দিক দিয়ে বিপন্ন; বিপর্যস্ত হীনবল হয়ে পড়েছিল। বাংলা তথা ভারতীয় মুসলিম সমাজ কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। যুগের এই দুঃসময়ে কাণ্ডারী হয়ে আলোর মশাল হাতে নিয়ে ঘুমন্ত জাতিকে জাগাতে এগিয়ে এলেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কন্যা জ্ঞান-তাপসী, জ্যোতির্ময় বেগম রোকেয়া। সমাজের এই দুঃসময়ে দেশ-জাতি তথা সমাজকে সংস্কার ও পরিশুদ্ধ করার মহান ব্রত নিয়ে এই সাহসিকা নারী কলম ও ঈমানকে হাতিয়ার করে সর্বপ্রকার অসুন্দর, অশুভ, অন্ধত্ব ও গোড়ামীর মূল উৎপাটন করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন।

যে জাতি একদিন বীরদর্পে পৃথিবী শাসন করেছে সেই জাতির এই অধঃপতন এই মহিয়সী নারীর মর্মমূলে কঠিন আঘাত হেনেছিল। আবেগে, দুঃখে ব্যথিত হৃদয়ে তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর সাহায্যে এই সময় এই জাতির ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে রূঢ় ভাষায় অনেক বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।

এই বক্তব্যগুলির অপব্যাখ্যা করে– আজকের প্রগতিবাদী সম্প্রদায়– ইসলামী চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ জ্ঞান-তাপসী শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালী মুসলিম মহিলার বক্তব্যগুলির অবমূল্যায়ন করে বেড়াচ্ছেন।

তাঁর রচনার কোন বক্তব্য, কোন আক্রমণ ধর্মের বিরুদ্ধে বা ধর্মীয় বিধানের বিরুদ্ধে ছিল না। বরঞ্চ ইসলামকে কলুষমুক্ত করার জন্য তিনি কলমকে তলোয়ার করে জিহাদে নেমেছিলেন।

তিনি তার প্রায় সব লেখার মাধ্যমে– সমাজের নারী-পুরুষ সবাইকে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াস চালিয়েছেন এবং দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন।

www.pathagar.com

একটু মনোযোগ দিয়ে বেগম রোকেয়ার রচনাবলীকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি– তাহলে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে– তিনি ছিলেন একজন আল্লাহ ভক্ত, রসূল প্রেমিক খাঁটি ঈমানদার মুসলিম মহিলা। তিনি তার বিভিন্ন রচনাতে নানানভাবে আল্লাহর প্রতি তার অকুণ্ঠ বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তার স্কুলের ১৮ বৎসর পূর্তিতে তিনি সূরা ফাতেহার আয়াত– 'আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য চাই।' উদ্ধৃত করে বলেন আমি জীবনের পরতে পরতে এই সত্য উপলব্ধি করেছি।

তাঁর কোন কোন রচনায়, ইনশাল্লাহ, ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন, সোবহান আল্লাহ, শুকর আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে– ইসলামী জীবনাচারের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলাম প্রদত্ত নারীর উত্তরাধিকার প্রশ্নে সমাজ মোড়লদের অবহেলা ও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি বার বার নারী মুক্তির দিশারী মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ [স.] কে স্মরণ করেছেন। পবিত্র কোরানের এবং সুন্নাহর সত্যিকার প্রয়োগ ও বিধানের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল।

বেগম রোকেয়ার রচনাবলী থেকে কিছু উদাহরণ দিলে তার প্রমাণ মিলবে– 'আমাদের জন্য এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সচরাচর এইরূপ– প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা অতঃপর কোরান-শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না। কেবল স্মরণ শক্তির সাহায্যে টিয়া পাখির মতো আবৃত্তি কর। মতিচূর, রোজী বেগম রোকেয়ার ছাত্রী ও ঘনিষ্ঠজনের একজন সু-সাহিত্যিকা সামসুন নাহার বলেন– বেগম রোকেয়া সব সময় বলতেন– আমাদের শুধু শৈশব থেকে কোরান পাঠ শিখানো হয়। মুখস্থ করানো হয়। কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জনই তার একবর্ণ বুঝে না। নার্স নেলী-গল্পেও দেখা যায়, যখন জানা গেল পাদরীদের দ্বারা ধর্মান্তরিত নেলী কোরান পড়তে পারে– তখন বেগম রোকেয়ার অনুভূতিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে– তিনি বলেন– "নেলী কোরান শরীফ পাঠ করতে পারে শুনিয়া আমার মনে আরও কেমন খটকা লাগিল। না জানি সে কোন মুসলিম কুলে কালী দিয়া পতিত হইয়াছে। হায়! কোরান শরীফের এই অবমাননা!

খৃস্টান নেলী, মেথরানী নেলী যে হস্তে ঘৃণিত রক্ত পুঁজ পরিপূর্ণ বালতি পরিষ্কার করে, সেই হস্তে কোরান শরীফ স্পর্শ করে।"

তিনি বিশ্বাস করতেন মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সংগে কোরান শিক্ষাদান সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরানের অনুবাদ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। কোরান শুধু পাঠ করা ও মুখস্থ করার বিষয় নয়– কোরানের অর্থকেও হৃদয়ঙ্গম করা জরুরী মনে করতেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পবিত্র কোরান মহামূল্যবান গ্রন্থ। কোরান শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে আইন প্রণয়নেরও পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। কোরান বুঝে পড়ার দৈন্য দশা শুধু মেয়েদের মধ্যে নয়– পুরুষদের মধ্যেও তিনি লক্ষ্য করেছেন। তিনি অত্যন্ত জোরালো ভাষায়, লেখনীর সাহায্যে বলে গেছেন ধর্ম ও সমাজকে অক্ষুণ্ন রাখতে ইসলামের মর্মবাণীকে সত্যিকার অর্থে আপামর জনসাধারণের চেতনায় সঞ্চারিত করার জন্য– কোরান শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতিও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তার বড়বোন করিমুন্নেসা ৬৭ বৎসর বয়সে আরবী শিখেছিলেন।

আগেই বলেছি তিনি ইসলামের উত্তরাধিকার আইনকে স্বীকৃতি দিয়ে– সমাজব্যবস্থাকে দোষারোপ করেছেন। মোহরানার ক্ষেত্রেও ইসলামী বিধানকে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

তার অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধে– নারী-পুরুষের মমতার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কোরানে নারী ও পুরুষ উভয়কে একে অপরের ভূষণ বলা হয়েছে। বেগম রোকেয়ার 'অর্ধাঙ্গী', 'সুগৃহিনী', প্রভৃতি প্রবন্ধে

www.pathagar.com

ইসলামের এই সুরেরই প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। সোজাকথায় বেগম রোকেয়া ইসলামী সমাজব্যবস্থায় সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাবে– নারীর মর্যাদাকে যেভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়, ঘরে-বাইরে যেভাবে নারী লাঞ্ছনার শিকার হয়– তারই প্রতিবাদে লেখনীকে হাতিয়ার করে সমাজব্যবস্থার মূল কাঠামোকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছেন।

ইসলামের জীবন-বিধানকে তিনি কোথাও হেয় করেননি। কিন্তু যেখানে অনাচার দেখেছেন, অবিচার দেখেছেন– সেখানেই তিনি শক্ত হাতে কলম তুলে ধরেছেন, সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে ভুল শোধরানোর চেষ্টা করেছেন।

নারীর কর্মক্ষেত্র শুধু রান্না-বান্না, সন্তান পালন ও সেলাই কর্মে– এই কথা ইসলাম বলে না। সূরা আল ইমরানের ১৯১-১৯৫, আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হিযরত ও জেহাদসহ সামগ্রিক ইসলামী সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণের কথা বলেছেন।

ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তা দান দ্বারা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব নয়– এটা পুরুষের দায়িত্ব।

একে কোরানের অসংখ্য আয়াতে নারী ও পুরুষের Gender equityর কথা আমরা বেমালুম ভুলে যাই।

স্বামী-স্ত্রীর সমঅস্তিত্বের প্রসঙ্গে সৌরজগত উপন্যাসে সচেতন পুরুষ গওহরের জবানীতে সমাজকে জানাতে চেয়েছেন– নারীদের ছাড়া পুরুষদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কই এবং পুরুষদের ছাড়া নারীদেরও নিরপেক্ষ অস্তিত্ব কই।

নারী ও পুরুষের কর্মের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রভু বলে কেউ নাই। যার যার শক্তি দিয়ে তার নিজ নিজ দায়িত্ব করে যাবেন।

'অবরোধবাসিনী' নামক কয়েকটি প্রবন্ধে নারীর অবরোধ প্রথার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে– তার উচ্ছেদ কামনা করেছেন। কিন্তু শালীনতা, সুরুচি পর্দা বিসর্জন দিক– এটা তিনি কোথাও বলেননি। অতি আধুনিক চলাফেরার বেহায়াপনা তাঁর কাছে কিরূপ শ্লেষের ছিল– 'উন্নতির পথে' শীর্ষক রম্য রচনাটিতে তার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে।

নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শতবার খসে খসে পড়ে।

তিনি অশালীনতা, উচ্ছৃংখলতা, নগ্নতা, স্বল্প পোশাকের কতটুকু বিরোধী ছিলেন– তা তার লেখা দেখে আমরা বুঝতে পারি। 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে দুঃখ করে বলেছেন– কুমারের মস্তকে শিরস্ত্রাণ সাজাইতে যতখানি যত্ন ব্যয় করা হয়– কুমারীর মাথা ঢাকিবার ওড়না খানা প্রস্তুতের নিমিত্তও ততখানি যত্ন ব্যয় করা হউক।

বোরকা প্রবন্ধে বলেন– 'ইংরাজী আদব-কায়দাও [etiquette] আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, ভদ্রমহিলাগণ আড়ম্বর রহিত পোশাক ব্যবহার করিবেন– বিশেষজ্ঞ পদব্রজে ভ্রমণকালে চাকচিক্যময় বা জাঁক-জমকপূর্ণ কিছু ব্যবহার করা তাহাদের উচিত নহে। ঐ উপদেশ আমরা পবিত্র কোরান শরীফের সূরা নূরের একটি আয়াতের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'বিশ্বাসী স্ত্রীগণকে বল– তাহারা যেন দৃষ্টি সতত নীচের দিকে রাখে। এবং তাহারা যেন আবরণ [বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত] অন্য লোককে না দেখায়। বোরকা সম্বন্ধে বেগম রোকেয়ার অভিমত ছিল নিম্নরূপ– 'রেলওয়ে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে তাহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়। সুতরাং রেলওয়ে ভ্রমণকালে সাধারণের দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘোমটা কিংবা বোরকার দরকার হয়।'

www.pathagar.com

পদ্মরাগ উপন্যাসে বলেন– শরীয়ত আমাদের পর্দায় [বস্ত্রাবৃত] থাকিতে বলে– অবরোধ বন্দিনী থাকিতে কখনও বলে না।

লেখিকার জীবনের অনেক বাস্তব ঘটনা ও ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে অবরোধবাসিনী রচিত হয়।

অবরোধ মানে কি দুঃসহ নরক যন্ত্রণা মেয়েদের ভোগ করতে হয়– তারই বিবরণ তিনি অত্যন্ত সকরুণ সহানুভূতি ও ব্যথা ব্যাকুলকণ্ঠে সমাজকে জানাতে চেষ্টা করেছেন। এবং ইসলামের নির্দেশিত পথে এই দুঃসময় নরক যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় বাৎলে দিয়েছেন।

তিনি বলেন– সভ্যতার সহিত অবরোধ প্রথার কোন বিরোধ নাই। তবে সবকিছুর একটা সীমা আছে। মোড়লদের ইসলাম সম্বন্ধে অতিরিক্ত মোড়লীপনায় এদেশে অবরোধটা বড় বেশী কঠোর হয়ে পড়েছে।

প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আমরা নিস্তেজ, সংকীর্ণমনা ভীরু হয়ে পড়েছি– অবরোধের জন্য নয়।

মিসেস এনি বেশান্তের ইসলাম শীর্ষক বক্তৃতাটিও তিনি 'নূর ইসলাম' নামে তাঁর সাহিত্য কর্মে সংযোজন করেছেন। এই প্রবন্ধে মহানবী [স.]-এর অনুপম চরিত্র, মহত্তম ব্যক্তিত্ব ও সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

বেগম রোকেয়া তার জীবনে, কর্মে, সাহিত্যে– সর্বত্রই ইসলামকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রত্যেক দেশের জাতীয় উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নৈতিক উন্নতির মূল চালিকা শক্তি ধর্ম।

দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের প্রতি লেখিকার পরামর্শ– অদ্য যদি আমার মুসলমান ভ্রাতৃগণ নিজেদের ঐ সকল জগন্মান্য পূর্ব-পুরুষদের রচিত শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তকাবলী আধুনিক প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া লয়েন এবং সর্ব সাধারণ্যে ঐ শিক্ষা প্রচার করেন– তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহারা ইসলামী দর্শনকে সমস্ত জগতের-শীর্ষস্থানে তুলিতে সক্ষম হইবেন। [নূর ইসলাম, রো-র- পৃ. ১০৪]

নামাজ, রোজা, হজ্ব, তালাক, মোহরানা সম্বন্ধে তার সুচিন্তিত মতামত, ইসলাম ধর্মের প্রতি তার সুগভীর জ্ঞান ও প্রচণ্ড ভালোবাসার উৎসারণ।

পীর প্রথা সম্পর্কে "পয়ত্রিশ মন খানা" রম্য রচনায় তিনি পীর System-এর তৎকালীন অবস্থার এক রূপক চিত্র তুলে ধরেছেন।

নারীর ভোটাধিকার, বাল্যবিবাহ, তালাক নিয়ে বাড়াবাড়ি সবক্ষেত্রে তিনি সমাজের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে দায়ী করেছেন– সেই প্রসংগে ইসলামী দর্শন কি বলে তার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন– আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা ভিক্ষা নয়– অনুগ্রহের দান নয়, আমাদের জন্মগত অধিকার। ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে তার চেয়ে আমাদের দাবী একবিন্দুও বেশী নয়।

বেগম রোকেয়া ছিলেন ত্যাগী ও এক মহান সংস্কারক– তাকে এই অর্থে মোজাহেদীন বললে অত্যুক্তি হয় না। ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলমান নিবন্ধে তিনি তৎকালীন মুসলমান সমাজের অধঃপতনের করুণ দশার বর্ণনা করেছেন।

গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম বাঙালী কন্যা, জ্ঞান তাপসী, মহিয়সী বেগম রোকেয়া সম্বন্ধে অনেক বিষয় আমাদের জানার আছে। সুদীর্ঘ বিস্ফোরণের অপারগতায়– অল্প কথায় বলতে চাই– বেগম রোকেয়ার মানসিকতা ও তৎকালীন সমাজ পরিবেশ সম্বন্ধে জানতে হলে গভীর অনুসন্ধিৎসা ও

www.pathagar.com

ইসলাম সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তথাকথিত প্রগতিবাদীরা বেগম রোকেয়াকে 'নারীবাদী' আখ্যা দিয়ে তাদের মনোবলের পরিচয় দেন। আসলে তিনি কোন অবস্থাতেই নারীবাদী ছিলেন না।

তিনি নারীকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী– মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ইসলামী অনুশাসনের যথাযোগ্য প্রয়োগের মাধ্যমে সকল কর্মকাণ্ডে অংশীদার করার চেষ্টা করেছেন।

পুরুষদের প্রতিও তার শ্রদ্ধাবোধের অভাব ছিল না। তিনি তাঁর মরহুম স্বামীর স্মরণে স্বামীর জমাকৃত অর্থে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেছিলেন। তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অনেক জ্ঞানী-গুণী দেশবরেণ্য পুরুষদের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছেন। এবং সব সময় এই সব উদারমনা পুরুষদের কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করেছেন। তখনকার প্রখ্যাত কবি ও সমাজ সেবিকা সরোজিনী নাইডু, লেডী চেমস ফোর্ড, লেডী কারমাইকেল সবাই বেগম রোকেয়ার কর্ম, উদ্দীপনা ও সাহিত্য সেবার প্রশংসা করেছেন।

তার নিজ ধর্মে অচলা ভক্তি ছিল। অপর ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একজন পরহেজ মহিলা। কথা ও কাজে আচার-আচরণে, লেবাসে-লেহাজে, পরিচ্ছদে, শিষ্টাচারে, দৈহিক আচরণে, আবরণে এক কথায় তাঁর ব্যবহারিক জীবনে আদর্শ মুসলিম নারীর সমস্ত গুণই প্রতিফলিত হয়েছে। তার মৃত্যু হয়েছিল ফজরের নামাজের সময়ে নামাজ পড়ার জন্য অজু করার মুহূর্তে। প্রকৃত মোমীন মুসলমানের সমস্ত চিহ্ন নিয়ে তিনি চলে গেলেন– পরপারে– জান্নাতে। ইন্না লিল্লাহে– ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

বাংলাদেশে নারী আন্দোলন এখন বেশ জোরদার। কিন্তু এই আন্দোলনের আসল লক্ষ্যবস্তু কি হওয়া উচিৎ– সেই সম্বন্ধে একটা সমীক্ষা চালান দরকার। নারীকে আমরা বেগম রোকেয়ার মর্যাদাতে দেখতে চাই। মহিয়সী রোকেয়ার ভাবাদর্শে আন্দোলন পরিচালিত হলেই– নারী তথা মুসলমান সমাজের মঙ্গল। নারীর মহান মর্যাদা ইসলামের আলোতে ও বেগম রোকেয়ার আজীবন সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে আবার দানা বাঁধুক।

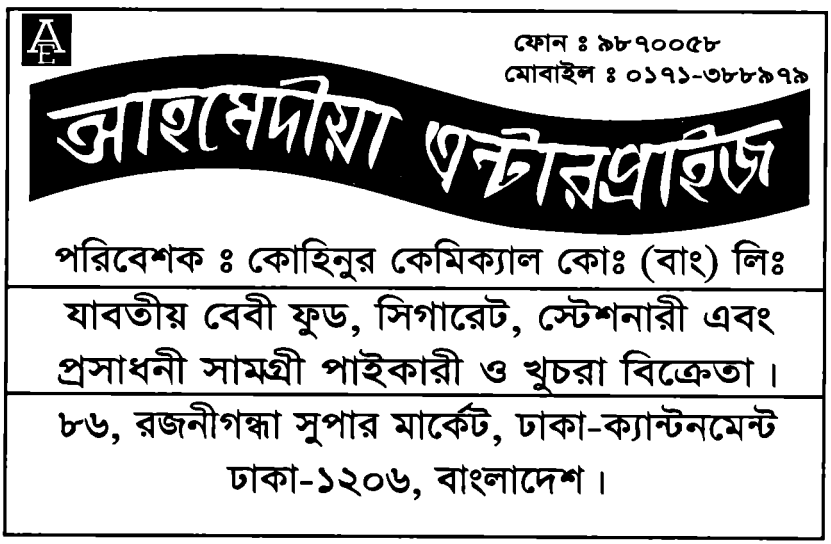

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও তাঁর সাহিত্য সাধনা

আবদুল হালীম খাঁ

উভয় বাংলার হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা এবং বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্য সাধারণ নাম। দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত বাংলার অধঃপতিত নারী সমাজ মুক্তির সত্য সুন্দর পথে পরিচালিত করার মহান উদ্দেশ্যে তিনি ত্যাগের একটি উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর আত্মত্যাগ ও সাধনা শুধু সমাজ সেবা, সংস্কার ও শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর ত্যাগ সাধনা ও চিন্তা-চেতনার বিমূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল সাহিত্যের মধ্যে। অনেকের সাহিত্য দেখা যায় সমাজ, স্বদেশ ও স্বজাতি নিরপেক্ষ। তাদের সাহিত্য পাঠে সমাজের খবর পাওয়া যায় না, না দেখা যায় তাদেরকে সমাজকর্মী হিসাবে। একজন সমাজ সেবক ও সমাজকর্মীর সাহিত্য যত তাড়াতাড়ি পাঠকদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে ও আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, তারা তা পারেন না। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ত্যাগী ধ্যানী সমাজ সেবক সাহিত্যিক। তাই তাঁর সাহিত্য তাঁর সময় থেকে এ পর্যন্ত গুরুত্ব ও শ্রদ্ধার সংগে সকল মহলে আলোচিত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

বেগম রোকেয়া ১৮৮০ ঈসায়ী সালে রংপুর জিলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহির মুহাম্মদ আবু আলী সাবের ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী। পায়রাবন্দ গ্রামে সাড়ে তিন শত বিঘা লাখেরাজ জমির মাঝখানে ছিল তাঁর বিশাল বসতবাড়ি। সাবের সাহেব ছিলেন খুব বিলাসী, অপব্যয়ী এবং দারুণ রক্ষণশীল। পরিবারের মহিলাদের বাইরে যাতায়াত ছিল নিষিদ্ধ। বাংলা ভাষা শিক্ষা ও বাংলা বইপত্র পাঠও ছিল নিষিদ্ধ। সাবের সাহেবের দুই পুত্র আবুল আসাদ ইবরাহীম সাবের ও খলিল সাবের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চ শিক্ষালাভ করেন। এর ফলে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাদের চরিত্রে প্রভাব ফেলে। সাবের সাহেবের কন্যা ছিল তিন জন– করিমুন্নেসা, রোকেয়া ও হোমেরা।

www.pathagar.com

ইবরাহীম সাবেরের সহযোগিতায় করিমুন্নেসা ও রোকেয়া গোপনে গোপনে ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষায় অনেক দূর অগ্রসর হন। কিন্তু কিছু দিন পর পরিবারে বিষয়টি যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন উভয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। করিমুন্নেসাকে বালিয়াদীতে তাঁর মাতামহের প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। মাত্র ১৪ বছর বয়সে টাংগাইল জিলার দেলদুয়ারে তাঁর বিবাহ হয়। এই মহিয়সী মহিলার নামে রোকেয়া তাঁর 'মতিচূর' গ্রন্থ উৎসর্গ করে লিখেন যে, বাল্যে তাঁর বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে আনুকূল্য করেছিলেন একমাত্র করিমুন্নেসা এবং ১৪ বছর ভাগলপুরে ও কলকাতায় ১১ বছর উর্দূ স্কুল পরিচালনা কালে বাংলা ভাষার পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়েও তিনি যে বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন তা কেবল করিমুন্নেসার প্রেরণায়।'

ষোল বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয় ভাগলপুরের সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পূর্বে তিনি মায়ের পছন্দে এক বিয়ে করেছিলেন। সে স্ত্রী অল্প বয়সে এক কন্যা রেখে মারা যান। রোকেয়া ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের স্ত্রী। রোকেয়ার সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবন ছিল খুবই মধুর। স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতায় তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর সুখের দাম্পত্য জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিয়ের বার বছর পর ১৯০৯ সালে সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন খুবই মিতব্যয়ী ও উদার হৃদয়ের অধিকারী। তিনি সত্তর হাজার টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। এর মধ্য থেকে দশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি একটি বালিকা স্কুল স্থাপন করতে আর দশ হাজার টাকা স্ত্রীকে দিতে চেয়েছিলেন। এবং পরবর্তী সময়ে তিনি করেছিলেনও তাই।

স্বামীর অকাল মৃত্যুতে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গভীর শোকে পতিত হন। তিনি এ শোককে উর্ধপাতন প্রণালীতে সৃষ্টি কর্মে নিয়োগ করেন। স্বামীর মহত ইচ্ছেকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য পাঁচ মাস পরেই তিনি মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে প্রথম সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি সেখানে বেশি দিন থাকতে পারেননি। সাখাওয়াতের প্রথম কন্যা ও জামাতা তাঁর ঘরবাড়ি ও বিষয় সম্পদের অধিকার নিয়ে এমন অশোভন আচরণ শুরু করে যে, শেষ পর্যন্ত বেগম রোকেয়া অতিষ্ঠ হয়ে ১৯১০ ঈসায়ী সালে চিরদিনের জন্য স্বামীর বাড়ি ভিটে ত্যাগ করে কলকাতা চলে আসেন। ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ কলকাতা অলিউল্লাহ লেনের একটি ছোট বাড়িতে আটজন ছাত্রী নিয়ে নতুনভাবে আবার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন। পরে লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে তা স্থানান্তরিত হয়। বেগম রোকেয়া দিনরাত অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা করে স্কুলটিকে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তাঁর সাধনা সম্পূর্ণ না হতেই ১৯৩৭ সালের ৯ ডিসেম্বর সকালে প্রায় ৫৩ বছর বয়সে হঠাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বেগম রোকেয়া সমাজে অবহেলিত ও অশিক্ষিত নারীদের জাগরণের জন্য প্রতিকূল পরিবেশে নানা বাধা-বিপত্তী উপেক্ষা করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল শুধুমাত্র গতানুগতিক নিয়মের স্কুল ছিল না, সেটি ছিল একটি আদর্শ মিশন। প্রতিটি ছাত্রীকে তিনি সেই মিশনের কর্মীতে পরিণত করেছিলেন। তাঁর চিন্তা-চেতনার বীজ তাদের মধ্যে বপন করেছিলেন। তাই নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের বিপ্লবী বাণী অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। তাঁর প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় সমাজের নারীদের অধিকারের কথাই ব্যক্ত হয়েছে নানাভাবে। কিন্তু সমাজের অনেকেই সে সময়ে তাঁর সেই মহত কাজ ও বাণীকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। সহজ সৌন্দর্য দৃষ্টি সম্পন্ন কবি কায়কোবাদ হিন্দু ও

www.pathagar.com

মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক মানুষ রূপে না দেখে স্বাভাবিক মানুষ রূপে দেখার যে প্রয়াস পেয়েছিলেন তাতে তিনি মুসলিম সমাজের নিকট থেকে লাঞ্ছনা পেয়েছিলেন। 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থ রচয়িতা পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন ও অনলপ্রবাহের কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্যান ইসলাম আদর্শের আলোকে নব উদ্দীপনা জাগ্রত করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন কম না। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্বজাতিকে জাগ্রত করতে গিয়ে শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, সমাজ সেবা ও সাহিত্যে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাতে তিনিও নানা বাধা, নিন্দা ও প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হন। তাঁর চলার পথ মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু তিনি কোনো বাধা ও সমালোচনায় দমে যাননি। তাঁর হৃদয়ের দুঃখ ও পুঞ্জিভূত বেদনা ব্যক্ত করেছেন কাব্য সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে। তিনি 'শশধর' কবিতায় বলেছেন ঃ

কি ভাবিছ শশধর! বসি নীলাসনে?
কি রেখেছ শশধর। হৃদয়ে গোপনে?
লুকাতে পারোনি তাহা প্রভুত যতনে, আহা!
দেখা যায় কালো ছায়া ও চাঁদ বদনে।
কি ভাবিছ শশধর! বসি যোগাসনে?

পুষিছ হৃদয়ে তুমি প্রেমের অনল?
পুড়িয়ে হয়েছে কালো তাই হৃদিতল!
না বুঝে অবোধ নরে কত অনুমান করে,
অথবা অমিয়া ভ্রমে ভীষণ গরল
হৃদয়ে পুরিয়া–মুখে হাসিছে কেবল।
নীরবে দগ্ধ হও নীরবে যাতনা সও
নীরবে নীহার-রূপে ঝরে আঁখিজল!
পুষিছ হৃদয়ে শশি, প্রেমের অনল।

কি দেখিছ শশধর! আমার হৃদয়?
তোমারি কলঙ্কসম অন্ধকারময়!

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীদের জাগরণ চেয়েছিলেন, নারীদের অধিকার চেয়েছিলেন, পুরুষদের মতো সমাজে নারীদের কর্মচঞ্চলতা দেখতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ। তবে তিনি পর্দা প্রথাকে অস্বীকার করেননি। নারীদের জন্য পর্দা প্রথা প্রয়োজন– নারীদের কল্যাণের জন্যই। তবে পর্দা নিয়ে বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের উদ্দামতার চেয়ে এই যে সংযম ও মমত্ববোধের প্রাচুর্য তার মূলে রয়েছে তাঁর নারী প্রকৃতি। 'বোরকা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ভাইদের সহিত দেখা-সাক্ষাত হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে 'বোরকা' ছাড়িতে বলেন। বলি উন্নতি জিনিসটা কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে বুঝিবে যে জেলেনী, চামারনী, কি ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছে?.....

পৃথিবীর অসভ্য জাতিরা অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। ইতিহাসে জানা যায়, পূর্বে অসভ্য ব্রিটেনেরা অর্ধনগ্ন থাকিত। অই অর্ধনগ্ন অবস্থার পূর্বে গায় রং মাখিত। ক্রমে সভ্য হইয়া তাহারা পোশাক ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে।

www.pathagar.com

'মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই সকল সভ্য জাতিদেরই কোন না কোনরূপ অবরোধ প্রথা আছে। এই অবরোধ প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে? এমন পবিত্র অবরোধ প্রথাকে যিনি 'জঘন্য' বলেন, তাহার কথার ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম।'.....

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈল বিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরকা পরিয়া চলা-ফেরায় কোন অসুবিধা হয় না। তবে সেজন্য সামান্য রকমের অভ্যাস [practice] চাই; বিনা অভ্যাসে কোন কাজটা হয়?'

বেগম রোকেয়া নারীদের শিক্ষা, অগ্রগতি ও অধিকার চাইলেও তিনি বেপর্দা অর্থাৎ সুরুচি ও শালীনতা বিসর্জনের কথা বলেননি। অতি আধুনিক বেলেল্লেপনা তাঁর কাছে দারুণ শ্লেষের বিষয় ছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'উন্নতির পথে' শীর্ষক রম্য রচনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

'.....চশমা ভালো করে মুছে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনে নজর পড়লো– 'ক্রশেন সল্ট' খেলে সত্তর বছরের বুড়োবুড়ি কুড়ি বছরের তরুণ হয়ে যায়। বাস্। এক শিশি কিনে খাওয়া আরম্ভ করলুম।

ভাই। কি বলবো– এক হপ্তা 'ক্রশেন সল্ট' খেতে না খেতে এক্কেবারে আঠারো বছরের তরুণের মতো গায়ে স্ফূর্তি হলো। তখন ভাবলুম, আর এ বুড়োদের সঙ্গে অথর্ব হয়ে থাকা নয়– যাই তরুণদের সঙ্গে মিশতে। লাঠি ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দেখি ঃ মেলা তরুণ এক জায়গায় জড় হয়ে গান করছে–

'নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শতবার খসে খসে পড়ে–'

বাঃ! আমার বড় ভালো লাগলো– বিশেষত আমি বাষট্টি বছর এগিয়ে এসেছি কিনা– অর্থাৎ আমার বয়স আশি বছর; কিন্তু এক হপ্তা ঔষধ খেয়ে যে এক্কেবারে আঠারো বছরের তরুণ হয়ে গেছি– তাই প্রাণে আর স্ফূর্তি ধরে না।

তরুণকে বল্লুম, "ভাই, আমি দাড়ী গোঁফ চেঁচে ফেলে [শিং কাটিয়ে] তোমাদের সঙ্গে মিশতে এসেছি। আমায় তোমার সঙ্গে উন্নতির পথে নিয়ে চল।"

সে বললো, 'বেশ এস।'

পরদিন আমি একটা মোটর নিয়ে তরুণের কাছে গেলুম। সে হেসে বললো– 'এখন আর মোটর নয়। আমার এরোপ্লেনে চল। এরোপ্লেনটা ঘন্টায় ৬০,০০০ মাইল চলে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'ভায়া! পৃথিবীর গতি ঘন্টায় ৭২০ মাইল, আর তোমার এরোপ্লেনের গতি ঘন্টায় ৬০,০০০ মাইল?' তরুণ বললো– 'কি জান দাদা। পৃথিবী বুড়ো হয়ে গেছে– সে আর আমাদের উন্নতির গতির সঙ্গে পেরে ওঠছে না।'

যাক, আমাদের প্লেন বোঁ বোঁ করে রওয়ানা হলো। তাতে আরও অনেক যাত্রী ছিল– ইরানী, তুরানী, তূর্কী, আলবানিয়ান, ইরাকী, কাবুলী ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবল তরুণ নয়, তরুণীরাও ছিল। সবাই নওজোয়ান,– বুড়ো [আমি ছাড়া আর] একটাও না। আমার মাথার ভিতর কেবলই গুঞ্জন করছিল–

'নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শত বার খসে খসে পড়ে'

কখন ঐ গানটাই উলট পালট হয়ে মনে ভেসে বেড়াচ্ছিল
'পাগড়ী নাই টুপি নাই, লজ্জা নাই ধড়ে–' ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ও বাবা। কতক্ষণ পরে দেখি কি, সত্য সত্যই তরুণদের কাছা কোঁচা একেবারে খসে পড়ে গেছে– আর–

রোদ বৃষ্টি হিম হতে বাঁচাইতে কায়
একমাত্র হ্যাট তার রয়েছে মাথায়!

শেষে দেখি, সোবহান আল্লাহ। তরুণীরা অর্ধ-দিগম্বরী।

যাক, হ্যাট দিয়ে লজ্জা যদি নাও নিবারণ হয়, তবু রোদ বৃষ্টি হিম হতে মাথাটা বাঁচবে। কিন্তু তরুণীদের মাথায় যে হ্যাটও নাই। আর চেপে থাকতে না পেরে বলে ফেললুম, ভাই তরুণ, উন্নতির পথে চলেছ, তা উলঙ্গ হয়ে কেন?

সে বললো– 'আমরা এখন দেশোদ্ধার করতে চলেছি আমাদের কি আর কাছা-কোঁচা জ্ঞান আছে?'.....

আমি মিনতি করে বললুম, 'ভায়া তরুণ। দয়া করে তোমার প্লেন থামাও, আমি এখানেই নেমে পড়ি।'

ইরানী তরুণ হাসতে হাসতে বললো– 'দাদা! এখনই কি হয়েছে– কোলভীলের যুগ দেখেই ভয় পাচ্ছ? এখনও তো গায়ে রঙ মাখার যুগে এসে পৌছায়নি।'

আমি কাকুতি করে বললুম, দোহাই ভায়া তরুণ। আর না। আমি বুঝতে পেরেছি ঃ তোমরা এখন আদি মাতা হযরত হাওয়ার যুগে এসে পড়েছ, আদি পিতা অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে গাছের তিনটা পাতা নিয়ে– একটায় তহবন্দ, একটা দিয়ে জামা আর একটা দিয়ে মাথা ঢাকবার টুপী করেছিলেন। আর আদিমাতা তাঁর লম্বা চুল খুলে দিয়ে সমস্ত গা ঢেকেছিলেন। কিন্তু এখনকার তরুণীদের মাথায় তো চুলও নেই– এরা কি দিয়ে গা ঢাকবে?' [মাসিক মোহাম্মদী পৌষ- ১৩৩৫]

প্রত্যেক বড় কবি সাহিত্যিকদের রচনায় থাকে একটি স্বতন্ত্র style. সেই style-এর মধ্যে তিনি অন্যদের থেকে বিশিষ্ট হয়ে থাকেন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের রচনায়ও রয়েছে একটি বিশেষ style. সেই style-এর ভিতর ফুটে ওঠেছে তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি, প্রজ্ঞা, বেদনাবোধ অথচ মুক্তি অভিসারী মন। তাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণে কাজী আবদুল ওয়াদুদ বলেন ঃ এ যুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ গৌরবের আসন এই তিনজনের– মিসেস আর, এস, হোসেন, কাজী ইমদাদুল হক ও লুৎফর রহমান... মিসেস আর. এস. হোসেনের প্রতিভা এ কালের ভগ্ন হৃদয়ে মুসলমানদের জন্য যেন এক দৈব আশ্বাস। সৈয়দ এমদাদ আলী বলেন ঃ

.....'যে নারী অবলীলায় সকলের আক্রোশ সহ্য করিয়া, সমাজের নানা মলিনার কথা, নারীর নানা দুঃখের কথা তীব্র ভাষায় প্রকাশ করিবার সাহস রাখিতেন, তিনি আর নাই। তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল, কারণ তিনি একটা মহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণা লইয়া কাজ করিতেন, সে কাজের ভিতরে আমরা যে সুমঙ্গল নিহিত দেখিতাম তাঁহার ফলেই তাঁহার দেওয়া আঘাত আমাদের তখনকার ক্ষুদ্র সাহিত্যিক সঙ্ঘের প্রত্যেকের মনে ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিত। মৃত্যু আজ তাঁহাকে অমর করিয়া দিয়াছে। তাঁহার স্মৃতির উপরে আজ বাংলার মুসলমান সমাজ যে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিতেছেন, বাংলার কোন মুসলমান পুরুষের মৃত্যুতে সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। ইহা শুধু যুগলক্ষণ নহে, ইহা আমাদের জাগরণের লক্ষণ।'

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর সমাজ সেবা ও সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে চির অমর হয়ে থাকবেন তাতে সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়া ঃ এক অমিত শক্তির নাম

বেগম রাজিয়া হোসাইন

বেগম রোকেয়া এমন একটি নাম যার সঙ্গে তুলনা করার মতো কোনো ব্যক্তিত্ব আজও আমাদের সমাজে জন্মগ্রহণ করেননি। শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, সমাজ সংস্কারক, চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক হিসেবে বিশেষ করে বাঙালী মুসলিম সমাজে নারী জাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে বেগম রোকেয়ার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। অন্তঃপুরে অবরোধ বাসিনী নারী সমাজকে 'মানুষের স্বকীয় অধিকার' দিয়ে উন্মুক্তবিশ্বে ডেকে আনার যে আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন, আত্মমুক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধের যে ভিত রচনা করেছিলেন তার উপমা তিনি নিজেই।

তার নারীবাদী চিন্তা ও অভিমত, আন্দোলন ও অগ্রযাত্রা মুসলিম সমাজের বাইরে সমকালীন হিন্দু সমাজেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু সমাজে তখন একজন নারী 'সেবাদাসী' অথবা স্বামী-সহমরণের বস্তু ব্যতীত কিছুই ছিল না। রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজের নারী মুক্তির লক্ষ্যে যে সংগ্রাম ও আন্দোলন চালিয়েছিলেন তার সঙ্গে বেগম রোকেয়ার লক্ষ্য কর্মপন্থার মিল রয়েছে। তাঁরা অনুভব করেছিলেন হিন্দু নারীর প্রতি সর্বস্ব জীবনের নিঃস্বতা, আত্মাহুতি, সতীদাহ, কঠোর বৈধব্য এবং কুসংস্কার আচ্ছন্ন সমাজের শত ধিক্কার এই 'অবলা'দের প্রতি। তারা দেখেছিলেন পুরুষ শাসিত সমাজের প্রভুত্ববাদ এবং শাস্ত্রীয় শাস্তি প্রদানের নিষ্ঠুর বিধি ব্যবস্থা। সবই মনগড়া, একপেশে পুরুষের তৈরি। কেবল ঘর-সংসারের নিশ্চিন্ততার জন্যই যেন নিবেদিত এই নারী। নারীও যে মানুষ, তারও যে আছে অধিকার মনুষ্যত্ব বিস্তারের, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে যোগদানের, এ সত্যটি বিলকুল চাপা পড়ে গিয়েছিল কুসংস্কার ও পুরুষনীতির বেড়াজালে। এ অবস্থায় সমাজের সার্বিক কল্যাণ সম্ভব নয়।

বেগম রোকেয়া তাঁদের সে মানবিক আদর্শের অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন এবং তাঁদের মতো করেই দেখেছেন দক্ষিণ এশিয়ার ভারতীয় অঞ্চলের মুসলিম নারী সমাজের কঠোর পর্দা প্রথার অন্তরালে নারী জীবনের অসহায়ত্ব, শিক্ষা বঞ্চিত নারীর দুর্ভাগ্য এবং একমাত্র পুরুষের গলগ্রহ হয়ে থাকার অব্যক্ত বেদনায় নিষ্পেষিত নারীর করুণ আর্তি। পুরুষ শাসিত সমাজের এই কঠিন দেয়াল

www.pathagar.com

ভাঙার তাগিত বেগম রোকেয়াকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল ভাইরাই ভগিনীদের জন্য এইসব অনুশাসন তৈরি করেছেন তাদের সংসার জীবনের স্বার্থে। ধর্মের দোহাই দিয়ে এ প্রক্রিয়াকে মজবুত রাখার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার মধ্যেও তা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। কিন্তু ধর্মে জ্ঞান অর্জন অথবা কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে আসার পথে নিষেধাজ্ঞা কোথায়? ইসলাম ধর্ম বরং নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই জ্ঞান অর্জন করা ফরজ করেছে। সমাজের অর্ধেক অংশকে বাদ দিয়ে, মূর্খ রেখে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। আর অশিক্ষিত কূপমণ্ডুক মায়ের সন্তান, অযোগ্য মায়ের সন্তান নিকৃষ্ট হবে এতেই বা সন্দেহ কী!' চীন, জাপান, তুরস্কের নারীসমাজ তখন কত এগিয়ে গেছে। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে বিক্ষুব্ধ হয়ে তাই দারুণ সাহসী হয়ে উঠেন তিনি। আলাপ-আলোচনায়, বক্তৃতা ও লেখা-লেখিতে শুরু করেন সংগ্রাম। সুকঠিন ভাষায় প্রবন্ধ লিখে, নকশা-বিন্যাস লিখে সমাজ চেতনাকে জাগ্রত করার প্রয়াস নেন। লক্ষ্য ও আদর্শের সিংহভাগ জুড়েই ছিল নারী জাগরণ ও নারী মুক্তি।

'নবপ্রভা' পত্রিকায় তার প্রথম প্রকাশিত গদ্য 'পিপাসা' [১৩০৮] এবং মাসিক মহিলা পত্রিকায় তার প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ, 'অলঙ্কার না Badge of Slavery'! তার প্রথম প্রবন্ধটি আত্ম নিবেদনমূলক আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কিন্তু দ্বিতীয়টি সবচেয়ে বিতর্কিত এবং উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। নারী স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের প্রশ্নে অলঙ্কার না Badge of Slavery তে পুরুষদের প্রতি রোকেয়ার মনোভাব পুরোপুরি আক্রমণাত্মক।

প্রবন্ধটি ১৩১০ সালে 'মহিলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর 'আমাদের অবনতি' নামে পুনরায় মাসিক 'নবনূর' এ ছাপা হয় [১৩১১] এবং পরবর্তিতে তার প্রথম বই, প্রবন্ধ সংকলন 'মতিচূর' [প্রথম খণ্ড– ১৯০৪ ইং বাংলা ১৩১২] গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলো হচ্ছে, স্ত্রী জাতির অবনতি, নিরীহ বাঙালী অর্ধাঙ্গী, সুগৃহিণী, বোরকা, গৃহ ইত্যাদি। তারপর প্রকাশিত হয় মতিচূর ২য় খন্ড [১৩২৮]। এই গ্রন্থের বিশেষ প্রবন্ধগুলো হচ্ছে নূর ইসলাম, সৌরজগত, সুলতানার স্বপ্ন, জ্ঞান ফল, নারী সৃষ্টি, শিশু পালন, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি। 'সুলতানার স্বপ্ন' নামে কল্পনানির্ভর রম্য রচনাটি ১৯০৮ ইং, বাংলা ১৩১৬ সনেই ছোট বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি সাহিত্য সমাজে সাদরে গৃহীত হয়। তারপর পদ্মরাগ বিন্যাস [১৩৩১] এবং অবরোধ বাসিনী [১৩৩৮] রম্যকাহিনী– গ্রন্থ দু'টি প্রকাশিত হয়। সব লেখাতেই বেগম রোকেয়ার স্বাধীনচেতা অবচেতন মনোভাব এবং স্পষ্টবাদিতার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি সওগাত, মোহাম্মদী এবং The Mussalman পত্রিকায়ও নিয়মিত লিখতেন। রোকেয়ার ধারণা ছিল God gives, Man robs. That is, Allah has made no distinction in the general life of male and female..... but our brothers commit crime against us and deprive us of education..... It is an irony of fate that the Hindus who are bound by their cartload of 'Shastras' to treat women like slaves and cattle and to get their daughters married before they are hardly above their girlhood, now giving liberty to their women folk and giving them high, education...And it is fact that our 'Inefficiency' exists and stares us in the face. God gives, Man robs নামের এই দুষ্প্রাপ্য রচনাটি The Mussalman পত্রিকার ২১তম বার্ষিক সংখ্যায় ১৯২৭ সনে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র-পত্রিকায় তার লেখাগুলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঝড় উঠে যেতো ত্রিমুখী আলোচনা ও সমালোচনার।

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়ার কলম এত তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার যে কী প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, রম্য কাহিনী, কী কবিতা-নকশা সব কিছুতেই হুল ফোটানো। তিনি বাংলা-ইংরেজী দুই ভাষাতেই অনর্গল লিখে যেতেন। লিখে যেতেন আলোচনা-সমালোচনার জবাবও। সমালোচক যত খড়্গহস্তই হোন না কেন রোকেয়া কখনও ভেঙে পড়েননি। গন্তব্যে পৌঁছাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। সৎ সাহস ও সত্যের সংগ্রাম শক্তি যুগিয়েছে তাকে, তিনি চাবুক লাগিয়েছেন সমাজ দেহে।

বেগম রোকেয়ার 'মতিচূর' ১ম খণ্ড প্রকাশের পর 'নবনূর' সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী তার পত্রিকায় বলেছেন [১৩১৩], 'চাবুকের চোটে সমাজদেহে ক্ষত হইতে পারে কিন্তু তদ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয় না। 'মতিচূর' রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন, ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে আমরা এমত আশা করিতে পারি না।'

সমালোচকের ধারণা বেগম রোকেয়া 'মদ্রাজের Christian Tract Society-র প্রকাশিত Indian Reform সম্বন্ধীয় পুস্তিকাসমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত। সমালোচক আশাবাদী, 'আজ এশিয়া নিদ্রিত বলিয়া চিরদিনই সে এরূপ নিদ্রিত থাকিবে না।' তবে নিদ্রা ভঙ্গের ঘটনাটি ঘটবে, তার মতে, 'নৈসর্গিক উপায়ে।' জাগরণের ব্যাপারে মানবিক প্রয়াস বা সচেতন উদ্যোগের কোনো মূল্য নেই। বেগম রোকেয়া এ জন্যই ওই সমাজকে নিকৃষ্ট বলেছেন এবং তার উপর খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর সৌরজগৎ গল্পে শিল্পিত জবাব দিয়েছেন গওহরের মুখ দিয়ে। 'খ্রিস্টানদের নিকট শিখিতে যাইব কেন? ঈশ্বর কি আমাকে বুদ্ধি দেন নাই?'

সমালোচক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারও এ ব্যাপারে পশ্চাৎমুখিতা ও রক্ষণশীলতা প্রদর্শন করেছেন, 'পুরুষ জাতিগতভাবে কঠিন জ্ঞানার্জনে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। ইহাতে নানা দিক দিয়া সমাজ সুশৃঙ্খল হইয়াছে...এত যুগের পর এত যুগের সামাজিক শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম কি সম্ভবপর?'

'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদকের মতো তিনিও বেগম রোকেয়ার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য অনুরাগের অভিযোগ এনেছেন, 'আমাদের বহির্বাটি যে কারণেই হউক পাশ্চাত্যের ভাবসাগরের তরঙ্গ মধ্যে ডুবুডুবু। আমাদের অন্তঃপুরও যদি ঐভাবে ডুবিতে যায় তবে বড় আশঙ্কার কথা...আমরা অন্তঃপুরে জননী জাতির পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে চাই। প্রাচ্যের উন্নতি পাশ্চাত্যভাবে নহে, প্রাচ্যভাবেই হইবে।'

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় [১৩৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত] জনাব আবুল হুসেন এর আলোচনা কিন্তু অন্যরকম, 'পুরুষের বিরুদ্ধে এমন কিছুই তিনি বলেন নাই যাহাতে পুরুষেরা আপত্তি করিতে পারে...পুরুষের অপরাধের তুলনায় তাহাদিগকে তদপেক্ষা আরও অধিক কশাঘাত করা উচিত ছিল...আজ ভারতের নারী সমাজ এত অতলতলে পড়িয়া গিয়াছে কেন? তাঁহার একমাত্র কারণ পুরুষ।'

শেখ ফজলল করিম সম্পাদিত 'বাসনা' পত্রিকায় [১৩১৬ সংখ্যায়] প্রকাশিত আলোচনাটি এরকম, 'মতিচূর' সুলিখিত গ্রন্থ। অনেক পুরুষ লেখকের পক্ষেও এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন শ্লাঘার বিষয় হইত। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ নিবন্ধগুলি চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।'

The Mussalman পত্রিকায় ৪ ডিসেম্বর ১৯০৮ সংখ্যায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে, 'বিদ্যমান পর্দা প্রথা সম্পর্কে লেখিকা অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এ থেকে ধারণা করা ঠিক হবে না যে রোকেয়া প্রথাটিকে একেবারে তুলে দিতে চান।'

www.pathagar.com

'নবনূর' এ প্রকাশিত বেগম রোকেয়ার 'আমাদের অবনতি' [অলঙ্কার না Badge of Slavery-এর নামান্তর] শীর্ষক প্রবন্ধের উপর নওশের আলী খান ইউসুফজীর আলোচনা [১৩১১], 'স্বর্গোদ্যানে আপনারাই আমাদের পতনের পথ প্রদর্শক ছিলেন, ট্রয় সমরে আপনারাই নায়িকা ছিলেন, লঙ্কাকাণ্ড আপনাদেরই পদানুসারে ঘটিয়াছিল, কারবাবালার সে ভীষণ কাণ্ডেও আপনারাই অভিনেত্রী ছিলেন। তাই ভয় হয়, আপনারা আবার জাগিলে না জানি কি কাণ্ড সংঘটিত হয়।'

সমালোচক যাই বলেন না কেন, পৃথিবীর ইতিহাস ঘেটে যত উদাহরণ বের করেন না কেন বেগম রোকেয়ার সমাজ সচেতন মনোভঙ্গি এবং সমাজ সংস্কারে তার লেখার কঠিন চাবুক ভিতরে ভিতরে ঠিকই কুসংস্কারের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে পুরুষের টনক নড়েছিল। সমাজের বন্ধ্যাত্ব নিরসনে কেবল পুরুষ নয় নারীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই সমালোচকগণ স্থানান্তরে তাও বলেছেন যে সাহিত্যে দৃঢ়তা, গুরুত্ব এবং শক্তি সঞ্চারের ক্ষেত্রে, উন্নত সমাজ গঠনের স্বার্থে বেগম রোকেয়া এক অপরাজেয় সৈনিকও বটে। অকুতোভয়ে তিনি কলম চালিয়েছেন। তার 'মতিচূর' অবশ্যই এই শ্রেণীর সর্বপ্রথম গ্রন্থ, এক অমূল্য রত্ন খণ্ড। এর চমৎকার লিপিকৌশল ও মনোহারিণী ভাষার মধ্যে যে গভীর ভাবরাশি উজ্জ্বল রূপে ফুটিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক পাঠকের নিকট তাহা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে...কিন্তু ইহার স্বাদ লইতে গেলে আনন্দ পুলকের সঙ্গে সঙ্গে অশেষ চিন্তা এবং অপার সমস্যা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।'– দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার।

একদিকে, বলেছেন রোকেয়ার 'সুগৃহিনী' প্রবন্ধটি সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, অন্যদিকে বলেছেন, তাঁহারা সকলেই যদি বিজ্ঞানের গভীর গবেষণায় মনোনিবেশ করেন তবে আমাদের গৃহ নিশ্চয়ই শ্মশান হইবে এবং আমরা গৃহহীন হইব– সেইরূপ অবস্থায় তাহারা চালে ডালে এক না করিলেই রক্ষা।'–সৈয়দ এমদাদ আলী।

বেগম রোকেয়ার 'অর্দ্ধাঙ্গী' প্রবন্ধ সম্পর্কে মাসিক 'মহিলা' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র সেন বলেছেন, 'মুসলমান পরিবারের বধূদিগকে ও কন্যাদিগকে পুরুষগণ কর্তৃক অনেক প্রকার নিপীড়ন ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তিনি ব্যথিত হৃদয়ে ভগিনীদের কল্যাণোদ্দেশ্যে উপরোক্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পুরুষদিগের প্রতি তার আক্রমণ ও সেই কারণেই বেগম রোকেয়া বুদ্ধিমতী, চিন্তাশীল মনস্বিনী কন্যা, বঙ্গীয় মুসলমান কূলে কি অসামান্য নারী। আমরা তাহাকে শ্রদ্ধা, আদর ও সম্মান করি'।

'সুগৃহিনী' প্রবন্ধে বেগম রোকেয়ার 'জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কিত বক্তব্যটি অভিনন্দিত হয়েছিল। বক্তব্যটি ছিল এরকম, 'আমরা সর্বপ্রথম ভারতবাসী– তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু'। এই দৃষ্টিভঙ্গীর আদলে সমাজের কোনো পুরুষ সদস্যও তার ভগ্নাংশ পরিমাণ সচেতনতার পরিচয় দেননি। সাহিত্য, সংস্কৃতি সমাজ জাতি-ধর্ম এবং নারী ব্যক্তিত্বময় জাগরণ নিয়ে বেগম রোকেয়ার চিন্তা-চেতনা মানবিক অধিকার প্রাপ্তির অন্বেষায় অবশ্যই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। তিনি দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্বদেশের স্বাধীনতা, স্বদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি নিয়েও ভেবেছেন তবে তার জীবনের ব্রত ছিল নারী মুক্তি তথা নারী শিক্ষা বিস্তার, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক অবরোধ থেকে মুক্তিদান। বেগম রোকেয়ার এক বিস্ময়কর রচনা 'অবরোধ বাসিনী'– তার বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে কঠিন পর্দায় আবৃত নারী জীবনের করুণ, অসহায়, মর্মান্তিক কিছু ঘটনার বিবরণে সমৃদ্ধ একটি রম্য রচনা গ্রন্থ। এতে মোট সাতচল্লিশটি ঘটনা আছে। রোকেয়া কবির ভাষায় তার ভূমিকা দিয়েছেন,

'কাব্য উপন্যাস নহে, এ মম জীবন
নাট্যশালা নহে, ইহা প্রকৃত ভুবন।'

www.pathagar.com

এই বইটিও বিভিন্নমুখী সমালোচনার সূত্রপাত করেছিল। জনাব আবদুল করিম, বি. এ. এম. এল সি মহোদয়ের অভিমত, 'অনেকে অনেক প্রকার ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন; কিন্তু তাতে ভারতের অবরোধ-বাসিনীদের লাঞ্ছনার ইতিহাস ইতিপূর্বে আর কেহ লিখেন নাই...আমরা কোথা হইতে আসিয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছি...কোথায় বীরবালা, খাওলা ও রাজিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক পুরুষ যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন আর কোথায় বঙ্গীয় মুসলিম নারী চোরের হস্তে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন...আমার দৃঢ় বিশ্বাস অবরোধ বাসিনী পাঠে ঘুমন্ত জাতির চিন্তা চক্ষু উন্মীলিত হইবে।'

বেগম রোকেয়া আন্দোলিত হয়েছিলেন মুক্তির লক্ষ্যে। চারপাশে অবরুদ্ধ দেয়াল, ধর্মীয় অনুশাসন, পুরুষের রক্তচক্ষু। শিক্ষায় বঞ্চিত নারী গৃহকোণে বন্দি। সামান্য আরবি-ফারসি ভাষায় কিছুটা জ্ঞান অর্জন করে, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে কেবল গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকা। বাংলা ইংরেজির ভুবন তাদের জন্য এক নিষিদ্ধ পৃথিবী। ছোট্ট রোকেয়ার মনে সেই শৈশবেই এসেছিল এই বাধ ভাঙার স্বপ্ন। স্বপ্ন সবটুকু সত্য না হলেও বিশ্বে এক আলোকবর্তিকা এসেছিল তার হাতে। সেই আলোয় আলোকিত সমাজ এখন, নারী-পুরুষ এক সমান মানুষ। আমাদের এই আলোকিত দিনের প্রভাত সহজে আসেনি। অন্ধকার দিনগুলোতে ব্রতচারীর মতোই কাজ করেছেন বেগম রোকেয়া, তারপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজ উন্নয়নের আদর্শ ঠাঁই পেয়েছে মানুষের মনে। রোকেয়া হয়েছেন চির স্মরণীয়।

রোকেয়ার শৈশব এক অদ্ভুত রেমাঞ্চকর। ভাইরা যখন পড়তো, ইংরেজি-বাংলা কত কী, ব্যাকুল হয়ে উঠতেন তিনি। তার কেন নেই অধিকার? বড় ভাই কাছে টেনে গোপনে একদিন শুরু করেন তার লেখাপড়া। স্কুল কলেজের নাম শুনেছেন রোকেয়া, চোখে দেখেননি। শৈশবের স্মৃতিচারণে তিনি বলেছেন, 'কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছি। আত্মীয়-স্বজনেরা নানা প্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন– কিন্তু তথাপি আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। ভ্রাতাও কাহারও বিদ্রূপে ভগ্নোৎসাহ হইয়া আমাকে পড়াইতে ক্ষান্ত হন নাই।'

বেগম রোকেয়ার বাংলা বর্ণ পরিচয় অবশ্য তার বড় বোন করিমুন্নেসার কাছে। মাতৃভাষা চর্চার অপরাধে যাকে পিতৃগৃহ ছাড়তে হয়েছিল চৌদ্দ বৎসর বয়সের আগেই। তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়েছিল। মোল্লা-মুরুব্বিগণের 'নিন্দা ও বাক্যজ্বালায়' অধীর পিতা এতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্বশুর বাড়ির পরিবেশ এত বেশি রক্ষণশীল ছিল না। বিয়ের পরে তিনি ইচ্ছামত বাংলা শিখতে পেরেছিলেন। রোকেয়ার ভাষায়, 'সমাজ তাহাকে গলাটেপা করিয়া না রাখিলে করিমুন্নেসা দেশের একটি উজ্জ্বল রত্ন হইতে পারিতেন..তিনি নিজের শিক্ষা লাভের জন্য কষ্ট করিয়াছেন, পুত্রদ্বয়কে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য লাঞ্ছনা সহিয়াছেন– শেষে আমাকে দু'হরফ বাঙ্গলা পড়াইবার জন্যও নিন্দা ও ভ্রুকুটি সহিয়াছেন। ধন্য সমাজ, তবু তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। আমাকে সাহিত্য চর্চায় তিনিই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।'

রোকেয়া এইসব ঋণ স্বীকার করে তার 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উৎসর্গ করে বলেছেন, 'আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ'। এমনি করে তার রচিত দু'টি গ্রন্থ Sultana's Dream [১৯০৮] এবং 'মতিচূর' ২য় খণ্ড [১৩২৮] বড়বোন করিমুন্নেসাকে উৎসর্গ করেছেন। 'মতিচূর' ২য় খণ্ডে তিনি লিখেছেন, 'চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে থাকিয়া বঙ্গভাষায় কথাবার্তা কহিবার একটি লোক না পাইয়াও যে বঙ্গভাষা ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমারই আশীর্বাদে।'

বড় বোন করিমুন্নেসার মতোই রোকেয়ারও বিয়ে হয়ে যায় একই বয়সে। স্বামী উর্দুভাষী, বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট। পৈত্রিক নিবাস বিহারের ভাগলপুরে। বিয়ের পর রোকেয়া ভাগলপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। সামাজিক মর্যাদা এবং আর্থিক

www.pathagar.com

স্বাচ্ছন্দ্য তাদের ছিল। পিতৃগৃহের সংকীর্ণ রক্ষণশীল পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে রোকেয়া বরং সুখে ছিলেন এখানেই। স্বামীর সাহচর্যে তার জ্ঞান পরিধি বৃদ্ধি পায়। ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রটি হয় প্রসারিত। রোকেয়া লিখেছেন, 'আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না।'

পিতৃ পরিবার সম্পর্কে রোকেয়ার লেখা, 'সবেমাত্র পাঁচ বছর হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত।'

একবার বাড়িতে তার ভ্রাতৃবধূর খালার বাড়ি থেকে দু'জন কাজের মহিলা ভ্রাতৃবধূকে দেখতে আসায় রোকেয়াকে চারদিন ত্রিতলে চিলেকোঠায় সময় কাটাতে হয়েছিল। প্রতিদিন ভোরে তার খালা তাকে কোলে করে ওখানে রেখে আসতেন। রোকেয়ার ভাষায়, 'আমার খাওয়ার খোঁজ খবরও কেহ নিয়মিত লইত না। মাঝে মাঝে হালু খেলিতে খেলিতে চিলেকোঠায় গিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাকেই ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা বলিতাম। সে কখনও এক গ্লাস পানি, কখনও খানিকটা বিন্নি [খই] আনিয়া দিত। কখনও বা খাবার আনিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিত না– ছেলে মানুষ তো ভুলিয়া যাইত। প্রায় চারদিন আমাকে ঐ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।'

ব্যক্তিগত জীবনের এইসব অভিজ্ঞতাই তাকে রুষ্ট করে তুলেছিল এবং উদ্বুদ্ধ করেছিল 'অবরোধ বাসিনী' লিখতে। অবরোধ বাসিনীর সূচনায় তিনি লিখেছেন, 'গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে, মেয়ে মানুষদের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ির চাকরানী ব্যতিত অপর স্ত্রীলোক দেখিতে পায় না।'

বেগম রোকেয়ার আত্ম উপলব্ধি এবং সত্য দৃষ্টি এই যে ঐসব আচার-আচরণ এবং ধর্ম শাস্ত্রগুলো পুরুষ রচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তারাই আইন প্রণয়ন করেছেন, 'নারী পুরুষের সম্পূর্ণ অধীনা'। প্রচার করেছেন ধর্মীয় নীতিমালা। বস্তুত ধর্মের দোহাই নারীর দাসত্ব বন্ধনকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছে। তাই ধর্মীয় বিষয়ে কোনো আলোচনার ব্যাপারে তার অনাগ্রহ বিরাজমান ছিল। তিনি বলতেন,

My late husband advised me not to
discuss religion with anybody.

'অবরোধ বাসিনী' লিখতে গিয়ে তিনি আরও লিখেছেন, 'আমি কারসিয়ঙ্গ ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগর তীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি।'

মোতাহার হোসেন সুফী 'অবরোধ বাসিনী' সম্পর্কে বলেছেন, 'এতে অবরোধ এবং কঠিন পর্দা সম্পর্কিত পারিবারিক ও সামাজিক দুর্ঘটনার মর্মস্পর্শী কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কাহিনীগুলো অমানবিক প্রথার সঙ্গে সম্পৃক্ত নারী নিপীড়ন ও নির্যাতনের কাহিনী...লেখিকার বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত।'

বিশিষ্ট সমালোচক ও গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ বেগম রোকেয়া সম্পর্কে লিখেছেন, 'তিনি চেয়েছিলেন সমাজের পরিবর্তন, নারী সমাজের জাগরণ, মুসলমান রমণীর অবরোধের অবসান, এখানেই তার মহত্ব...তিনি স্বপ্ন দেখতেন কীভাবে বাঙালীর কুসংস্কারগুলো মাড়িয়ে প্রগতির পথে হাঁটা যায়।'

সমাজ সংস্কারক ও লেখিকা ব্যতীত বেগম রোকেয়ার যে অনন্য সাধারণ একটি পরিচয় রয়েছে তা শিক্ষাব্রতী হিসেবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 'শিক্ষা বিস্তারই এইসব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ'। ১৯০৯ সনে স্বামীর মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গালর্স স্কুল' স্থাপন করেন। শিক্ষার মাধ্যম উর্দু। ওখানে কোন বাংলা ভাষাভাষি না

www.pathagar.com

থাকায় এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে ১৯১০ সনের শেষের দিকে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং ১৯১১ সনের ১৬ মার্চ নবপর্যায়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল শুরু করেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ধারণায় বিশ্বাসী বেগম রোকেয়া ১৯১৭ সনে তার বিদ্যালয়ে পৃথক বাংলা ক্লাশও চালু করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবেই পৃষ্ঠপোষকতা এবং ছাত্রীর অভাবে ২০ ডিসেম্বর ১৯১৮ সনের এক ঘোষণায় তিনি তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। একদল লোকের ধারণা ছিল 'বাংলা ভাষায় শিক্ষা দানের ফলে বাংলা দেশে প্রকৃত মুসলমান শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে বরং ক্ষতিই হয়েছে বেশি। উর্দু ভাষা ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের একটি আশীর্বাদ।' বেগম রোকেয়া তার সকল শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে এই নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তোলেন। তিনি বলতেন, 'আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে...তাহাদের জানা উচিত যে তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ি, কিংবা বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে পুতুল সাজিবার জন্য আসে নাই, তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে। তাহারা যেন অন্ন-বস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।'

১৯০৯ সন থেকে ১৯৩২ সন পর্যন্ত অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি স্কুলের দায়িত্ব পালন করেন। আর্থিক সংকট ও সামাজিক বাধা-বিপত্তি দু'হাতে ঠেলে এগিয়ে গেছেন তিনি। বাড়ি বাড়ি থেকে ছাত্রী সংগ্রহ, আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করা, সব মিলিয়ে অবস্থা জটিল। পর্দা ঘেরা গাড়ি করে ছাত্রী আনার ব্যবস্থা করা হলেও সমাজের কত ধিক্কার! তবু নিজ আদল ও কর্মে অটল থেকে পথ হেঁটেছেন তিনি দারুণ সাহসে ও নিষ্ঠায়। নিজ সমাজে বেগম রোকেয়া তার কাজের মূল্যায়ন তখন পেয়েছেন কিনা বড় কথা নয়, কাজটি করতে পেরেছেন এটাই বড় কথা। বার্মার প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় তাকে স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। সরোজিনী নাইডু হায়দারাবাদ থেকে লিখে পাঠিয়েছেন,

...how proud I am when any sister of mine,
Hindu or Muslim come forward to do such patriotic work.

মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কে চেতনা সৃষ্টির প্রয়াসে বেগম রোকেয়া আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম অর্থাৎ মুসলিম মহিলা সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া, বিধবা ও আশ্রয়হীন মহিলাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা, পুরুষের সঙ্গে তুলনায় তাদের সম পারিশ্রমিকের দাবী প্রতিষ্ঠা করা, দরিদ্র কুমারী মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এই সমিতির কাজ ছিল। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বেগম রোকেয়া নিজে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সমিতির আজীবন সদস্য, বেঙ্গল উইমেনস এডুকেশনাল কনফারেন্স এর বিশিষ্ট সদস্য, ডাঃ লুৎফর রহমান এর 'নারীতীর্থ' প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী সদস্য হিসেবে কাজ করেন। আলীগড় মহিলা সমিতি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং কলকাতার স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বেগম রোকেয়ার এই কর্ম প্রবাহ, চিন্তা-চেতনা ও সংগ্রাম কালে ও কালান্তরে সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির এক অনন্য মাইলফলক হয়ে আছে।

অনন্য সাধারণ এই ব্যক্তিত্ব, নিরলস কর্মী এবং সত্য প্রতিষ্ঠার অকুতোভয় সৈনিক বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮০ সনের ৯ ডিসেম্বর এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩২ সনের একই দিনে। রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার প্রত্যন্ত পায়রাবন্দ গ্রামে তার বাড়ি। পিতা জহির উদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। মাতা রাহাতুন্নিসা সাবের চৌধুরী। পিতৃ পুরুষেরা মুঘল আমলে উচ্চ সামরিক পদে চাকরি করেছেন। তারা ষোড়শ শতাব্দীতে ইরান থেকে আসা বাবর

www.pathagar.com

আলী তিবরেজীর বংশধর। তিনি পদব্রজে ভারতে এসে পরবর্তীতে রংপুর পায়রাবন্দ গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সম্রাট আকবরের স্থানীয় প্রশাসক নব নারায়ণের পৃষ্ঠ পোষকতায় সম্রাট প্রদত্ত বিস্তীর্ণ নিষ্কর জমির অধিকারী হয়েছিলেন। জমিদারী এবং ঐশ্বর্যের ব্যাপারে রোকেয়ার রচনায় উল্লেখ আছে, 'আমাদের এ অরণ্যবেষ্টিত বাড়ির তুলনা কোথায়! সাড়ে তিনশত বিঘা লাখেরাজ জমির মাঝখানে কেবল আমাদের এই সুবৃহৎ বাটি'। রোকেয়ারা ছিলেন তিন বোন, দুই ভাই। বিমাতাদের ঘরে ছিল আরো ছয় ভাই, তিন বোন। রোকেয়ার পিতা আবু আলী সাবের ছিলেন নিরলস ও অমিতব্যয়ী। 'সে যুগের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বাসা বাঁধিয়াছিল।' নিজ পরিবারের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবরুদ্ধ পরিবেশ থেকে বেগম রোকেয়া ধারণ করেছিলেন অলৌকিক এক জ্ঞান প্রদীপ। ওই প্রদীপের আলোয় পথ দেখালেন অজস্র নারীকে, বোঝাতে চাইলেন পুরুষ-নারী বৈশিষ্ট্যে কিছুটা ভিন্ন হলেও উভয়ে সমান সাধারণ মানুষ। উভয়েই অধিকার পাবে মানুষের, শিক্ষা দীক্ষা ভাবনা চিন্তা ও কাজ কর্মে। সমন্বিত হবে আপন আপন মহিমায় তাদের সকল কার্যক্রম ও জীবন প্রবাহ। অর্ধাঙ্গ বিকল বন্দি মূর্খ অবরুদ্ধ রেখে উন্নতির আশা নেই।

বেগম রোকেয়ার উল্লেখযোগ্য আরও কিছু বক্তব্য,

'পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজ বন্ধন ছিল না, তখন আমরা এরূপ দাসী ছিলাম না... আমাদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত পুরুষগণ ঐ ধর্ম গ্রন্থগুলিকে 'ঈশ্বরের আদেশ পত্র' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন...

যে সমাজ রাজা ও প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে, পুলিশ প্রভু ও বড়লাট প্রভুর মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সমাজ নারীকে নরের অধীন করিয়াছে...

আমাদের যোগ্য ভবিষ্যৎ বংশ রক্ষার জন্য দুইটি বিষয় দরকারী হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম স্ত্রী শিক্ষার বহুল প্রচার। দ্বিতীয় বাল্য বিবাহ রহিত করা...

ভরসা করি, আমার সুযোগ্য ভগ্নীগণ সকল বিষয়ে আলোচনা করিবেন, আন্দোলনের ভূমিকম্পে দাসত্বের সুকঠিন দুর্গ ভূমিসাৎ করিবেন। আন্দোলন না করিলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিবেন...

পুরুষদিগকেও বলি, ভ্রাতৃগণ! আমরা স্বাধীন না হইলে তোমরাও স্বাধীন হইবে না...তোমরা আমাদের উপর প্রভুত্ব কর বলিয়া তোমাদের উপর আর এক জাতি আধিপত্য করিতেছে...'

বেগম রোকেয়ার আহ্বান বৃথা যায়নি। দিন বদল হয়েছে। উপেক্ষিত নারী আজ সকল ধূম্রজাল ছিন্ন করে স্বীয় মর্যাদায় পুরুষের পাশাপাশি পেয়েছে কর্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার। কারও আধিপত্যও নেই এদেশে। দেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে সুষম সৌন্দর্যের দিকে, উন্নয়নের দিকে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্যে, ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে, নারী মুক্তির লক্ষ্যে এক লড়াকু সৈনিকের ভূমিকায় কোম রোকেয়ার স্বপ্ন আজ আর স্বপ্ন নয়, সত্য। আলোর পথে এই অভিযাত্রা সত্তর নব উন্মেষে উজ্জীবিত হোক বার বার, আমরা উচ্চারণ করি একটি নাম, 'কোম রোকেয়া' অমিত শক্তির উৎস যিনি।

www.pathagar.com

এক অনির্বাণ আলোর শিখা

নয়ন রহমান

পায়রাবন্দ গ্রামের সবুজ প্রকৃতির আঙিনায় যেন ফুলের জলসা বসেছে। নানারকম গাছপালার অন্তরালে পাখির কূজন মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছে। দিনের কর্মব্যস্ততা ও কোলাহল থেমে গেলে রাত্রি হয়ে ওঠে মোহময়ী– আকর্ষণীয়। আকাশ নদীতে তখন বসে চাঁদ তারার মেলা। জোছনার দুধসাদা রং ছুঁয়ে যায় বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, পুকুর-নদী। আর একমুঠো জোছনা যেন জমিদার জহিরউদ্দীন আবু আলী হায়দার সাবেরের বিশাল প্রাসাদের এক কক্ষে বেগম রাহাতুন্নেসার কোলে এসে লুটিয়ে পড়েছে। আনন্দে পরম তৃপ্তিতে দুচোখ জুড়িয়ে যায় রাহাতুন্নেসার। এর আগেও দুপুত্র ও দুকন্যা সন্তানের জননী হয়েছেন। তবু এ কন্যার আগমনই যেন অফুরন্ত আনন্দের। নয় তারিখটি মঙ্গল চিহ্ন বহন করে। আঠারোশ' আশি সন। নয় ডিসেম্বর। কনকনে শীত। মায়ের কোলের উষ্ণতায় কন্যাটি উষ্ণ হয়। উষ্ণ হয় বড় বোন করিমুন্নেসার কোলের উষ্ণতায়। শিশুকন্যা বলে বড় দুভাই ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের বোনকে আদর করার সুযোগ পায়। তারা দুজনেই কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র। তাদের আনন্দ উল্লাসেরও শেষ নেই। তিনশত বিঘা লাখেরাজ জমির উপর এই বাসভবনটি চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। দেশী-বিদেশী বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ জায়গা। নদীর ঘাট, নিজস্ব ঘাট, তিন মহলা পাকা বাড়ি, উঁচু খিলান, মসজিদঘর কি নেই এ বাড়িতে? নেই কোলাহল, নেই উঁচুকণ্ঠে কথা বলা আর অনাত্মীয় এবং আত্মীয় পুরুষের অন্দরে প্রবেশের অনধিকার, আভিজাত্য ও কৌলিন্যের রাঙতায় মোড়া এ বাড়ির কন্যা তা সে পাঁচ বছরেরই হোক বা পঞ্চাশ বছরেরই হোঁক কঠিন পর্দার আড়ালে কাটাতে হয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। আরবী পড় ফার্সী পড় আপত্তি নেই। বাংলা ইংরেজি? হারাম হারাম।

আবু আলী সাবের নিজে জ্ঞান পিপাসু ছিলেন। ফার্সী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল। তাই ছেলেদের ইংরেজি পড়ার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশী স্বজনদের বিরূপ মনোভাবের জন্য কন্যাদের আধুনিক শিক্ষার পথে এগিয়ে দিতে পারেননি। করিমুন্নেসা তাই বলে বসে থাকেননি। ভাইদের সাহায্যে বাড়িতে বসেই লেখা পড়া শিখেছেন।

www.pathagar.com

বাইরের বই-এর সাথে তার পরিচিতি ঘটেছে। কিন্তু ছোট বোনটিও কি তার মত পর্দার অন্তরালে থেকে পাথর চাপা অদৃষ্ট নিয়ে দিন কাটাবে? বোনটি যেমন সুদর্শনা তেমনি বুদ্ধিমতি। ধী শক্তিও প্রখর। সময় পার হয় আপন নিয়মে। ছোট শিশু কন্যাটি পাঁচ বছরে পা রাখলে তার কানে মন্ত্র জপ করার মত বলা হয়, তুমি মেয়ে। তুমি হবে লজ্জাশীলা। পর্দা করবে এখন থেকেই। কারো সামনে বের হওয়া বে-পর্দার লক্ষণ। তুমি কোরআন কিতাব পড়বে। জমিদার বাড়ির কৌলিন্য ও আভিজাত্য রক্ষা করে চলবে। মেয়েটি সেভাবেই চলেছে। পুরুষ তো দূরের কথা আত্মীয় বাড়ির আত্মীয়া, তাদের কাজের বুয়াদের সামনেও বের না হয়ে, আত্মগোপন করে থাকতে হত খাটের নীচে অথবা মাদুরের আড়ালে। তার মন তো মুক্ত বিহঙ্গ। মনের গভীরে অসীম কৌতূহল। তাইত ভাইয়েরা বাড়ি এলে ছোট ছোট পা ফেলে ভাইদের কাছে গিয়ে বলে, আমিও পড়া করব তোমাদের মত। বোনটির বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ সব কিছু জানার অদম্য আগ্রহ ভাইদের মুগ্ধ করে। ভাইরা মুক্ত চিন্তার অধিকারী। বোনরা মুক্ত চিন্তার অধিকারী হোক এ তারা চায়। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ্যেও লঙ্ঘন করতে পারে না। কিন্তু ইচ্ছের ফুল ফুটিয়ে তোলার বাসনাও তো নিবৃত্ত করা যায় না? তাই রাত যখন গভীর হয়, নিঃঝুম হয়ে পড়ে বিশ্ব চরাচর, পরিবারের লোকজন আশ্রয় খোঁজে নিদ্রার কোলে তখন হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় বোনটির পাঠ দান চলে নীরবে নিভৃতে। প্রাথমিক বিদ্যার গণ্ডি পার হয় সাবের পরিবারের এই বুদ্ধিমতি কন্যাটির। এ সময় মা তাকে কলকাতা বেড়াতে নিয়ে এসে এক মেম সাহেবের কাছে লেখাপড়া করার সুযোগ করে দেন। পাথর চাপা হলদেটে দুর্বাঘাস সূর্যের আলো পেয়ে লকলকিয়ে ওঠে। সূর্য শিখায় উদ্ভাসিত হয় কন্যার মনের বাগান। কিন্তু সেমাত্র কিছু সময়ের জন্য। ভাই দু'জন বোনের জ্ঞান পিপাসা মেটাবার পথ খুঁজতে থাকেন। বোনটির বিয়ের কথা ভাবেন তারা। বোনটি ষোল বছরে পা রেখেছে। নিজেদের পারিবারিক স্বচ্ছলতায় তখন ভাঁটার টান। অমিতব্যয় যেমন, তেমন পরিবারের অগণিত সদস্য সংখ্যার জন্য জমিদার সাবেরের মাথা খারাপ হবার দশা তখন। মানসিক দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত সাবের একদিন বিরাগী হয়ে সংসার ত্যাগ করে উধাও হলেন। ভাইরা ভাবলেন বোনটিকে হয়ত কোন কুলীন পাত্রের কাছে পাত্রস্থ করা যাবে। কিন্তু সেই তো আবার পর্দার নীচে জীবন। আলোবিহীন গৃহকোণে অবস্থান। তারা উভয়ে চাইলেন বোনটিকে এক মুক্ত মনের যুবকের হাতে সমর্পণ করতে। অনেক খুঁজে পেতে সে রকম পাত্রের সন্ধান মিললো। যুবক শিক্ষিত, উদারমনা, অগ্রসরমনা– এমন যুবকই তো হতে পারে জ্ঞানপিপাসু বোনের উপযুক্ত পাত্র! যুবকের প্রথম স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান রেখে গত হয়েছে। যুবকের বয়স ৩৮ বছর। এই যুবকের সাথে বোনের বিয়ে সম্পন্ন করতে ভাইয়েরা দ্বিধা করল না। তখন যুবকের ভাগলপুরে বাস। পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ভাইদের ইচ্ছা পূরণ হল। এক নতুন জীবনের স্বাদ পেল তাদের বোন। এ জীবন মুক্ত। শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত। সাখাওয়াত হোসেন স্ত্রীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য একজন গভর্নেস নিযুক্ত করে দিলেন। পুরোদমে ইংরেজি শিক্ষা শুরু হল। ব্যবহারিক ইংরেজি শেখাবার দায়িত্ব নিজে পালন করলেন। এভাবেই শুকনো প্রদীপ শিখার সলতেতে প্রচুর তেল সিঞ্চন হতে লাগল। প্রদীপটি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলো, তা প্রদীপ তো নিজে উজ্জ্বল হয়ে সুখ পায়না? চায় চারপাশটা আলোকিত করতে। এজন্য কি করতে চাও? মনে মনে প্রশ্ন ও জবাবের ডুব সাঁতার চলে অনবরত।

আমি সমাজের অকারণ বন্দীত্ব থেকে নারী জাতিকে মুক্ত করতে চাই।

আমি শিক্ষার উজ্জ্বল আলোয় মনোভূমি আলোকিত করতে চাই।

মুক্তির লড়াইয়ের জন্য কি অস্ত্র আছে তোমার, হে রমণী? আমার কলম আমার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র।

অবশেষে শুরু হল কলমের অব্যাহত লড়াই।

কলমের বদৌলতে বেরিয়ে এল এক গুচ্ছ গ্রন্থ।

www.pathagar.com

অবরোধ বাসিনী, পদ্মরাগ, Sultana's dream-এর মত কালজয়ী গ্রন্থ। এই আত্মবিশ্বাসী নারী সমাজের কুসংস্কার দূর করে নারীকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হবার কথা ব্যক্ত করেছেন। নীতি শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের উপরও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। ইংরেজি ভাষার উপর দখল ছিল প্রচুর। তাঁর রচিত Sultana's dream পড়ে একজন ইংরেজ পণ্ডিত ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন– পুস্তকখানি যেরূপ সুমার্জিত বিশুদ্ধ। ইংরেজিতে লেখা হয়েছে সেরূপ ভাষা আয়ত্ত করা আমাদের অনেক ইংরেজি শিক্ষিত যুবকের পক্ষেও কঠিন। প্রতিটি গ্রন্থে তিনি তীর্যক ভাষায় কখনো ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে সমাজের গলদ কোথায়, স্ত্রীজাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। সাবের পরিবারের এই কন্যাটির ললাটে সুখের তিলক ছিল না। অসমবয়সী, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রুগ্ন স্বামীর সেবা, অকালে দু'দুটি কন্যা সন্তান হারাবার বেদনা তার হৃদয়টাকে দুঃখে কষ্টে জর্জরিত করে রেখেছিল বৈকি। তিনি ব্যক্তিগত দুঃখের কথা এক চিঠিতে এভাবে ব্যক্ত করেছেন। আমার মত দুর্ভাগিনী অপদার্থ বোধ হয় এ দুনিয়ায় আর একটিও জন্মায়নি। বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর সেবা করেছি, ইউরিন পরীক্ষা করেছি, পথ্য রেধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি.....।

কিন্তু ব্যক্তিগত দুঃখবোধই তো বড় কথা নয়; তাঁর প্রাপ্তিও তো কম ছিল না? দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে তিনি খাঁটি হয়েছেন। নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন। কালোত্তীর্ণ হয়ে তাঁর অবদানের জয় পতাকা ঘরে ঘরে যুগ যুগ ধরে উড়েছে– উড়বে অনাদিকাল ধরে। তার দাম্পত্য জীবনের পরিধি ছিল সংকীর্ণ। মাত্র তের বছর। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে স্বামীর দেয়া দশহাজার টাকা সম্বল করে মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে নারী শিক্ষার জন্য খোলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। সপত্নী কন্যাটির দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি ভাগলপুর ছেড়ে চলে আসেন কলকাতা। বৃহত্তর জগত তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটিকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবন আবর্তিত হতে থাকে। এই স্কুলটিই বছরের পর বছর শিক্ষায় আলোকিত করে চলছে অগণিত নারীকে। সমাজের অবহেলিত নারী সমাজের আত্মকর্ম সংস্থানের জন্য সাবের পরিবারের এই বিদূষী কন্যাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম। দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের সাহায্য করা এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই ছিল এর লক্ষ্য।

ক্লান্তিহীন পরিশ্রমে এই মহীয়সী নারীর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ে। তারপর এক স্নিগ্ধ প্রভাতে বিশ্বস্রষ্টার কাছে প্রার্থনা জানাবার শুভ মুহূর্তে অজু সমাপন শেষে তিনি এই ধরাদাম ছেড়ে অনন্তলোকে পাড়ি জমান। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো যেন এই ধরাধাম থেকে সহসাই অপসারিত হয়ে যায়। শোকে মুহ্যমান প্রকৃতি যেন নীরবে চারদিকে বার্তা পাঠায় নেই। নেই সেই উজ্জ্বল তারাটি আকাশের বুক থেকে খসে পড়েছে, সেই জ্বলন্ত প্রদীপটি দমকা হাওয়ায় নির্বাপিত হয়েছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে সেই অকুতোভয় আত্মবিশ্বাসী ও সংগ্রামী এই নারী যেন বাতাসের কানে কানে বার্তা পাঠিয়ে বলছেন, আমি আছি আমি থাকব এই দেশ ও সমাজের প্রতিটি নির্যাতিত নারীর পাশে। যখন একটি মেয়ে শিক্ষার আলোক বর্তিকা হাতে সামনে এগিয়ে যাবে তখন আমি থাকব ঐ আলোর শিখায় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শিখা হয়ে আমি জ্বলব। পথ দেখাব অনন্তকাল ধরে।

সাবের পরিবারের এই অসীম সাহসী উজ্জ্বল নক্ষত্রটির নাম বেগম রোকেয়া, স্বনামে যিনি ধন্য এবং বিশ্বনন্দিত। এক নামে সহস্র দীপ শিখা হয়ে ইনি জ্বলছেন, জ্বলবেন অনাদিকাল ধরে।

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়া ঃ সমালোচনা ও আলোচনার আড়ালে লড়াকু এক অসাধারণ নারীসত্তা

মাসুদ মজুমদার

আজকাল বেগম রোকেয়া চর্চা বেড়েছে। যে তুলনায় রোকেয়া চর্চা বেড়েছে সেই তুলনায় তাকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। খণ্ডিত চর্চার মাত্রাটাই বেশি চোখে পড়ে। সরকারীভাবে রোকেয়া দিবস পালন করা হয়। কেউ কেউ ৯ ডিসেম্বর নারী দিবস পালন করেন। ১৯৩২ সালের এই দিনে তিনি আকস্মিকভাবে মারা যান।

যারা রোকেয়ার ব্যাপারে উৎসাহী তাদের ভেতর দুটো বিপরীত ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদল তাকে নারী জাগরণের পথিকৃৎ ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে তুলে ধরেন। এই ধারার মধ্যে পঙ্কিলতা কম। এরা রোকেয়ার শিক্ষা আন্দোলন ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াকু মানসটার প্রতি প্রাধান্য দেন। যে যুগযন্ত্রণার ভেতর রোকেয়ার জন্ম সেটাকে সামনে রেখে বাঙ্গালী মুসলমান নারীদের উজ্জীবিত করতে আগ্রহ প্রদর্শন করেন। অপর একটি ধারা রোকেয়াকে নিজেদের 'আদর্শ' প্রচার ও প্রসারের মাধ্যম বানাতে চান। বেগম রোকেয়াকে ধর্ম বিশেষত ইসলাম ও হিজাব তথা পর্দা প্রথার প্রতিপক্ষে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চান। এটি অনেকটা রাজনৈতিক শ্লোগানের মত। এর ভেতর রোকেয়া খুঁজে লাভ নেই।

বেগম রোকেয়াকে পুরুষ বিদ্বেষী হিসেবে উপস্থাপন করাও এই মতাবলম্বীদের একটি ধুরন্ধর ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে। এই ছোট নিবন্ধে আমরা প্রথমে রোকেয়া পরিচিতি উপস্থাপন করবো। রোকেয়ার সামাজিক সংস্কার আমাদের আলোচনায় আসবে। তার সাহিত্য সেবার পরিধিটাও আমরা খতিয়ে দেখবো। এর বাইরে আমরা তিনটি নেতিবাচক প্রচারণার মোকাবেলায় একজন প্রকৃত রোকেয়াকে তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

অবশ্য বলতে দ্বিধা নেই, যে দুটি ধারায় রোকেয়া চর্চা হয় তার বাইরে একটি প্রবল ধারা কেন রোকেয়া নিয়ে উৎসাহী হয় না তার স্বরূপও চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হবো। তবে নেতিবাচকভাবে নয় ইতিবাচক অর্থে। সাধারণ আলোচনার আওতার মধ্যে থেকে।

www.pathagar.com

১৮৮০ সালে রোকেয়ার জন্ম। রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামের খ্যাতিমান জমিদার পরিবারের মেয়ে রোকেয়া। পুরো নাম রোকেয়া খাতুন, রুকু নামে তাকে ডাকা হতো। বিখ্যাত সাবের পরিবারের পড়ন্ত জমিদার জহির উদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের তার বাবা। মায়ের নাম রাহাতুন্নেছা। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে চতুর্থ সন্তান রুকু। বড় বোনের নাম করিমুন্নেছা। ছোট বোন হুমায়রা, বড় দু'ভাইয়ের নাম ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের। ১৮ বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয়। তার স্বামীর নাম খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেন, দশ বছরের দাম্পত্য জীবনে তার দু'টো কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছিলেন, দু'টো সন্তানই জন্মের পর পর মারা যায়। ২৮ বছর বয়সে রোকেয়া স্বামী হারান, মৃত্যুকালে তার স্বামী ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

বিয়ের পর রোকেয়া- 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন হিসেবে পরিচিত হন। বোন করিমুন্নেছা এবং ভাই ইব্রাহিম ভালো লেখা পড়া জানতেন, এই দুজনের সহযোগিতায় আরবী ফারসী ও উর্দুর বাইরে তার ইংরেজি-বাংলায় হাতে খড়ি। একটা কথা প্রচলিত আছে রোকেয়ার পরিবারে বাংলা-ইংরেজি একেবারে নিষিদ্ধ ছিলো, এর কোন ভিত্তি নেই। রোকেয়ার বাবা ছিলেন নামজাদা জমিদার। তৎকালীন জমিদার পরিবারগুলোকে বনেদী পরিবার ভাবা হতো। শিক্ষা ও কৌলিন্যে তারা হতেন এলাকার মাথা। সাবের পরিবার এর ব্যতিক্রম ছিলো না। সেই সময় আরবীর চর্চা হতো সকল ধার্মিক পরিবারে। বাংলায় তখনও ব্যাপকভাবে দীন-ধর্ম চর্চা শুরু হয়নি, অনুবাদও তেমন একটা ছিলো না। ফার্সী রাজভাষা, আটশ' বছরের মুসলিম শাসনের জের ধরে পারস্য সমৃদ্ধির ছোয়া নেয়ার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম সকল পরিবারে ফার্সির প্রবেশ ছিলো কৌলিন্যের প্রতীক। জ্ঞানের প্রসার ও প্রচারে ফার্সির ভূমিকা কোনমতেই গৌণ ছিলো না। রোকেয়ার সময়কালটা ছিলো যখন ইংরেজ শাসনের মধ্যযুগ, স্বাধীনতাকামী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পুরো ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আওয়াজ উঠেছিলো। মুসলমান সমাজ ইংরেজ শাসন গ্রহণে বাধ্য ছিলো, কিন্তু সন্তুষ্ট ছিলো না। একজন হিন্দু মুন্সি রাতারাতি ফার্সি ছেড়ে ইংরেজি চর্চায় মনোযোগ দিলেও মুসলিম সমাজের ইংরেজি গ্রহণ বর্জনের বিষয়টি এতটা সাদা-মাটা ছিলো না। ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি ভাষা বর্জনের আন্দোলন তখনও ছিলো তরতাজা। অপরদিকে উপমহাদেশ জুড়ে উর্দুর প্রাধান্য কিভাবে অস্বীকার করা যায়?

এমন একটি প্রেক্ষিত ভাবনায় রোকেয়া পরিবারকে সামনে রেখে বিবেচনা করতে হবে। এই কথা সত্য বাংলা-ইংরেজি সেই বনেদী পরিবারে ঢুকতে কষ্ট হয়েছে, সাবের পরিবারের ঐতিহ্য বাঁধ ভেঙ্গেই রোকেয়ার ভাই-বোন অগ্রসর চিন্তায় নিজেরা সম্পৃক্ত হয়েছে। প্রিয়বোনকেও সম্পৃক্ত করেছে।

তাৎক্ষণিক রোকেয়ার সাহিত্য জীবন গড়ে ওঠেনি। স্বামীর মৃত্যু, স্বামীর আগের ঘরের সন্তানদের হাতে নিগৃহীত জীবন তাকে কিছু কঠিন ও রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি করে। ভাই-বোনের হাতে খড়ি, স্বামীর সান্নিধ্যে অনুশীলনের সুযোগ তাকে জীবনবোধ সম্পর্কে ভাবতে সাহায্য করে। তার সাথে যুক্ত হয় তার গুণাবলী এবং প্রতিভা, সবকিছু মিলে রোকেয়া দুটো বাস্তব সত্য উপলব্ধি করেন। প্রথমত তিনি ভাবতে বাধ্য হন নারীশিক্ষা ছাড়া সমাজ বদল সম্ভব নয়, এবং পশ্চাৎপদ থেকে মুসলিম জাতির জন্য শিক্ষাই একমাত্র উপায়। দ্বিতীয়ত তিনি অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝলেন ঘুমন্ত জাতি ও নিগৃহীত নারীকে জাগাতে হলে কলমের মাধ্যমে প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে। আবেদন নিবেদনের ভাষায় নয়, চাবুকের আঘাতের মত শব্দাঘাত করতে হবে। সেই আঘাত করতে হবে নির্মমভাবে।

www.pathagar.com

স্বামীর মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় রোকেয়া ৫ জন ছাত্রী নিয়ে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করতে সক্ষম হন, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ তাকে ভাগলপুর ছাড়তে বাধ্য করে। ১৯১০ সালে তিনি কোলকাতায় চলে যান, এক বছর পর ১৬ মার্চ ৮ জন ছাত্রী নিয়ে কোলকাতার অজো গলিতে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' চালু করার এক দুঃসাহসী কাজে হাত দেন। কর্মজীবনে তিনি প্রচুর বাহবা পেয়েছেন, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা উপহাসও তাকে কম যাতনা দেয়নি, তারপরও তিনি থেমে থাকেননি।

নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝলেন মেয়েদের একটি সামাজিক সংগঠন ছাড়া ইতিবাচক কাজ করা কষ্টকর। ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতনে ইসলাম' নামে ইসলামী নারী সমিতি বা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন। রোকেয়ার জীবনে এই সংস্থাটি ছিলো সন্তানতুল্য, এর মাধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কারক হিসেবে মুসলিম মেয়েদের জন্য একটি আঞ্জুমান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার পক্ষ থেকে একটি জনপ্রিয় শ্লোগান ছিলো অবরোধ এবং অশিক্ষার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। আঞ্জুমান ও স্কুল ছিলো তার মিশন বাস্তবায়নের দু'টি মাধ্যম, এবং সোচ্চার করার হাতিয়ার।

অনেকেই তার অবরোধ বিরোধী আহ্বানকে পর্দা ও হিজাবের বিরুদ্ধে আহ্বানের সমর্থক ভেবেছেন। এটি একটি ভুল ধারণা এবং মিথ্যা ও মতলবী প্রচারণা। রোকেয়া নিজে হিজাব রক্ষা করে চলতেন, ছাত্রীদের সেই পরিবেশ সংরক্ষণের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতেন। যে ভ্যানে করে তার ছাত্রীরা যাতায়াত করতো সেটি পর্দা দিয়ে আবৃত ছিলো। যে ছবিটি দিয়ে রোকেয়াকে পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে কিংবা বিপক্ষে দাঁড় করানো হয় সেটি তার ঘরোয়া ছবি। যে বিদূষী মহিলা পশ্চিমা সভ্যতার উলঙ্গপনাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন, ইসলামী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, জ্ঞান অর্জনের ফরজ দাবীকে বলিষ্ঠ ভাষায় উপস্থাপন করেন; তাকে রাজনৈতিকভাবে ভিন্নমাত্রায় ব্যবহার দুঃখজনক। তিনি কার্যত; অজ্ঞতা ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে ঘরে বসে থেকে অবরুদ্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের গ্লানি বহনের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন।

যে রোকেয়া ইংরেজিতে তার নাম লিখতেন 'রুকাইয়া খাতুন' ইসলামের সোনালী যুগ যার বক্তব্যের উপমা হতো। তাকে ইসলামের প্রতিপক্ষে ব্যবহার তার প্রতি রীতিমত একটি জুলুম। তবে এই কথা সত্য তিনি তার বক্তব্য ও সাহিত্যকর্ম ওয়াজের ভাষায় উপস্থাপন করেননি। তীক্ষ্ণ-তীব্র জোরালো ভাষা ও যুক্তি ছিলো তার ভাষার বৈশিষ্ট্য। রূপকভাবে কাহিনী উপস্থাপন ও উপমার সাহায্যে তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন, অধঃপতিত সমাজকে জাগাতে অনেক মুসলিম লেখক চাবুকের মত কশাঘাত করেছেন। রোকেয়া নজরুলের মত 'দ্রোহ' ইকবালের মত অভিমান কিংবা ফররুখ-এর মত রূপক হতে পারেননি এটা হয়তো তার সীমাবদ্ধতা, শক্তি মানসের সাথে তুল্য বিবেচনায় অক্ষমতা, যা অন্যরা সাহিত্য মান দিয়ে ঢেকে দিতে পেরেছেন সেই ক্ষেত্রে রোকেয়া সরাসরি, প্রত্যক্ষ এবং ক্ষেত্র বিশেষে দুর্বিনীত ও এটা তার সাহিত্য রচনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ ধারা, এটিকে তার সাহিত্য বিচারের জন্য হয়তো বিবেচ্য বিষয় ভাবা যেতে পারে; কিন্তু কর্মী রোকেয়া বাঙ্গালী মুসলমান নারীদের জন্য একটি সাহসের উপমা-সেই ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য শতভাগ ইতিবাচক।

দু'খণ্ডে মতিচূর, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, রসনা-পূজা, ঈদ সম্মিলন, সিসেম ফাঁক, চাষার দুক্ষু, এণ্ডি শিল্প, রাঙ ও সোনা, বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি, লুকানো রতন, রাণী ভিখারিণী, উন্নতির পথে, বেগম তরজির সহিত সাক্ষাৎ, সুবেহে সাদেক, ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম, হজের ময়দানে, বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল, নারীর অধিকার, ভ্রাতা-ভগ্নী, তিন কুঁড়ে, পরী ঢিবি, বলিগর্ত্ত, পঁয়ত্রিশ মণ খানা, বিয়ে পাগলা বুড়ো, সুলতানার স্বপ্ন-প্রভৃতি তার গল্প উপন্যাস এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমষ্টি। ওর বাইরে তার অসংখ্য কবিতার কথা জানা যায়।

www.pathagar.com

যে মহিলা ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ স্বামীর স্মৃতি রক্ষায় মহৎ প্রাণ, তাকে কেন পুরুষ বিদ্বেষী ভাবা হবে? তার সাহিত্যে এর কোন প্রমাণ মিলে না, অভিমানী সুরে নারীদের প্রতি কশাঘাত হানতে তিনি পুরুষকে কোথাও ছোট করতে চাননি, বরং নারীদের লাঞ্ছনার জন্য নারীদেরকেই দায়ী করেছেন, তার সমগ্র সাহিত্য জুড়ে নারীই প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজ ও নারী ভাবনায় ব্যথাতুর এই মহৎ প্রাণ পুরুষ নিয়ে ভাবনার গরজ যেমন বোধ করেননি, তেমনি বিদ্বেষ ছড়াবার ফুসরতও পাননি। যারা তার সাহিত্য থেকে বিভ্রান্তদের মত আয়াতাংশ তুলে এনে বিভ্রান্তি ছড়াবার কাজটি করেছেন, একই পদ্ধতিতে বিভ্রান্ত কুড়িয়ে যারা নিজেদের ভাগ্য গড়তে চান, তারা রোকেয়াকে ছোট করেন না, নিজেরাই ছোট হয়ে যান, বিভ্রান্তির জালে নিজেদেরকেই জড়িয়ে নেন।

আবেগ এবং উপলব্ধিকে এক জায়গায় এনে বুঝতে হবে বেগম রোকেয়া আমাদের সামনে একমাত্র উপমা নন, অনুকরণ ও অনুসরণের একমাত্র মহিয়সী মহিলা নন, তবে আমাদের চলার পথে সামাজিক অর্গল ভেঙে কুসংস্কার মুক্তির লক্ষ্যে তার আহ্বানটি কোনভাবে ক্ষুদ্র ছিল না। সময় ও কাল বিবেচনায় সেটি অবশ্যই বাংলার নারীদের জন্য চোখ মেলে দেখার, মন খুলে বুঝার মত ছিলো এতে কোন সন্দেহ নেই, থাকা উচিত নয়।

রোকেয়ার সাহিত্য বিচার এই নিবন্ধের আসল প্রমাণ নয়। তারপরও বলবো সাহিত্যিক রোকেয়ার চেয়ে কর্মী-রোকেয়া সকল ক্ষেত্রে বড় নয়, কারণ যে ক্ষেত্রে রোকেয়া সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতা সময়ের মানে উৎরে গেছে। সেক্ষেত্রে কর্মী রোকেয়ার চেয়ে সাহিত্যিক রোকেয়া বড় হয়ে ধরা পড়েন। তাই কারো প্রতিপক্ষে কিংবা স্বপক্ষে রোকেয়াকে মূল্যায়ন অর্থহীন, খণ্ডিত মুল্যায়ন তো এক ধরনের নৈতিক স্খলন বা অপরাধ। অতীত থেকে অর্জনে আজ তুষ্টি, বর্জনে থাকে এক ধরনের দারিদ্র্য। এই সময়ের মূল্যায়নে রোকেয়াকে তার সময় ও আহ্বানে রেখে বিচার করলে আমরা এমন একজন রোকেয়াকে পাবো যাকে প্রগতিশীলরা ধর্মান্ধ ভাববেন, মৌলবাদী বলে গালি দেবেন, অথচ সেই মুহূর্তে তিনি অনেকের কাছেই হাস্যস্পদ হয়েছিলেন। সামগ্রিক রোকেয়া চরিত্রকে এইভাবে দেখাই উত্তম। এতে নিন্দা ও সমালোচনার আড়াল থেকে অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার জাল থেকে প্রকৃত রোকেয়া বেরিয়ে আসবেন– যে রুকুকে আমাদের প্রয়োজন, যে রোকেয়া কিংবা রুকাইয়া খাতুন আমাদের সামগ্রিক দৈন্যের ভেতর অহংকার হয়ে সামনে দাঁড়াবেন।

ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কুরআনের অনন্য ধারাভাষ্যকার মুজাদ্দিদ, মহান বীরপুরুষ তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ, "বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রঃ) প্রণীত তাফসীর **"রাসালায়ে নূর"**-এর **"আল-কালিমাত"** প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনায় ঃ প্রিন্সিপাল কামালুদ্দিন জাফরী। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে।

যোগাযোগ ঃ
২৪৫, পূর্ব কাফরুল
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১১০৭৮২৭৩

প্রাপ্তিস্থান ঃ
আহসান পাবলিকেসন্স
বাংলাবাজার, কাটাবন, মগবাজার।

www.pathagar.com

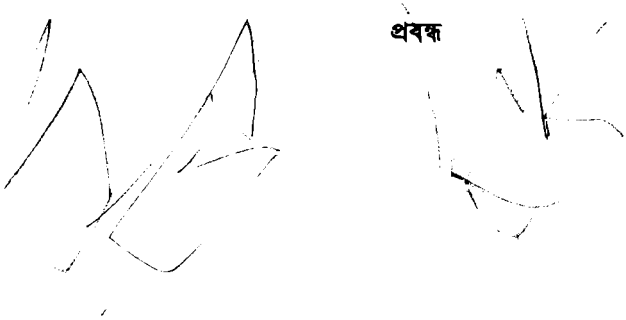

প্রবন্ধ

বেগম রোকেয়ার ব্যাঙ্গাত্মক রচনা

শামসুন নাহার জামান

যে হাস্যরসের আঘাত তীব্র, তীক্ষ্ণ চাবুকের মতো এবং যাতে নির্মল আনন্দময়, হাসি অপেক্ষা অন্তরবেদনার কারণ বর্তমান থাকে, তাকে Satire বলে। বাংলায় Satire কে ব্যঙ্গরস বলা হয়।

এক ধরনের ব্যঙ্গ রচনায় ব্যক্তি বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্য নয়, আক্রমণের মূল লক্ষ্য কোন সামাজিক বিচ্যুতি, কাপট্য; অসাধুতা, মিথ্যা অহমিকা, বড়লোকের মোসাহেবী করবার প্রবৃত্তি প্রভৃতি। ব্যঙ্গ রচয়িতা এসব বিচ্যুতিকে আক্রমণ করে সমাজকে উন্নত করতে চান, সার্বিক মনোবিদ্বেষ প্রচার তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

নির্মমভাবে সে হাসির চাবুক; মনকে সচকিত করে মানুষের দোষত্রুটি সম্পর্কে সজ্ঞান করে–তাই ব্যঙ্গরস। ওপরে হাসির প্রলেপ, আর তলে থাকে উপহাসের জ্বালা। Satirist কে তাই অনেকে Sadist বলে থাকেন, কারণ মানুষকে বেদনা দেওয়াও Satirist-এর একটি অন্যতম কাজ। Satire এ অনাবিল হাস্যরস থাকে না, উদ্দেশ্যমূলকভাবে লেখক একটা আঘাত হানেন, এই উদ্দেশ্যমূলক আঘাতই হলো স্যাটায়ারের প্রাণ। লেখক ভ্রান্ত ও পতিতকে সতর্ক করে দেন আঘাত হেনে, দোষত্রুটি হাসির ছলে অথচ নির্মমভাবে দেখিয়ে দেন, সমাজ ও সংসারকে সংশোধনের একটা প্রচ্ছন্ন, কখনো বা স্পষ্ট চেষ্টা থাকে Satire-এ।

ইংরেজী সাহিত্যেরও সংজ্ঞা একই। A composition in prose or verse, Conveying sensorions criticism of human frailty. Its chief purpose is ethically or aesthetically corrective. It is generally motivated by a desire to reform. It is a powerful weapon in the hand of a writer. ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ রচয়িতাদের মধ্যে রয়েছেন ড্রাইডেন, সুইফট, স্যামুয়েল বাটলার, আলেকজান্ডার পোপ প্রমুখ।

তবে সব সময় ব্যঙ্গ রচয়িতাগণ এই উন্নত আদর্শ রক্ষা করতে পারেননি। কখনো কখনো তাদের ব্যঙ্গের মধ্যে অশোভন তীব্রতা এবং বিদ্বেষের প্রকাশ তাদের রচনার শৈল্পিক মানকে ক্ষুণ্ন করেছে। কালের পরিক্রমায় এর পরিবর্তন হয়েছে। একজন লেখক সমাজেরই একজন, তাই

www.pathagar.com

তাকে অবশ্যই সমাজ সচেতন হতে হবে। সমাজের অভ্যন্তরে সংঘটিত অসামাজিক আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনাকে অত্যন্ত রসালো ভাষা ও তির্যক বাক্যবানে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করতে শুরু করেন। লেখনীর মাধ্যমে তিনি সমাজকে কশাঘাত করে উদ্দীপ্ত ও সচেতন করে তুলতে চান। ফলে এই সমস্ত ব্যঙ্গাত্মক ও রসরচনা সমাজের দর্পণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

বেগম রোকেয়া একজন সমাজ-সচেতন লেখিকা। নারীজাতির অধঃপতনের কারণগুলো লেখিকার মনে আলোড়ন তুলেছিল। সেই ক্ষোভ ও বেদনাবোধ থেকেই সৃষ্টি হয় ব্যঙ্গোক্তি। সমাজের এই দুষ্ট ক্ষতগুলোকে লেখনীর তীব্র কষাঘাতে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক চিত্রসমূহের অন্তরালে বেগম রোকেয়ার সমাজ-সংবেদী-মনের সহানুভূতির ধারা প্রবহমান।

অবরোধ প্রথার বিভীষিকা, পর্দার নামে অমানবিক অবরোধ প্রথা, স্ত্রী শিক্ষা বিরোধী মনোভাব এবং সমস্ত প্রকার সামাজিক গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে মসী ধারণ করে তিনি আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

লেখিকার বেশ কয়েকটি গল্পধর্মী ব্যঙ্গাত্মক রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে। এ সমস্ত রচনার মধ্যে ভ্রাতা ভগ্নী, তিন কুঁড়ে, পরীচিবি, বলি গর্ত, পয়ত্রিশমন খানা, বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জনাব আবদুল কাদির তাঁর রোকেয়া রচনাবলী গ্রন্থে এই রচনাগুলিকে স্যাটায়ার বলে গণ্য করেছেন। শুধুমাত্র গল্পরস সৃষ্টি নয়, এই সমস্ত রচনার রস নিষ্পত্তি ঘটেছে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে। এগুলো ছোটগল্পের আদলে রচিত হলেও সাহিত্য বিচারে এই বিচিত্রধর্মী রচনাসমূহকে ছোটগল্প বলে অভিহিত করা সমীচীন হবে না। বেগম রোকেয়ার যে সমস্ত লেখায় ব্যঙ্গ অর্থাৎ রঙ্গরস বা কৌতুকের দিকটাই মুখ্যস্থান অধিকার করে, সেই সমস্ত রচনাকেই সাহিত্য বিচারে রঙ্গ বা ব্যঙ্গ রচনা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

'ভ্রাতা ভগ্নী' রচনাটি বিধবা মায়ের ভরণ-পোষণ ও সেবা-যত্নকে কেন্দ্র করে স্ত্রীশিক্ষা বিরোধ ও গোঁড়া মতাবলম্বী কাজেবের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার আলোক প্রাপ্তা তাঁর দুই বোন সিদ্দিকা ও সুফিয়ার কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত। সমাজে দুই বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব আছে। একদল উন্নতি তথা পরিবর্তনের পক্ষে, অপরদল এর বিপক্ষে। এই সমাজ-বাস্তবতার স্বীকৃতি দিয়ে বেগম রোকেয়া রচনাটি শুরু করেছেন এইভাবে ঃ সাধারণত দুই মতের লোক দেখা যায়। একদল উন্নতি চাহে, পরিবর্তন চাহে; অপর দল বলে, "আমাদের যাহা আছে, তাহাই থাকুক, পরিবর্তনের কাজ নাই।" প্রথমোক্ত দলকে আমরা উদার মতাবলম্বী এবং শেষোক্তকে রক্ষণশীল বা গোঁড়া বলিব। অধিকস্থলে আমাদের ভ্রাতৃগণ উদার মতাবলম্বী এবং ভগ্নীদল রক্ষণশীল হইয়া থাকেন। ক্রমে কালের বিচিত্র গতির আবর্তনে এখন কোন কোন স্থলে তাহার বিপরীত অবস্থাও দেখা যায়। অর্থাৎ ভ্রাতা সেই 'সেকেলে গোঁড়া' আর ভগ্নী নববিভায় আলোকিতা।

মায়ের অসুখ বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ু পরিবর্তন যখন অত্যাবশ্যক ভাই কাজেবের এই ব্যাপারে গড়িমসি মনোভাব দেখে কন্যা সিদ্দিকা উৎকণ্ঠিত হয়ে তার মামাতো ভাইকে চিঠি লিখেন। গোঁড়া মতাবলম্বী কাজেব তা উদার মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। তাঁর কাছে পর্দার খেলাপ, বেহায়া বেগয়রতের কাজ। বোন সিদ্দিকার তাই শ্লেষোক্তি– 'আমার পত্রের ভাষা একপ্রকার এবং ভাব অন্যপ্রকার ছিল, তাহা জানিতাম না। তোমরা ভাষা ছাড়িয়া কেবল ভাবটা পাঠ করিয়াছ, বেশ। কিন্তু আমি জানি, আমার ভাব, ভাষা, আমার স্বাক্ষর সবই আমার নিজের এবং একই প্রকার। ..... আমি তো সকলকে সহোদরের মত মনে করি যদি তোমাকে পত্র লিখা দূষণীয় না হয়, তবে তাঁহাকে পত্র লিখিলে দোষ হইবে কেন?

আর এক বোন সুফিয়ার বক্তব্য ঃ

www.pathagar.com

মা অসুস্থ হলে তাঁর বায়ু পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলেও কাজেব বছর বছর মাকে দেশ-বিদেশের হাওয়া খাওয়ানোর বিরোধী। মায়ের সেবা-যত্নের ব্যাপারে কাজেবের অবহেলাকে ব্যঙ্গ করে সুফিয়া বলেন ঃ 'মাতাকে তোমরা স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে যাইতে দিবে না, বেশ! মাতার অসুখে তোমরা আর ব্যথিত হইবে কেন? প্রবাদ আছে। 'পুত্রের স্নেহ ততদিন পর্যন্ত, যে পর্যন্ত সে স্ত্রী লাভ না করে, আর কন্যার স্নেহ কখনও হ্রাস হয় না।' তোমরা এখন ক্ষমতাশালী বড় লোক তোমাদের নিকট মাতা একজন সামান্য 'অবোধ মেয়ে মানুষ' মাত্র।

এইভাবে তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে ভ্রাতা ভগ্নী রচনাটি শেষ হয়েছে ভাই কাজেবের প্রত্যুত্তরে সিদ্দিকা ও সুফিয়ার বক্তব্যগুলো অত্যন্ত শাণিত ও ধারালো, লেখিকা নিজে রক্ষণশীলতার বিরোধী ও উদার মতের অনুসারী ছিলেন। গল্পাংশের সর্বত্র গল্পরস অপেক্ষা শ্লেষ ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সংলাপই বেশি।

'তিনকুড়ে' ১৯২৬ সালে বার্ষিক সওগাতে প্রকাশিত হয়। লেখিকা তিনকুড়ের প্রতীকে বাঙালি মুসলমানদের অলসতা ও কর্মবিমুখতার প্রতি কটাক্ষ হেনেছেন।

রাজবাড়িতে বহুদিন থেকে আশ্রিত আসল তিন কুড়ের জীবন প্রণালী বর্ণিত হয়েছে। এরা এত অলস যে লঙ্গরখানা থেকে খাবার এনে দিলে তারা শুয়ে শুয়েই খেয়ে নিত। এদের আরাম আয়েশ দেখে নকল অলসদের দুর্বুদ্ধি এলো, তারাও ঐভাবে শুয়ে বসেই খাবে। কুঁড়ের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এতগুলো লোককে বসিয়ে খাওয়ানো, রাজাবাহাদুর চিন্তায় পড়লেন। মন্ত্রীর পরামর্শে ওদের আস্তানায় আগুন দেয়া হলো–যত কুড়ে প্রাণ বাঁচাতে উঠি পড়ি মরি করে ছুটে পালালো। কিন্তু সেই তিন কুড়ে আগুনের উত্তাপ কোথা থেকে আসছে এ ওকে চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করছে তবু-ওঠার নাম নেই। আগুন থেকে পরে তিনজনকে উদ্ধার করা হলো। রাজা বুঝলেন এই তিনজনই আসল কুড়ে।

গল্পের এখানে শেষ হলেও লেখিকার বক্তব্য এখানে শুরু– তিনকুড়ের প্রতীকে বাংলাদেশের প্রায় পৌনে তিনকোটি মুসলমানের অলসতা ও কর্মবিমুখতাকে কটাক্ষ করেছেন। লেখিকা বলেন ঃ শুনতে পাই, বাঙালি মুল্লুকে নাকি প্রায় তিন কোটি মুসলমানের বাস। এরা সেই তিন কুড়ে নড়া-চড়া, চলা-ফেরা কিছু করেন না; কেবল কুম্ভকর্ণের মত শুয়ে শুয়ে ঘুম পাড়েন। গত এপ্রিল মাসে যখন কলকাতায় তথা সারা বাঙ্গালায় দাঙ্গা হাঙ্গামার আগুন ভীষণ বেগে জ্বলে উঠলো, তখন সেখানে যত নকল কুড়ে ছিল, তারা সবাই গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে উন্নতির চেষ্টায় লেগে গেল, কিন্তু আমরা তিন কোটি কুড়ে সেই পূর্বের মতই পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছি।

পরীটিবি ঃ পরীটিবি উর্দু পত্রিকা থেকে অনূদিত হয়েছে। পরীটিবি 'গল্পধর্মী একটি কৌতুক রচনা। 'পরীটিবি' নাম শুনলেই শৈশবে শোনা রূপকথার দৈত্য, পরী এবং পরীস্থানের কথা মনে পড়ে। আর Witches Hill-এর অর্থও 'যাদুকরী পাহাড়' সুতরাং এই নামের কারণ অনুসন্ধান করার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই মনে জাগে। শফীক ও শহীদ দুই বন্ধু। পাহাড়টির 'Witches Hill' নামকরণের উৎস কি? এই ব্যাপারে একদিন শহীদের সঙ্গে শফীকের মহা তর্কযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তর্কের বিষয় এই ছিল যে, ঐ উঁচু ক্ষুদ্র পাহাড়ে কোনকালে দৈত্যপরী অবস্থান করতো কিনা এবং এখনও কি পরীটিবিতে পরী বাস করে? অনেকক্ষণ তর্কের পর ধার্য হল যে, পরদিন খুব সকালে পরীটিবিতে বেড়াতে যাওয়া যাক এবং এমন কোন অন্ধকার গুহার সন্ধান পাওয়া যায় কিনা যার সাহায্যে পরীস্থানে যাওয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত দুই বন্ধু পরীস্থানে গিয়ে পরীদের সংগে আনন্দ উপভোগ করেছে। পরে অবশ্য রহস্য উদঘাটিত হল যে পরীরা সত্যিকারের পরী নয়। তারা রকউড কলেজের ছাত্রী। "ফ্যান্সী ড্রেস পিকনিক' উপলক্ষে তারা আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেছে। শফীক ও শহীদ ছদ্মবেশধারিণী পরীদের আসল পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হন। তাদের পরীটিবি ভ্রমণ সার্থক হল।

www.pathagar.com

'পরীটিবি' লেখিকার কোন মৌলিক রচনা নয়, এটি অনুবাদ। অনুবাদটি স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল হয়েছে। পুরুষ ও নারীর সহজ এবং স্বাভাবিক মেলামেশাকে এই কৌতুকধর্মী রচনায় নিন্দার চোখে দেখা হয়নি। নারী ও পুরুষের সহজ এবং স্বাভাবিক মেলামেশা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক। লেখিকা উদারপন্থী, বিষয়বস্তু লেখিকাকে আকৃষ্ট করেছে। তাই তিনি রচনাটি অনুবাদ করেছেন। লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গি কাহিনীটিকে রস রচনায় উত্তীর্ণ করেছে।

বলিগর্ত্ত ঃ রচনায় জনপদ ও জনজীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা মনোরম। বাংলাদেশের হাজারো গ্রামের একটি গ্রাম বলিগর্ত্ত। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সে গ্রামের জনসাধারণ অতিষ্ঠ। জমিদার খাঁ বাহাদুর কশাইউদ্দীন খটখটের চরিত্রের যে পরিচয় আমরা পাই তা বাঙালি সমাজে দুর্লভ নয়। লেখিকা বলেন, 'মি. খটখটে পরম ধার্মিক দিবানিশি কোরআন, হাদীস, তাফসীর এবং তসবীহ লইয়াই থাকেন জমিদারী না দেখিলেই নয়, তাই অতটুকু সাংসারিক কাজ করেন। মুসলমান ধর্মীয় শাস্ত্রে সুদ প্রদান করা এবং গ্রহণ করা উভয়ই সমান পাপ। দরিদ্র প্রজাবৃন্দ অন্যত্র টাকা ধার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ধার করে। তিনি অতি উচ্চহারে সুদ গ্রহণ করেন; কারণ শাস্ত্রে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ; সুতরাং ধর্ম বিনিময়ে সুদ লইতে হয়, ধর্ম কি এমন সস্তা যে, তাহা অল্পমূল্যে বিক্রয় করা যায়?'

খাঁ বাহাদুর কশাইউদ্দীন খটখটের জমিদারী এলাকায় প্রচলিত অবরোধ প্রথাও ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এ সম্পর্কে লেখিকা এক হৃদয়স্পর্শী বিবরণে উল্লেখ করেন, 'পূণ্যশ্লোক খাঁ বাহাদুর অবরোধ প্রথার ঘোর পক্ষপাতী। একবার চিকিৎসার নিমিত্ত তিনি গুপ্তপুরে সপরিবারে আসিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার কিশোরী বিধবা ভগিনী এবং কতিপয় ভগিনেয়ী আবদার করিল যে, তাহাদিগকে একবার বাড়ির মোটর গাড়িতে করিয়া গুপ্তপুর শহরটা দেখাইয়া আনিতে হইবে। অগত্যা মোটর গাড়িটা মোটা বোম্বাই চাদরে সম্পূর্ণ জড়াইয়া তাহার ভিতর বিবিদের বসাইয়া সমস্ত শহর ঘুরাইয়া আনা হইল। বেচারীগণ আবছায়ার মত সামান্য সূর্যের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় নাই।'

জমিদার কশাইউদ্দীন খটখটের চার স্ত্রী গ্রহণ সম্পর্কিত মনোভাবকে কঠোর ভাষায় ব্যঙ্গ করে লেখিকা বলেন, খাঁ বাহাদুর স্বয়ং তিন স্ত্রীর ভারবহন করিতেছেন; চতুর্থ স্ত্রীর স্থান বিদার্ভ করিয়াছিল; একটি অসামান্য রূপসী জমিদার কন্যার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত; কোন কোন দিন তিনি সুরার মত্ততায় বোতল হস্তে গুপ্তপুরের পথে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। দুষ্ট লোকেরা সেই কথাটুকু উপরোক্ত জমিদার গৃহিণীকে বলিয়া দেয়। ফলে সে বিবাহ ফসকাইয়া গেল।

জমিদার কশাইউদ্দীন খটখটের পরিপূরক চরিত্র দেওয়ান জাহেরদার ফরফরে। তিনিও ভাই এর ন্যায় বকধার্মিক। শরিয়তের অতি তুচ্ছ কিংবদন্তীও তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করেন– তাঁহার মতে মানুষের ফটো তোলা পাপ কার্য। .....একদা তিনি এক অনাথ আশ্রমে বঙ্গের লাটবাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লাটবাহাদুর বিদায় লইলে পর তাঁহার কতিপয় বন্ধু লাটসাহেবের সহিত তাঁহাদের একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করায় মি. ফরফরে বললেন, 'তাই তো ভাই, এমন প্রয়োজনীয় কথাটা আমাকে একটু পূর্বে স্মরণ করাইয়া দিলে না। সমস্ত কার্যই হইয়া গেল, শুধু এই অত্যাবশ্যক কাজটি বাদ পড়িল। .....তাঁহার এই উক্তি শ্রবণে জনৈক দুষ্টবুদ্ধি লোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া উপস্থিত সমস্ত ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এতদিন আমরা জানিতাম যে, আমাদের বন্ধুবর মি. ফরফরের মতে মানুষের ফটো তোলা বেজায় অমার্জনীয় পাপ। কিন্তু আমাদের সে বন্ধুবরের মতেই দেখিতেছি যে, লাটসাহেবের ফটো তোলায় কোন পাপ নাই, বরং উহাতে পূণ্যার্জনই হয়।

www.pathagar.com

এরূপ অনেক দৃষ্টান্তই লেখিকা হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যার মধ্যে সমাজের এসব অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে একটা চাপা ক্ষোভ প্রচ্ছন্ন ছিল। যা স্যাটায়ারের রসরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লেখিকা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ভাষায় তৎকালীন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে জমিদারের অত্যাচার নির্যাতন, অত্যাচারী জমিদার ও তদীয় দোসরের চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন এবং বলি-গর্ত্তের প্রতীকে জমিদারী প্রথার নিষ্পেষণে জর্জরিত গ্রাম বাংলার চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে অঙ্কন করেছেন। বলিগর্ত্ত রস-রচনার এখানেই সার্থকতা।

পঁয়ত্রিশ মণ খানা ঃ বাংলার মুসলমান সমাজে আশরাফ ও আতরাফে তথা উঁচু-নীচুর ভেদ-বৈষম্য; ধর্ম পালনের নামে অধর্ম আচার অনুষ্ঠান ও সামাজিক পরিবেশে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া লেখিকাকে 'পঁয়ত্রিশ মণ খানা' রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে।

পবিত্র ১১ই শরীফ [অর্থাৎ রবিউস সানি চাঁদের ১১ই তারিখে] লেখিকা মল্লিকপুরে গিয়েছিলেন। এই সময় আশরাফ আতরাফ নির্বিশেষে সকলে একাসনে এমন কি একই বাসনে ভোজন করে। এরূপ একটা মিলনের দৃশ্য দেখার তার ইচ্ছা।

ভোজনকালে খাবার-লুটের সে দৃশ্য লেখিকার চোখে পড়ে, তা তিনি বিদ্রূপাত্মক ভাষায় বর্ণনা করেছেন, "মন ভরা ডেগের পর ডেগ নাচিতেছে; বাবু চির্গণ সকলকে দুই হাতে খানা বিতরণ করিতেছে। তথাপি আতরাফ নরনারী গৃহিনী–শকুনির মত ডেগের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুহাতে খানা লুট করিতেছে। .....শেষে বাবু চির্গণ ক্লান্ত হইয়া দোহাই দিল যে, মোতওয়াল্লি সাহেবগণ আসিয়া না দাঁড়াইলে তাহারা ডেগের ঢাকনা তুলিবে না। তাঁহারা আসিয়া পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া ডেগ ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাড়া হুড়া খাইয়া পুরুষেরা সরিয়া পড়িল। কিন্তু আতরাফ বীর নারীগণ মোতওয়াল্লিদের বগলের নীচ দিয়া যাইয়া যে কোন নোংরা বাসনে ডেগের খানা লুটিতে লাগিল। এক একবার খাদেমগণ তাহাদের বাসন কাড়িয়া লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে–বীরবালা আবার সেই কাদামাখা বাসন কুড়াইয়া লইয়া খানায় ডুবাইয়া দিতেছে।" কী কুৎসিত এই খানা লুটের দৃশ্য! সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে পঁয়ত্রিশ মণ খানা দেখতে দেখতে লুট হয়ে গেল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্যও কি এতে ক্ষুণ্ন হয়নি?

আশরাফদের উন্নাসিক মনোভাব ও আতরাফদের কাছ থেকে ব্যবধান বজায় রাখার প্রচেষ্টার জন্য সহজ ও স্বাভাবিক মানব-সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এর ফলে এই বীভৎস মিলন।

'পঁয়ত্রিশ মণ খানা' এখানেই শেষ নয় লেখিকা শিয়ালদহ স্টেশনে এক মওলা আলীর দরগাহে শুয়ে স্বপ্ন দেখলেন এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ একটি মিছিলে পাঁচ ধরনের লোক তাঁর চোখে পড়লো– সকলে অদৃশ্য হইলে তিনি এক পথিককে এই পার্থক্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন– তার বর্ণনায় জানা গেল– '১নং মিছিলে গেলেন দেশের যত পীর-মোরশেদ, যথা গাজী, মাজার সত্যপীর ইত্যাদি। দেশের লোকে তাঁহাদের পূজা করে, এইজন্য তাঁহাদের এত সমৃদ্ধি। ২নং মিছিলে যত আউলিয়া ছিলেন, দেশের লোকে তাঁহাদের পূজা করে; দেখ না, এখানে এক দরগাহ, সেখানে এক দরগাহ, তবে প্রথমোক্তদের চেয়ে একটু কম। ৩নং মিছিলে ছিলেন যত পয়গম্বর; তাঁহাদের ঘোড়াগুলি দানা পায় না। ৪নং ব্যক্তি একা যাইতেছিলেন, তিনি ছিলেন আমাদের আখেরী জামানার পয়গম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালাম। তাঁহাকে তো এদেশের লোক মানে না, তাই তিনি খাইতে-পরিতে পান না। ৫নং লোকটি ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ মিয়া [নাউজু বিল্লাহি মিন্‌হা]। সে বেচারাকে তো আমরা ভুলিয়াও কখনও মনে করি না, কাজেই তাঁহার এইরূপ দৈন্য। আমি অবাক হইয়া আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম, এমন সময় আজান ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল 'আল্লাহু আকবর'।

প্রকৃত শিক্ষার অভাবে ও ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধির অভাবে আমাদের দেশে ধর্মের নামে অনুষ্ঠানকে বড় করে দেখা যায়। এতে ধর্মের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ন হয়। 'পঁয়ত্রিশ মণ খানা' ব্যঙ্গধর্মী

www.pathagar.com

রচনায় বাংলার মুসলমান সমাজে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি কিভাবে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে লেখিকা এক মনোরম চিত্র অঙ্কন করেছেন।

বিয়ে পাগলা বুড়ো ঃ 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ব্যঙ্গধর্মী রচনায় বিকৃত কাহিনীর সংখ্যা তিনটি। কাহিনীগুলোতে রঙ্গ ব্যঙ্গের ঘাটতি নেই বলে তা উপভোগ্য হয়েছে। বুড়োকালে বুদ্ধদের ভীমরতি হলে যা হয় সমাজ কোন কালেই তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। যুবক সম্প্রদায় এই বুড়োদের নানাভাবে হেনস্থা করে। একটি কাহিনী নিম্নরূপ, "যথাকালে মাতবর বরবেশে সভায় উপস্থিত হইলেন। বিবাহ বেশ ঘটা করিয়া হইতেছে। ঘটকেরা তাহার নিকট হইতে অনেক টাকা লইয়া খুব ধূমধামের সহিত আয়োজন করিয়াছে। .....অনেকক্ষণ প্রাণঘাতী ধৈর্যের পর দর্পণ আসিল, এখন শুভদৃষ্টি। অবগুণ্ঠন তুলিবার সময় পর্দার উপর পাত্রস্থিত চাপা হাসি কলহাস্যে পরিণত হইল, এদিকে বৃদ্ধ চমকাইয়া উঠিলেন; বউ এর মুখে ইয়া দাড়ী, ইয়া গোঁফ। বউ খিলখিল করিয়া হাসিয়া একটানে মাথার পরচুলাটা খুলিয়া বরের সম্মুখে বসিল। হতভম্ব বর তখন দাড়ি গোঁফ শোভিত কনেকে চিনিলেন যে, সে তাহার সম্পর্কের নাতি কালু মিয়া। এইভাবে গ্রামের একজন যুবককে কনে সাজিয়ে বিয়ে পাগল বৃদ্ধকে প্রতারিত করা হয়। জব্দ হয়ে তিনি যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সেই স্থান ত্যাগ করেন। গল্পরস কিংবা চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষা ঘটনা বর্ণনা এই রচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে।

উন্নতির পথে ঃ অধ্যাপক 'মোতাহার হোসেন সুফী'র মতে 'উন্নতির পথে' প্রবন্ধ নয়, এটি একটি ব্যঙ্গধর্মী রচনা। উন্নতি লেখিকার কাম্য নিঃসন্দেহে, কিন্তু উন্নতির নামে সুরুচি ও শালীনতা বিসর্জন লেখিকার কাম্য নয়। সমাজের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে তিনি অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ চেয়েছেন। বহু প্রবন্ধে তিনি বলেছেন পর্দা ও অবরোধ প্রথা এক জিনিস নয়। অতি আধুনিক রীতির বেলেল্লাপনা তাঁর কাছে কিরূপ শ্লেষের বিষয় ছিল, তাঁর উন্নতির পথে শীর্ষক রম্য রচনাটিতেও এরই অভিব্যক্তি ইঙ্গিতবহ ও তাৎপর্যময়। লেখিকা তাঁর বক্তব্যকে শ্লেষ ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দ্বারা শাণিত করেছেন।

এছাড়া লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থেও আমরা এই শ্লেষ ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক ভাষার নমুনা পাই যেমন মতিচূর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'সৃষ্টিতত্ত্ব' তৃতীয় খণ্ডে– 'সুলতানার স্বপ্ন'। ডেলিশিয়া হত্যা উপন্যাসের ''নারী সৃষ্টি' প্রভৃতি। বেগম রোকেয়া রচিত কবিতায়ও এই ব্যঙ্গাত্মক রস রচনার সাক্ষাত মেলে, 'আপীল' এই ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা।

উদারপন্থী সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা আছে এতে।

আপীল কবিতার বিষয়বস্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এই ব্যঙ্গ কবিতাটি ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত।

উদারপন্থীগণ সরকার সমর্থক ছিলেন বলে তাঁরাই সাধারণ খেতাব উপাধি পেতেন। এই খেতাব উপাধিকে কবি লাঙ্গুল বলে ব্যঙ্গ করেছেন। কবির ভাষায়–

যতমূক ভদ্রপাও
লাঙ্গুল কাটিয়া দাও
তাহলে হইবে দণ্ড উচিত সবারি।

সমাজ সচেতন লেখিকা বেগম রোকেয়ার মনের ক্ষোভ এইভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

অনন্যা

রায়হানা সালাম

নারী বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি। নারী সৃষ্টির পিছনে বিধাতার কি উদ্দেশ্য ছিল সে রহস্য আজও উদঘাটিত হয়নি। তবে পৃথিবী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নারীর প্রয়োজন দুর্নিবার ছিল ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। নারীকে নিয়ে যুগে যুগে কত রোমান্টিসিজম গড়া হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে কাব্য সাহিত্য রচিত হয়েছে। কবি সাহিত্যিকরা তাকে অনন্যা ও রহস্যময়ী রূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু নারীর আশা আকাঙ্ক্ষা, অধিকার, হৃদয়াবেগ ও অন্তর বেদনার মূল্য দিয়েছেন খুব কম লোকই। সমগ্র প্রাচীন ও মধ্য যুগ ধরে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নারী যে স্থানটি অধিকার করেছিল তাকে কিছুতেই মানবীয় বলে উল্লেখ করা যায় না। মানবীকে দেবীর আসনে বসালে তাকে অসম্মানই করা হয়। জননীরূপে, জায়ারূপে, কন্যারূপে সংযম, ধৈর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষার পরাকাষ্ঠা রূপে তারা সংসারে বিরাজমান। কিন্তু পারিবারিক সম্পর্ক নিরপেক্ষ নারী হিসাবে নারীর মূল্য কিছু মাত্র ছিল না। বাইরের বিস্তৃত জীবন থেকে সরিয়ে এনে, শিক্ষার আলোকরশ্মি থেকে বঞ্চিত করে, সেদিন সমাজ নারীকে শুধু নারীই করে রেখেছিল মানুষ হয়ে উঠতে দেয়নি। সমাজ সেদিন নারীর প্রতি যে বর্বর ব্যবহার করেছে তা সত্যি অমানবিক। সতীদাহ প্রথা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ সর্বপরি 'পুত্রাতে ত্রিয়তে ভর্যা' এসব শাস্ত্র বচন নারীকে ঘৃণ্য বস্তুতে পরিণত করেছিল।

সমকালীন বিশ্বে তখন হেনরিক, ইকবাল, বানার্ডশ প্রমুখ লেখকেরা নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে যুক্তিতর্কের ঢেউ তুলেছিলেন, সমাজ বিবর্তনের সে ঢেউ আমাদের নিস্তরঙ্গ সমুদ্র তটেও এসে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু জাতি নারীর মূল্য সম্পর্কে ভেবেছিলেন, সাহায্য পেয়েছিলেন মহাত্মা ডিং ওয়াটার বেথুন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি মনীষীর। বেগম রোকেয়ার জন্মের ৩০ বছর পূর্বে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেথুন কলেজ। তাছাড়া বিদ্যাসাগর ও রাম মোহন রায় শতাব্দীর এই দুই মহা পথিক হিন্দু নারীর মুক্তি এনেছিলেন। বেগম রোকেয়ার পূর্বে বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে নারী মুক্তির প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য চিন্তা চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ, মৌলভী আব্দুল আজিজ বি.এ. মৌলভী ফজলুর রহিম, হেমায়েত উদ্দিন প্রমুখ

www.pathagar.com

যুবক। এদের প্রচেষ্টায় নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির উদারবাণী দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু রক্ষণশীল কায়েমী স্বার্থবাদীদের মানসিক জড়তা উদার নৈতিকদের পথকে সহজ হতে প্রচুর বাঁধা দিয়েছিল। রোকেয়ার সমসাময়িক কালে সৈয়দ এমদাদ আলী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক, ডাক্তার লুৎফর রহমান প্রমুখ কেউ কেউ নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। তবে তারা কেউ রোকেয়ার মত বলতে পারেননি "আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে।"

সমাজ ও দেশের ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক ক্ষয়িষ্ণু খানদানি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেগম রোকেয়ার জন্ম। বাংলা দেশের সমসাময়িক আর পাঁচটি খানদানি পরিবারের মত এ পরিবারের নারীরা ছিল সকল অর্থেই অবরোধবাসিনী। তিনি নিজেই বলেছেন, "সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই আমাকে স্ত্রী লোকের সাথে পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না কেন কাহারো সামনে যাইতে নাই। অথচ পর্দা করিতে হইত। বাচ্চাওয়ালা মুরগী আকাশে চিল দেখিয়া ইঙ্গিত করিবা মাত্র তাহার ছানাগুলি মায়ের পাখার নীচে লুকায়, আমাকেও সেই রূপ লুকাইতে হইত।"

বেগম রোকেয়ার মনোলোক তৈরিতে তিনজনের দান অসীম অগ্রজ ইব্রাহীম সাবের, অগ্রজ করিমুন্নেসা, আর বিবাহের পর স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয় বিহারের অধিবাসী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। উদারমনা উচ্চ শিক্ষিত সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন শুধু নারী শিক্ষার সমর্থকই ছিলেন না রোকেয়ার গোপন মনের একান্ত বাসনার পাথেয়ও তিনি জুগিয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে ১৯০৯ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু পারিবারিক গোলযোগের কারণে তাকে ভাগলপুর ছেড়ে চলে আসতে হয় এবং সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটিও কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। স্কুল করার পিছনে তার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ছিল না, নিজের সুনাম কিংবা স্বামীর স্মৃতি রক্ষা কোনটাই নয়। 'সাখাওয়াাত মেমোরিয়াল শব্দ দুটির জন্য যদি স্কুলের অকল্যাণ হয়, তবে সাইন বোর্ড থেকে ও শব্দ দুটি মুছে যাক। চিরকাল আমি নারী মুক্তির জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ আমাকে তাতে সাহায্য করবেন।' রোকেয়ার একাগ্রতার পরিচয় পেয়ে কলকাতার কয়েকজন উদার প্রাণ মানুষ পরলোক গত ব্যারিস্টার আব্দুর রসূলের গৃহে সমবেত হয়ে স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে রোকেয়াকে সাহায্য করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। অপর পক্ষে সমাজের এক বিরাট অংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও রোকেয়া ক্ষণিকের জন্যও কর্তব্যচ্যুত হননি। স্থির অকম্পিত চরণে তিনি কেবল সামনেই এগিয়ে চলেছেন। ১৯১৭ সালে লেডি চেমস্‌ফোর্ট স্কুল পরিদর্শন করে রোকেয়ার সাধনা দেখে মুগ্ধ হন। দীর্ঘ ৭ বছর অক্লান্ত চেষ্টায় স্কুলটি মধ্য ইংরেজি স্কুলে পরিণত হয়েছিল।

সে যুগে বেগম রোকেয়া ঠিকই বুঝেছিলেন নারী মুক্তি নারীকে নিজেকেই আত্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্জন করতে হবে। আর তার জন্য চাই সবার আগে শিক্ষা। নারীরা উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে সমাজও উন্নত হবে। নারীগণকে সকল প্রকার জ্ঞানচর্চা করতে হবে। এই শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার ভূমিকায় তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ ---------- তাঁর মতে নারী শিক্ষার অভাবই মুসলমান সমাজের দুঃখ দুর্দশার একমাত্র কারণ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যে শটকের এক চক্র বড় [পতি] এবং এক চক্র ছোট [পত্নী] সে শকট অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না। সে কেবল একই স্থানে ঘুরিতে থাকিবে।"

অর্থনৈতিক মুক্তিই নারী মুক্তির অন্যতম উপায়। নারী অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করে সাবলম্বী হতে না পারলে সত্যিকার অর্থেই কখনোই স্বাধীন হতে পারবে না। তাঁর এ চিন্তা-চেতনা এবং

www.pathagar.com

মূল্যবোধ তিনি যেখান থেকেই পেয়ে থাকুক না কেন, নারী মুক্তি সম্পর্কে তাঁর এ ধারণা আজ পর্যন্ত সবচেয়ে আধুনিক। রোকেয়ার চোখে নারী মুক্তি অর্থ পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের প্রয়োজন হলে, "আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে লেডী কেরানী হইতে লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টার, লেডী জজ সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy দেখিয়া পুরুষের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগিবে। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহ কার্যে ব্যয় করি সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?" মোট কথা তারা যেন অন্ন বস্ত্রের জন্য কারও গলগ্রহ না হয়। আশার কথা বেগম রোকেয়ার সেই আকাঙ্ক্ষা কিঞ্চিত হলেও সফল হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সনদপ্রাপ্ত নারী আজ সর্বক্ষেত্রেই বিরাজ করছে। শুধু লেডি জজ, লেডি ব্যারিস্টার নয়- লেডি অপজিশন লিডার, লেডি প্রাইম মিনিস্টার দেশে বিদ্যমান। বেগম রোকেয়ার সমাজ চিন্তা অনুসরণ করলে দেখা যায়, তিনি গভীরভাবে এ সত্য বিশ্বাস করতেন যে, "নারী ও পুরুষ সমাজ দেহের দুই চক্ষু স্বরূপ। মানুষের দুটি চোখ মানুষের সর্ববিধ কাজ কর্মের প্রয়োজনে দুই চোখেরই গুরুত্ব সমান। তেমনি সমাজ দেহেরও দুটি চোখ নারী ও পুরুষ।"

বেগম রোকেয়া তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে আরও একটি বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে দেশ থেকে সমাজ থেকে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করতে না পারলে নারীর সার্বিক মুক্তি তথা মানব মুক্তি নেই। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর তিনি ১৯১৬ সালে আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি গঠন করেন। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র এই সমিতি। এই সমিতির ইতিহাসের সাথে তাঁর ২০ বছরের কর্মজীবনের কাহিনী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বহু বিধবা নারী এই সমিতির নিকট থেকে অর্থ সহায্য পেয়েছে। বহু বয়ঃপ্রাপ্ত দরিদ্র মেয়ে এর সাহায্যে সৎ পাত্রস্থ হয়েছে। বহু অভাবগ্রস্ত বালিকা এর অর্থে শিক্ষা লাভ করেছে।

বেগম রোকেয়া যথার্থই একজন অসাধারণ নারী ছিলেন। বাংলাদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনে এই শতাব্দীর সূচনায় তিনি যে বিশেষ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন, এ কথা অনস্বীকার্য।

যদি কোন ফুলের সৌন্দর্যের সাথে বেগম রোকেয়ার অন্তরের সৌন্দর্যের তুলনা করতে হয় তাহলে যে ফুলটির নাম আমার সর্বাগ্রে স্মরণ আসে তা হল শুচি শুভ্র রজনীগন্ধা। রজনীগন্ধার মতই শুচি শুভ্র ছিল তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতি।

৯ ডিসেম্বর নারী মুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলনের পথিকৃত বেগম রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যু দিবস। আজও আমরা হৃদয়ের গভীরে উপলব্ধির দ্বারা শুনতে পাই বেগম রোকেয়ার আহ্বান ধ্বনি। কান পেতে শুনি রোকেয়া আহ্বান জানাচ্ছেন "জাগ মাতা, ভগিনী, কন্যা আর ঘুমাইও না, ভগিনীগণ বুক ঠুকিয়া বল.....আমরা পশু নই..... আমরা আসবাব পত্র নই, বল কন্যা, আমরা জড় অলংকার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই.....সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ, সৃষ্টি জগতের মাতা.....নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য নিজেদেরই সাধনা করিতে হবে।"

নারীমুক্তি আন্দোলনে বেগম রোকেয়া ছিলেন অনন্যা।

জীবনে কোন সাধনাই নিস্ফল হয় না তাই মনে হয় জীবনযুদ্ধে অকুতোভয় রোকেয়ার জীবন ও সাধনা আমাদের সামনে অনুপ্রেরণা হয়েই থাকবে।

www.pathagar.com

মহিয়সী বেগম রোকেয়া

তহমিনা বেগম

শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, ...শিক্ষা মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ী, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালংকার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আসে নাই। তাহাদের জীবন শুধু পতিদেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নয়। তাহারা যেন অন্ন-বস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়। এ উচ্চারণ এ বোধের জন্ম আজ থেকে একশত বাইশ বছর আগে এক মহান নারীর মনে জন্মেছিল। গর্জে উঠছিল তার কলম। "স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে। পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব।" এই ক্ষণজন্মা নারী হলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর তিনি রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে ৯ ডিসেম্বর একই দিনে অগণিত ভক্তকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। যে সময় নারী শুধু পুরুষ নয় অচেনা কোন নারীর সামনে যাওয়াও ছিল নিষিদ্ধ। কোরআন শরীফ পড়া আর কিছু উর্দু-ফারসী শিক্ষা ছাড়া মেয়েদের জন্য বাংলা-ইংরেজি শিক্ষা ছিল রীতিমত ভয়ংকর অপরাধ। কিন্তু এই অকুতোভয় নারী কেবল ইচ্ছাশক্তির জোরে জয় করেছিলেন সব সামাজিক প্রতিকূলতা। অবরোধের সকল বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে সর্বকালের নারীমুক্তির আধুনিকতম পথটি নির্দেশ করে গেছেন।

যা বর্তমান এবং অনাগত সব কালের নারীর চলার পথকে করতে পারে আলোকিত। স্ত্রী শিক্ষা বলতে শুধু বর্ণপরিচয়, প্রাথমিক শিক্ষা বা চিঠিপত্র লেখাকেই যথেষ্ট মনে করেননি। তাই পুরুষদের মত উচ্চশিক্ষা দাবী করেছেন। "আমরা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে সমাজও

www.pathagar.com

উন্নত হইবে না। আমাদিগকে সকল প্রকার জ্ঞান চর্চা করিতে হইবে।" পুরুষদের সাথে সমতালে চলার জন্য, তাদের সত্যিকারের অর্ধাঙ্গী হওয়ার জন্যেও স্ত্রী শিক্ষাকে জরুরী মনে করেছিলেন। "স্বামী যখন কল্পনার সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রমালাবেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন.....স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন। বলি জ্যোতিবেত্তা মহাশয় আপনার পাশে সহধর্মিণী কই? একজন যোগ্য পুরুষের সত্যিকারের সহযাত্রী হওয়ার জন্যও নারীকে যোগ্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।" সন্তান মানুষ করার জন্য মা হিসেবে নারী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। কেবল শিক্ষিত মা-ই পারেন সুশিক্ষিত সন্তান গড়ে তুলতে। "শিক্ষকের বেত্র তাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফএ, বিএ পাস হয় বটে কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নার ঘরেই ঘুরিতে থাকে।" শিক্ষা ব্যতীত নারীর উন্নতি অসম্ভব ভেবেই স্বামীর অর্থে ও পরিকল্পনায় স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যুর পর ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ভগলপুরে এ স্কুলের স্থায়িত্ব বেশি দিন হয়নি। পারিবারিক কারণে ভাগলপুরে বসবাস ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে হয়। তাকে ১৯১১ সালে ৮ জন ছাত্রী নিয়ে তালতলার ওলিউল্লা লেনে পুনরায় তিনি স্কুলটি চালু করেন। রোকেয়ার আগেও কয়েকজন মুসলিম মহিলার পৃষ্ঠপোষকতায় মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর জন্মের সাত বছর আগে ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হয় ফয়জুন্নেসা গার্লস স্কুল। ১৯৮৭ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম ফেরদৌস মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি, অন্যটি সোহরাওয়ার্দী পরিবারের গুজিস্তা আখতার বানুর সহায়তায় ১৯০৯ সালে কলিকাতায় এ দু'টি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বেগম রোকেয়ার আগে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বামা বোধিনী পত্রিকার মার্চ ১৮৬৫ সংখ্যায় 'বিবি শ্রীমতি' নামে তাহেরন নেছা নাম্নী এক মুসলিম মহিলা একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ওই একই পত্রিকায় জুন ১৮৯৭ সংখ্যায় লতিফান নেসার একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। যাতে নারীকে তার বন্দীদশার জন্য ধিক্কার দেয়া হয়। কাজেই প্রথম বাঙালী মহিলা লেখক বা প্রথম মেয়েদের জন্য মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব তার নয়। কিন্তু বাঙালী মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধনই ছিল তার উদ্দেশ্য। যার জন্য তার সাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্যায়নের চেয়ে শিক্ষাব্রতী এবং সমাজ সংস্কারক রোকেয়াই আমাদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজের সকল অচলায়তনকে তুলে ধরাই ছিল তার লেখনীর উদ্দেশ্য। যার জন্য সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর পাশ্চাৎপদতা তাকে ব্যথিত করেছিল। নারী স্বাবলম্বী না হলে তাদের সামাজিক মুক্তি সম্ভব নয়- এ সত্য অনুধাবন করেছিলেন 'পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে-' কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। যোগ্যতা হিসাবে যে কোন পেশাকে গ্রহণ করার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন 'কেহ শিক্ষয়িত্রী পদলাভের উপযোগী শিক্ষা লাভ করেন, কেহ টাইপিং শিক্ষা করেন, কেহ রোগীর সেবা করেন। ফলকথা এ বিভাগে রমণীগণ আপন আপন জীবিকা স্বয়ং উপার্জন করিয়া থাকেন। নারী অগ্রগতির পথে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অন্তরায়গুলোও তার ক্ষুরধার দৃষ্টি এড়ায়নি। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে নারী যে কতটা বঞ্চিত, কতটা অবহেলিতা উপলব্ধি করার শক্তিও তারা হারিয়ে ফেলেছে। অন্তরে বাইরে নারী পারিবারিক দাসত্বকে মেনে নিয়েছে। ভেবেছে এটাই তাদের প্রাপ্য।' 'ক্রমশ আমাদের মন পর্যন্ত দাস [enslaved] হইয়া পড়িয়াছে এবং বহু কাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

www.pathagar.com

নিজের ভাষার প্রতি গভীর মমত্বের প্রকাশ এবং আত্মোপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন যে মায়ের ভাষা ছাড়া মানুষের আত্মীক সত্তার প্রকাশ বিকাশ সম্ভব নয়। তাই ছাত্রীদের মাতৃ ভাষায় কোরআন শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন– 'ষোল বছর যাবৎ এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনার ফলে আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, এখানকার মুসলমানরা মাতৃহীন অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাষা নাই।' সামান্য শিক্ষাকে পুঁজি করে এত গভীর অনুভব তিনি একশ' বছরের বেশি আগে করতে পেরেছেন যা বুঝতে বিজ্ঞজনদেরও অনেক সময় লেগেছিল। নারীর অনগ্রসতার চুলচেরা কারণগুলো তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি। নারীর শারীরিক সবলতা, মানসিক আনন্দের অভাব তাকে বিচলিত করেছিল। তাই শারীরিক শিক্ষার কাজ হিসেবে মেয়েদের লাঠি এবং ছোরা খেলার প্রস্তাব করেছিলেন, অবসর কাটানোর জন্য বিনোদন হিসেবে 'চিত্র ও সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত' বলে মত প্রকাশ করেছেন। পদ্মরাগ উপন্যাসে যৌতুকের বিরুদ্ধে লিখেছেন, 'বিবাহ যেন সম্পত্তি ও অলংকারের জন্য না হয়। কন্যা পণ্যদ্রব্য নহে যে, তাহার সঙ্গে মোটর গাড়ী ও তেতালা বাড়ী ফাও দিতে হইবে।'

পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশী মুসলমান নারীদের প্রতিটি সমস্যা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেছেন। যা তার আগে কোন বাংলাদেশী নারী করেনি। সামাজিক ধর্মীয় কোন গণ্ডির মধ্যে বেগম রোকেয়াকে আবদ্ধ করা যায় না। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই কোন জাতির উন্নতি সম্ভব। 'যতদিন বাঙালীর কন্যাগণ তাহাদের ভ্রাতৃবর্গের কার্যে সহায়তা না করিবে, ততদিন কেহই মুক্তিফল লইতে পারিবে না।' এ শাশ্বত সত্যের অনুভব থেকেই তিনি অনগ্রসর নারী সমাজকে এগিয়ে নেবার সংগ্রাম করেছেন আমৃত্যু।

[উৎসঃ দৈনিক ইনকিলাবের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

ফোন ঃ ৯৮৮৯৪৭৬
মোবাইল ঃ ০১৮-২১৪৭৬৪

মেসার্স ইয়াকুব নির্মাণ ভান্ডার

প্রোঃ সার্জেন্ট এ, টি, এম, ইয়াকুব (অবঃ), বীর মুক্তিযোদ্ধা
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা ক্যান্ট শাখার
বিনিয়োগে পরিচালিত পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্রে ইট, বালু, রড,
সিমেন্ট, ঢেউটিন, এ্যাংগেল বিক্রি, সরবরাহ করা হয়।

৪/১২, ভাষানটেক বাজার, কাফরুল, ঢাকা-১২০৬

www.pathagar.com

স্বশিক্ষিত বেগম রোকেয়া

লিলি হক

বাংলার নারী জাগরণের ইতিহাস আলোচনা করলেই প্রথমে বেগম রোকেয়ার কথা মনে পড়ে। হাজার বছর ধরে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল বাংলার নারী সমাজ। গৃহপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দী থাকার ফলে নারীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের জন্য বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল নানারকম সামাজিক বিধিনিষেধ। মুসলমান মেয়েদের কোরআন শরীফ ছাড়া অন্য কোন বই পড়তে দেয়া হত না। বাংলা শেখার সুযোগ তারা পায়নি। ইংরেজি শেখা ছিল কল্পনার বাইরে।

ঠিক এমনি সময়ে ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার অন্তর্গত খোর্দমুরাদপুর গ্রামে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তবে পরগণার নাম ছিল 'পায়রাবন্দ'। আর বাবার নাম জহীর উদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। মায়ের নাম রাহাতুন্নেসা চৌধুরাণী। শিশুকাল হতেই তিনি পড়ালেখায় খুব উৎসাহী ছিলেন। রোকেয়ার বাবা আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা ভাল জানতেন। তাঁদের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু। তিনি পারিবারিকভাবে আরবী ও উর্দু শিখেন। বাংলা শেখার প্রতি তাঁর ছিল অদম্য আগ্রহ। জ্ঞান লাভের আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বড় ভাইয়ের বই গোপনে নিয়ে মাটিতে লিখে বাংলা বর্ণমালা শিখেন। ভাই তা দেখে রোকেয়াকে বাংলা শিখিয়ে দেন। এভাবে রোকেয়ার বাংলা শেখা শুরু হয়। একদিন বাংলা শিখতে গিয়ে বাবার কাছে ধরা পড়ে ভীষণ ভয় পেলেন। বাবা তাঁকে নিরুৎসাহ না করে বাংলা শেখাতে লাগলেন। একথা বাইরে প্রচার হয়ে গেল। সেকালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের লোকেরা নিন্দা করতে লাগল। ফলে পিতা তার বাংলা পড়া বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু বড় ভাই ইব্রাহীম সাবের গোপনে তাঁকে বাংলা ও ইংরেজি শিখাতে লাগলেন। একদিন তিনি রোকেয়াকে বললেন, 'বোন, ইংরেজি ভাষাটা যদি শিখে নিতে পারিস জগতের একটি রত্নভাণ্ডারের দ্বার তোর সামনে খুলে যাবে'। লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন বেগম রোকেয়া। বাড়ির সবাই ঘুমানোর পর মোমবাতির আলোয় বড়ভাইয়ের কাছে বাংলা ও ইংরেজি শিখেন ও উভয় ভাষায় দক্ষতা লাভ করেন। তিনি 'Sultana's Dream' নামে একটি বই ইংরেজিতে লিখেন যা খুবই প্রশংসিত হয়েছে।

www.pathagar.com

বড় হওয়ার পর বেগম রোকেয়া দেখলেন যে, বাংলার নারী সমাজ কুসংস্কারের বেড়াজালে বন্দী। এদেরকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে এ বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা যাবে না। রসূল [স.] বলেছেন,' বিদ্যাশিক্ষা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর ফরয'। কিন্তু গোড়াসমাজ মেয়েদেরকে বিদ্যা শিখতে বাধা দিচ্ছে যা অযৌক্তিক। বেগম রোকেয়া তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে আমরণ নারীদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। সামাজিক কুসংস্কারের বেড়াজাল ডিঙ্গাতে তাঁকে বহু বাধা, বিপত্তি সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি অকুতোভয়ে সবকাজ করে গেছেন।

'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'পাঠিকাবৃন্দ! আপনারা কি কোনদিন আপনাদের দুর্দশার কথা চিন্তা করে দেখেছেন? এ বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে আমরা কি? দাসী। পৃথিবী হতে দাস ব্যবসা উঠে গেছে শুনতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়েছে কি? আমরা দাসী কেন? কারণ আছে– সম্ভবত সুযোগের অভাব এর প্রধান কারণ। স্ত্রী জাতি সুবিধা না পেয়ে সংস্কারের সকল প্রকার কাজ হতে অবসর নিয়েছে'। বেগম রাকেয়ার সারাজীবনের ধ্যান–ধারণা ছিল কিভাবে নারী সমাজকে আলোকিত করে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা যায়। অসীম মনোবল নিয়ে তিনি বলেছেন, "মা, বোন, কন্যা আর ঘুমিও না। উঠ, কর্তব্যপথে অগ্রসর হও। বুক ঠুকে বল মা, আমরা পশু নই। বল বোন, আমরা আসবাব নই। বল কন্যা, আমরা জড়োয়া অলংকাররূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকার বস্তু নই। সমস্বরে বল আমরা মানুষ। আর কার্যত দেখাও আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক, বাস্তবিক পক্ষে আমরাই সৃষ্টি জগতের মা"।

বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয় ১৮৯৮ সালে ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। ১৯০৯ সালে তাঁর স্বামী মারা যান এবং তিনি অকাল বিধবা হন। কিন্তু ধৈর্যহারা হলেন না। স্বামী মৃত্যুকালে তাঁকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সে টাকা ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় না করে তিনি নারীমুক্তি ও শিক্ষার কাজে নেমে পড়লেন। ১৯০৯ সালে মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন। সে কুসংস্কারের যুগে এ যে কত বড় অভিযান ছিল তা এ যুগে কেউ কল্পনা করতে পারবে না। স্কুলের ছাত্রী সংগ্রহ করতে গিয়েছেন মানুষের দ্বারে দ্বারে। বিনিময়ে নিন্দা ও মানসিক আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু তিনি পিছপা হননি।

১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার ওয়ালিউল্লাহ লেনে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল স্থানান্তর করা হয়। তখন স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৮ জন। ১৯১৫ সনে স্কুলের ৫ টি ক্লাসে ৭০ জন ছাত্রী লেখাপড়া করে। তিনি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে দিনে দিনে স্কুলের উন্নতি সাধন করেন। স্কুলকে তিনি জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। একবার তাঁর এক আত্মীয়কে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'বেহেশতের নিমন্ত্রণ পেলেওতো স্কুল ছেড়ে যেতে পারব না'। তিনি ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। বেগম রোকেয়ার ছাত্রী ও সরকারী বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস আনোয়ারা বাহার চৌধুরীর নিকট শুনেছি যে, বেগম রোকেয়া ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। বেগম রোকেয়া যখন স্কুলে প্রবেশ করতেন তখন, "বড়ি আপা আয়ি" [বড় আপা এসেছেন] এই বলে সকল ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী দৌড়াদৌড়ি শুরু করতেন। বর্তমানে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল কলকাতার ৯নং লর্ডসিং রোডে অবস্থিত। বেগম রোকেয়ার জীবদ্দশায় স্কুলটি ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবরোধবাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন, মতিচূর, পদ্মরাগ প্রভৃতি পুস্তকে তিনি নারীদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়েছে। বাংলার নারী আজ মোটামুটি কুসংস্কারমুক্ত। তারা বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশ ও জাতির উন্নতিকল্পে আজ তারা পুরুষের পাশাপাশি সকল কাজে অংশগ্রহণ করছে। পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে নারী শিক্ষার আলো। আমাদের নারী সমাজের মুক্তি ও প্রগতি তাঁরই অবদান। তাই নারীমুক্তির অগ্রদূত হিসেবে বেগম রোকেয়া এদেশে সর্বযুগে, সর্বকালে স্মরণীয়।

বেগম রোকেয়া ছিলেন স্বশিক্ষিত। আর সেজন্য তাঁর জনম জনম স্বপ্ন ছিল শিক্ষার আলোয় আলোকিত নারী।

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়া ও নারী আন্দোলন

সেলিন ইয়াসমিন

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল ভারতীয় মুসলিম সমাজের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সংকটময় সময়কাল। ইংরেজ সরকার কর্তৃক আরোপিত বিভিন্ন পদক্ষেপ মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক জীবনে মারাত্মক আঘাত হানে। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতার দিকে ঠেলে দেয়। আর শিক্ষার অভাবে মুসলিম সমাজ নানাবিধ কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়ে। সত্যিকার ইসলামী আদর্শ থেকে মুসলিম সম্প্রদায় তখন অনেক দূরে সরে যায়। ধর্মীয় অনুশাসনের বিকৃত ব্যাখ্যার প্রসার ছিল তখন ব্যাপক। এর ফলে মুসলিমরা ক্রমশ নিমজ্জিত হচ্ছিল কুসংস্কার ও গোঁড়ামির গহব্বরে। মুসলমান সমাজে তখন নারীদের অবস্থান ছিল আরও শংকাময়। মুসলিম নারীরা তখন নানারকম নির্যাতন ও শোষণের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। তারা ছিল মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। নারীকে মানুষ হিসেবে নয়, বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ঠিক এমনই এক সময়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এক মহিয়সী নারী, বেগম রোকেয়ার জন্ম হয়। তিনিই পরবর্তীতে দায়িত্ব নেন অবহেলিত নারীদের অন্ধকার থেকে আলোয় টেনে আনার।

বেগম রোকেয়া ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি নারী জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ থেকে নারীদের মুক্ত করার যে আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন, তার ফলশ্রুতিতেই আমরা অর্থাৎ নারীরা আজ এ অবস্থানে।

আজকাল হরহামেশাই দেখা যায়, রোকেয়াকে নিয়ে চলছে বিতর্ক। যেমন— ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও নাস্তিক বুদ্ধিজীবিরা রোকেয়াকে তাদের দলভুক্ত বলে প্রচারণা চালাচ্ছেন। আবার নারীবাদীরা বলছেন, রোকেয়া তাদের দলভুক্ত। কারণ তিনি নারীদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে গেছেন। আসলে যারা রোকেয়াকে নিয়ে এসব বিতর্ক সৃষ্টি করতে চান, তারা তাঁর সামগ্রিক লেখনী ও জীবনের শিক্ষা বাদ দিয়ে খণ্ডিত কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন।

নারী শিক্ষাক্ষেত্রে, নারীদের সমঅধিকারের ক্ষেত্রে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইসলাম কি বলে, তাই আসলে বেগম রোকেয়া সুন্দরভাবে তাঁর লেখনীতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি দূর

www.pathagar.com

করার চেষ্টা করেছেন ধর্মের নামে মেয়েদের দাবিয়ে রাখার বাড়াবাড়ি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল" প্রতিষ্ঠা করে তিনি তৈরি করে গেছেন কিছু আলোকিত নারী, যারা পরবর্তীতে নারী আন্দোলনকে বেগবান করেছেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর যে অবিস্মরণীয় অবদান, তার কিছু আমরা এ স্বল্প পরিসরে জানার চেষ্টা করবো।

✪ ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এমনিতেই ইংরেজি শিক্ষার প্রতি একটা অবিশ্বাসী মনোভাব পোষণ করত সাধারণ মুসলমানরা। আর তখন মহিলাদের ইংরেজি শিক্ষা? এ তো কল্পনাই করা যায় না। ঠিক এমন পরিস্থিতিতে মুসলমান নারীদের জন্য তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যার ছাত্রীরা পরবর্তীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন স্ব-স্ব পেশায়। তিনি তাঁর লেখনীতে সুন্দরভাবে নারী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ধর্ম নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধক নয়। তিনি লিখেছেন, "আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়াছি। সমান পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না? আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি এবং নিজেকে অতিতুচ্ছ মনে করি। অনেক সময় 'হাজার হোক ব্যাটা ছেলে' বলিয়া ব্যাটা ছেলেদের দোষ ক্ষমা করিয়া অন্যায় প্রশংসা করি। এই ত ভুল।' [রোকেয়া রচনাবলী পৃঃ ৩৪]

'মতিচূরে' তিনি বলেন, "যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের? আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহু-লতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞান চর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর, মস্তিষ্ক [dull head] সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।" এভাবে তিনি বিভিন্ন লেখায় নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব পুরো সমাজকে উপলব্ধি করানোর চেষ্টা চালান। নারীদের সচেতন করে তোলেন তাদের দায়িত্ব ও যোগ্যতা সম্পর্কে।

শিক্ষা ছাড়া নারীরা পূর্ণতা লাভ করবে না। শিক্ষা ছাড়া তারা চোখ থাকতেও অন্ধ। তাদের বিরুদ্ধে যে অন্যায় হচ্ছে তা তারা দেখতে অক্ষম। আসলে নারীরা নিজেরাই নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় বলে পুরুষরা নারী শিক্ষার জন্য তেমন কোন ভূমিকা রাখছে না আর নিজের অজান্তেই নারী হচ্ছে প্রতারিত।

✪ আল্লাহ নারী ও পুরুষের মধ্যে একজনের উপর আর একজনের শ্রেষ্ঠত্ব দেননি। মূল মানুষটি হল রূহ, যা সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছে এবং যা একই রকম। সূরা আরাফের ১৭২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি সকল রূহ একত্রে সৃষ্টি করেছেন এবং সকল মানুষকে একই প্রশ্ন করেছেন। "আমি কি তোমাদের রব নই?" তখন সকল মানুষ একই উত্তর দিয়েছে, 'হ্যাঁ'। সূরা তওবার ৭১ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পরের সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক।" কাজেই, কুরআনে স্বীকৃত নারী পুরুষের মানুষ হিসেবে সমঅধিকারকে লুকিয়ে রেখে তৎকালীন গোঁড়া সমাজ নারীদের অন্ধকারে রেখেছিল। নারীদের সত্যিকারের ইসলামিক ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করাই ছিল বেগম রোকেয়ার মূল লক্ষ্য। এজন্য তিনি বিভিন্নভাবে নারীদের উৎসাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মতিচূর-এ লিখেছেন, "পুরুষদের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, লেডী জজ সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী

www.pathagar.com

Viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে রাণী করিয়া ফেলিব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?....."

বেগম রোকেয়া নারীদের তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারেও সচেতন করে তোলেন। কারণ অধিকার থাকা সত্ত্বেও তখন গৃহকর্তা পুরুষেরা নারীদের এ ব্যাপারে অনুৎসাহিত করতো। নারীর ভোটাধিকার প্রসঙ্গে রোকেয়া বলেন, "এখন স্ত্রীলোকেরা ভোটদানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহারে স্বেচ্ছায় বঞ্চিতা রহিয়াছেন। গত ইলেকশনের সময় দেখা গেল কলিকাতায় মাত্র ৪ জন স্ত্রীলোক ভোট দিয়াছে। ইহা কি মুসলমানদের জন্য গৌরবের বিষয়? তাঁহারা কোন সুযোগের আশায় বা অপেক্ষায় বসিয়া আছেন?" [রোকেয়া রচনাবলী, পৃ: ২৮০]

গোঁড়া ধর্মগুরুরা তৎকালীন সমাজে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন। অথচ ইসলাম নারীকে যে পুনর্বিবাহের অনুমতি দিয়াছে, তাদের পোষাক-আষাক, খাদ্য ইত্যাদি সম্পর্কে যে বাধা ধরা কোন নিয়ম নাই, এই মর্ম উপলব্ধি করানোর জন্য বেগম রোকেয়া সোচ্চার ছিলেন। তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত বাল্যবিবাহ প্রথা রোধকল্পে তিনি তাঁর লেখনী পরিচালনা করেছেন। 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থে তিনি বাল্যবিবাহ রহিতকরণ দাবী জানিয়ে বলেন, "২১ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না। এটা আইন হওয়া উচিত।" 'সুলতানার স্বপ্ন"-এ লেখিকা সমাজ সংস্কাররূপী স্বপ্নে দেখেন যে, "শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কার রূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং বাল্যবিবাহ প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না। এই আইন হইল।" রোকেয়া ছিলেন এই প্রস্তাবের পথিকৃৎ। পরবর্তীকালে অনেক ইসলামী রাষ্ট্র এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

তৎকালীন গোঁড়া সমাজ ইসলামের শিক্ষার অজ্ঞতার কারণে নারী বিদ্বেষী ছিল। তালাকের নামে ইসলাম পরিপন্থী কাজে মানুষ ছিল লিপ্ত।। তারা তালাক নিয়ে বাড়াবাড়ি করতো এবং এর ফলশ্রুতিতে নারীদের হতে হতো লাঞ্ছিত ও সমাজের সামনে অপমানিত। রোকেয়া তার 'পদ্মরাগ'-এ এই 'অকারণ তালাক'-এর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দাবী জানান। একজন শিক্ষিত মুসলিম হিসেবে এটা ছিল তার জন্য অবশ্যকরণীয় কর্তব্য।

✪ স্বাধীনতা পিপাসু অনেক নারীরা এ নিয়ে বিতর্ক করে যে— রোকেয়া নারী স্বাধীনতার কথা বলেছেন, অথচ তিনিই বোরকা পরে বা পর্দা মেনে চলতে বলেছেন। এটা কি স্বাধীনতা বা নারী মুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়? আমরা যদি তাঁর লেখনী গভীরভাবে অণুস্থ করি তবে সহজেই বুঝতে পারবো, তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'বোরকা' প্রবন্ধে বলেন, "ইংরাজী আদব কায়দাও আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, ভদ্রমহিলাগণ আড়ম্বর রহিত পোষাক ব্যবহার করিবেন— বিশেষতঃ পদব্রজে ভ্রমণকালে চাকচিক্যময় বা জাঁকজমক বিশিষ্ট কিছু ব্যবহার করা তাঁদের উচিত নহে। ঐ উপদেশে আমরা কোরআন শরীফের অষ্টাদশ 'পারার' সূরা 'নূরের' একটি উক্তির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।" [রোকেয়া রচনাবলী, পৃ: ৫৮]

অর্থাৎ রোকেয়া এই ইসলামিক অনুশাসনকেই পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন নারীদের। যা কোনক্রমেই তাদের স্বাধীনতা বা অগ্রসরতার পথে অন্তরায় নয় বরং অনেক ক্ষেত্রেই সহায়ক।

✪ বেগম রোকেয়া পুরুষবিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি সবসময় পুরুষদের সাথে কাজ করেছেন। সহকর্মী পুরুষদের তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। যার প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের প্রতি। তবে পুরুষ শাসিত সমাজে যে সব পুরুষ জোর জবরদস্তি করে

www.pathagar.com

নারীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতো বা পুরুষবাদ প্রচারের চেষ্টা চালাতো, তিনি তাদের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার।

✪ স্বাধীনতার নামে নারীরা যেন তাদের সীমা অতিক্রম না করে, তারা যেন ধর্মীয় অনুশাসন এর বাইরে চলে না যায়, তিনি সেক্ষেত্রেও ছিলেন যথেষ্ট সজাগ। যেমন তিনি বলেছেন, "এগিয়ে যাবার নাম করে অনিয়ম, বাড়াবাড়ি যেন না হয়। আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না।" [অর্ধাঙ্গী- ৪৪]

বেগম রোকেয়া নারী মুক্তির বা নারী স্বাধীনতার যে আন্দোলন করে গেছেন, তার মূলমন্ত্র ইসলামেই নিহিত রয়েছে। ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে তা প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও গোঁড়া সমাজে চাপা পড়েছিল। রোকেয়া ইসলামী দর্শন ও কোরআনের আলোকে সেগুলোই পূনর্জাগরণের চেষ্টা চালিয়েছেন। আর তাঁর মতে নারীদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার একমাত্র পথ শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা ভিক্ষা নয়, অনুগ্রহের দান নয়— আমাদের জন্মগত অধিকার। ইসলাম নারীকে সাতশ বছর আগে যে অধিকার দিয়াছে তার চেয়ে আমাদের দাবী একবিন্দুও বেশী নয়।" [রোকেয়া রচনাবলী, পৃ: ১২১]

আর এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং সহযোগী। ধর্ম এই অগ্রসরতার পথে প্রতিবন্ধক নয় বরং সাহায্যকারী। আজ আমরা বাংলাদেশের নারীরা, সার্বিকভাবে সন্তুষ্টিজনক, সম্মানজনক অবস্থানে নেই। নারী নির্যাতন, সস্তা শ্রমিক হিসেবে নারীদের ব্যবহার, নারী শোষণ, নারীদের সমাজে অসম মর্যাদা, অসম অবস্থান ইত্যাদি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এর থেকে মুক্ত হওয়ার একটাই পথ, আর তাহল সঠিক জ্ঞানের অন্বেষণ ও তা গ্রহণ। কোরআন ও হাদীসের আলোকে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করা। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তৈরি হবে প্রগতিশীল নারী সমাজ।

[সহায়ক গ্রন্থ রোকেয়া রচনাবলী— শামসুন নাহার]

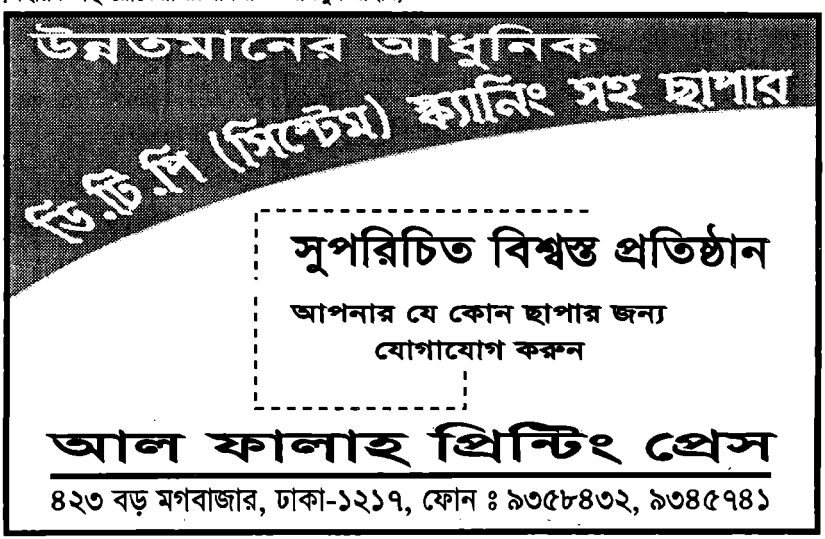

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়া ও তাঁর শিক্ষাচিন্তা

ওমর বিশ্বাস

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা পুরোমাত্রায় জেকে বসেছে উপমহাদেশে। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের কদর চারদিকে। যারা ইংরেজি শিখছে তাদের কেউ স্বেচ্ছায় কিংবা কেউ নিরুপায় হয়ে। আর সেখানে বাঙালী হিন্দুরা নিজেদেরকে বৃটিশদের কাছে আরো গ্রহণীয় করে তোলার জন্যেই ইংরেজ ও ইংরেজির সাথে সখ্যতা শুরু করেছে। এভাবেই সময় এগিয়ে যাচ্ছে ক্রস আধিপত্যর দিকে। অন্যদিকে নতুন আরেক শতাব্দীর প্রস্তুতি।

এরকমই এক পরিস্থিতির মধ্যে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন বেড়ে ওঠেন। হিন্দুরা এগিয়ে যাচ্ছে অথচ বাঙালী মুসলমানরা ক্রমেই জ্ঞান বিজ্ঞান আর শিক্ষা দীক্ষা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। তারা ইতোমধ্যেই নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর কৃষ্টি-কালচার থেকে হয় দূরে সরে গেছে নয়তো ভুলতে বসেছে। মুসলমান নারীর অবস্থা ছিল তখন আরো সঙ্গীন। এরই মধ্যে চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষতায় বেড়ে ওঠা একজন জাগরণী বীর বেরিয়ে আসে আপন প্রতিভায়। আমরা তাকে তার সামগ্রিক কর্মে, তার জীবনকে সামনে রেখে নারী জাগরণের পথিকৃত বলেই সম্বোধন করি। বেগম রোকেয়া আমাদের সেই জাগরণের বীর।

বেগম রোকেয়া তার চিন্তা-ভাবনাকে শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। তিনি তা তার লেখায়, বক্তৃতায়, কর্মে-প্রতিফলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাই স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার মূল ধ্যান-জ্ঞান ছিল কিভাবে নারী সমাজকে শিক্ষিত করা যায়। কিভাবে তাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে জাতির উন্নয়নের কাজে লাগানো যায়। কিভাবে নারীকে দেশের জন্য কাজে লাগানো যায়। একজন নারীকে শুধু গৃহিনী হয়েই থাকলে হবে না।। তাকে এমন একজন আদর্শ নারী হতে হবে যা বহুমুখী। বহু শাখা প্রশাখায় ডাল-পালা বিস্তৃত করে যে বিচরণ করবে সমাজের সর্বত্র একজন মহিয়সী হিসেবে। যে অন্যকে পথ দেখাবে আলোর। যার হাত দিয়ে এগিয়ে আসবে আগামীর ভবিষ্যত। আর এসবের পিছনে শিক্ষাই পারে সব কিছুকে অনুপ্রাণিত করতে। এটা বেগম রোকেয়া খুব ভালো করেই জানতেন।

www.pathagar.com

রোকেয়ার এই চিন্তার সাথে যুক্ত হয়ে আছে তার বিশ্বাস। ইসলামের প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাস যে ছিল তা আমরা তার বিভিন্ন লেখাতেই অসংখ্য প্রমাণ পাই। তার মনের আকুতি সব সময়ই আল্লাহর কাছে ছিল। তিনি চিন্তার স্বচ্ছতার প্রমাণ বারবারই দিয়ে গেছেন। মানুষের কল্যাণ আর নারী জাতির উন্নতি সাধনের প্রচেস্টা ছিল সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে। সকল ব্যাকুলতাতেই তিনি নিষ্ঠাভরে স্রষ্টার সাহায্য চেয়েছেন। তার মন ছিল প্রেম-পিয়াসী, "এত দিনে বুঝিলাম, আমার হৃদয় কেন সদা হু হু করে, কেন সদা কাতর হয়। এ হৃদয়ের পিপাসা তুচ্ছ বারি পিপাসা নহে। ইহা অনন্ত প্রেম-পিপাসা। ঈশ্বর একমাত্র বাঞ্ছনীয়, আর সকলে পিপাসী–ঐ বাঞ্ছনীয় প্রেমময়ের প্রেম-পিপাসী! [পিপাসা (মহরম) মতিচূর, প্রথম খণ্ড]

এই ব্যাকুলতাকেই তিনি স্বপ্নের সাথে মিশিয়েছেন। কাজ করে গেছেন সারাজীবন। আমরা নানাবিধ সমস্যায় পতিত হয়ে আর নিজেরা সমস্যা সমাধান থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেরাই নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছি। ফলে বারবার পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। এই বিষয়টিও বেগম রোকেয়ার মাথায় গেঁথে ছিল। শিক্ষাই যে আমাদের মূল আর তার জন্যেই যে তিনি এত উদগ্রীব তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে 'মতিচূর প্রথম খণ্ডের, বোরকা' শিরোনামের লেখা থেকে উদ্ধৃত করা হলো।

১. আমরা যে এমন নিস্তেজ, সংকীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধ থাকার জন্য হয় নাই – শিক্ষার অভাবে হইয়াছে। সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের হৃদয় বৃত্তিগুলি এমন সংকুচিত হইয়াছে।

২. ..... প্রকৃত শিক্ষা চাই– যাহাতে মস্তিষ্ক ও মন উন্নত [brain ও mind cultured] হয়।

৩. আমরা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবে না।

৪. যতদিন পর্যন্ত আমরা আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র।

৫. আমাদিগকে সকল প্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।

৬. শরীর-শোভন অলঙ্কার ছাড়িয়া জ্ঞান-ভূষণ লাভের জন্য ললনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রভৃতি, বিভিন্ন কথা বলা হয়। উপরের উদ্ধৃতিগুলো শুধুমাত্র একটি প্রবন্ধেরই। সেখানেও আরো কিছু কথা বলা আছে, শিক্ষা সম্বন্ধে তা আমরা উল্লেখ করতে পারি।

এ শিক্ষা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার সকল প্রকার কুফলই আমরা পাচ্ছি। আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে পিছিয়ে রাখছি। আমরা অনেক সময়ই তা বুঝতে পারছি না। কিন্তু বেগম রোকেয়া তাও আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি শিক্ষার অভাব সম্পর্কে সেই বোরকা প্রবন্ধেই বলছেন, "শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি।" এ যেন অসম্ভব বাস্তব এক সত্য উপলব্ধি। আমরা এই অভাববোধ থেকে যতদিন পর্যন্ত না নিজেরা বেরিয়ে আসতে পারব ততদিন পর্যন্ত উন্নতি আর অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে থাকব। সেই সাথে মেয়েদের এ শিক্ষার অভাবেই স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। যে শিক্ষাটুকু তারা পেয়েছে তাও কুশিক্ষা। ফলে তারা সেই কুশিক্ষা থেকেই সমাজকে কলুষিত করছে। নিজেদেরকে বিকিয়ে দিচ্ছে পন্য হিসেবে। পণ্য হিসেবে বাজারে উপস্থাপনেও তারা লজ্জিত নয়। সেখানে নগ্নতা আর দেহ প্রদর্শনীই যেন প্রকৃত শিক্ষা। অথচ আশ্চর্য তারাই আজ বলছে নারীকে পণ্য করা যাবে না। কিন্তু সুশিক্ষিতও করে গড়ে তুলবে না। বিজ্ঞাপিত নারী তাদেরকেই লজ্জা দিলেও তারা নারীর প্রগতি কিংবা অগ্রগতিকে পর্দাকেই অন্তরায় হিসেবে দেখছে। অপপ্রচার

www.pathagar.com

চালাচ্ছে। এতে এমনকি কুণ্ঠিত হচ্ছে না। তারা পর্দাকে অনেক ক্ষেত্রে মুখ্য বলেও গণ্য করে। কিন্তু তার স্পষ্ট উত্তরও দিয়ে তিনি বলেছেন, "পর্দা কিন্তু শিক্ষার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ায় নাই।" এ কথা তার বোরকা প্রবন্ধেই পাওয়া যায় যার পিছনে অনেক উদাহরণ দিয়েই তিনি সমাপ্তি করেছেন এভাবে, "আশা করি, এখন আমাদের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তা ভগ্নীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে বোরকা জিনিসটা মোটের উপর মন্দ নহে।"

পর্দা নয় প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই আমাদের সকল সমস্যার আবির্ভাব। নারীদেরকে তাই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে। সুশিক্ষাই পারে নারীকে সুন্দর ভবিষ্যত গড়াতে। স্বপ্ন দেখাতে পারে সুন্দরের। নারীরা কি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়েই সব কিছু প্রাপ্তির পূর্ণতা পেতে পারে। সেই ডিগ্রীই কি সব? না, বেগম রোকেয়া যে নারীর স্বপ্ন দেখাতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে জাগরণের পিছনে তা আসলে বহুমুখী। আমরা তার সেই বহুমুখী চিন্তার সুস্পষ্ট বক্তব্য পাই তার 'EDUCATIONAL IDEALS FOR THE MODERN INDIAN GIRL' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি তার নারীর প্রকৃত কথা বলেছেন। In short, our girls would not only obtain university degrees, but must be ideal daughter, wives and mothers-or I may say obedient daughters, Loving Sisters, Dutiful wives and instructive mothers. বেগম রোকেয়ার মত সকল নারীরই আকাঙ্ক্ষা এরকম। কেহই চায় না নিজের মান-সম্মান বিকিয়ে অন্যের অধীনস্থ হতে–এটা অবশ্যই ঘরের বাহিরের ঘটনা। আর নারী যদি নিজেই সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে তখন সেই গাইড করবে অন্যকে। একটা জাতি গঠনের মূল কাঠামোতে সে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হতে পারে। সে সব ক্ষেত্রেই নারীকে অবশ্যই সন্তান থেকে বোন, স্ত্রী আর আদর্শ মায়ের আদর্শ ভূমিকা পালন করতে নিজেকেই আদর্শ হয়ে উঠতে হবে। একটা পশ্চাৎপদ জাতির নারী সমাজকে জাগ্রত করতে এই অবদান অবিস্মরণীয়। গোটা বাঙালী মুসলমানই পিছিয়ে পড়েছি। নানান অজুহাতে দূরে সরিয়ে রেখেছে নিজেদেরকে। যাও দুচারজন নিজেদেরকে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত করে চলছিল সেটা ছিল অপ্রতুল। ওই অবস্থার মধ্যে থেকেই গোটা নারী সমাজকে সামগ্রিক মুক্তির পথ দেখানো সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। জাতীয় নবজাগরণে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে তার এই নিরলস প্রচেষ্টাই তাকে মর্যাদার অনেক উচ্চ স্থানে নিয়ে গেছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহতা আর চিন্তার চেতনার অনগ্রসরতা দূরে ঠেলে বেগম রোকেয়া নিজেই মুক্তির নেতৃত্বের কাণ্ডারী হাতে নেন।

বেগম রোকেয়া নিশ্চিত জানতেন শিক্ষাই মুক্তির পথ। তিনি জানতেন, "স্ত্রী শিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই" [সিসেম ফাঁক, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ, রোকেয়া রচনাবলী, পৃঃ ২১১]। তার এই চিন্তা-চেতনার মূল ভিত্তি ছিল কোরআন। তিনি নিজেকে কখনও কোরআন থেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। তিনি নিজের বিশ্বাসই বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। তার বিশ্বাস প্রাথমিক পর্যায় থেকেই সকলকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া উচিত। ভিত্তিমূল মজবুত থাকলে কেউ কখনো বিচ্যুতির পথে পা বাড়াতে পারে না। তার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি কেউ গোঁড়ামি বলতে চায় সেক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য, "আমি গোঁড়ামি হইতে বহুদূরে।" এরপরই তিনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার প্রমাণ দেন, "প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরআনে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য কোরআন শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।" [বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি, রোকেয়া রচনাবলী, পৃষ্ঠা : ২২৭]

বেগম রোকেয়া নারীকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করলেও তিনি জানতেন নারীর প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই জাতির ভবিষ্যত মুক্তির পথ তৈরি হয়ে থাকে। সেই জাতিতে পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত উপস্থিতিই বাস্তব। সেখানে উভয় মিলেই একটি জাতির গঠন। আর সেই জাতির দৈন্যকে নারী

www.pathagar.com

শিক্ষায় ঔদাস্যকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। তার বিশ্বাস, "মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য দুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রী-শিক্ষায় ঔদাস্য" [ঐ]।

বেগম রোকেয়ার চিন্তা আমাদের সামগ্রিক চিন্তার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। আমরা এখনো তার সামগ্রিক চিন্তা-চেতনাকে একদিকে যেমন পুরোপুরি তুলে ধরতে পারিনি অন্যদিকে তেমনি তাকে যেটুকু উপস্থাপন করা হয়েছে তাও সামান্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারো কারোর কৌশল একেবারেই দুরভিসন্ধিমূলক। তারা যদি নারী আন্দোলনের কিংবা নারী জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বেগম রোকেয়ার ভূমিকাকে স্মরণ করতো তাহলেও তাতে তারা নিজেরা যেমন উপকৃত হতো জাতিও তেমনি উপকৃত হতো। নারী পণ্যর কলঙ্কও ঘুচতো আমাদের সমাজ থেকে। অথচ রোকেয়ার সেই শিক্ষাকেও সেই ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া হয় বেমালুম।

বেগম রোকেয়ার শিক্ষা বিস্তারের চিন্তার আরেক অংশ ছিল ধর্মহীন শিক্ষা। ধর্মহীন শিক্ষা কোনোভাবেই জাতিকে কোনো প্রকৃত মুক্তির পথ দেখাতে পারে না। নারীর অবমূল্যায়ন, নারীর অসম্মান থেকে শুরু করে প্রতিটি অনৈতিক ঘটনার পিছনেই ধর্মহীন শিক্ষা জড়িয়ে যায়। নারী যখন পণ্য হয় সেখানেও ধর্মহীন শিক্ষা তার প্রবল প্রতাপ বিস্তার করার চেষ্টা করে। নারী যখন নারী জাতির কলঙ্ক কিংবা পুরুষের ক্রীড়নক সেখানে নারী এবং পুরুষের ধর্মহীন শিক্ষাই দায়ী। তিনি এর কারণ উদঘাটনের পাশাপাশি এর সমাধানের পথও দেখিয়েছেন, "প্রধান কারণ, বর্তমান ধর্ম্মহীন শিক্ষা..... কোরআন শরীফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানাপ্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কোরআন শরীফের বিধান অনুযায়ী ধর্ম্ম-কর্ম্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।" [ধ্বংসের মুখে বঙ্গীয় মুসলিম, রোকেয়া রচনাবলী, পৃষ্ঠা: ২৪৭]

যারা রোকেয়াকে একপেশে করে নিজেদের সুবিধার সাথে মিলিয়ে উপস্থাপন করে তারা ভুল করে। তারাই প্রকৃত কলঙ্ক। তারা বেগম রোকেয়ার চিন্তার বিশালতা সম্পর্কে জানে না। তারা অন-উদার মানসিকতার প্রাচীরেই নিজেদেরকে আটকে রাখে। তারা বিভ্রান্তির প্রাচীর ভাঙতে পারে না। ফলে কিভাবে তারা জাতিকে মুক্তির পথ দেখাবে? কিভাবে তারা ধারণ করবে রোকেয়ার চিন্তার বিশালতাকে। মুক্তির আলোকে প্রাপ্তির আলো কখনই সেইজন্য তাদের দুয়ারে আলোকিত হয়ে আসে না। তারা আসলে গোটা জাতির মধ্যে বিভাজন চায়, কল্যাণ চায় না। অথচ নারী মুক্তির পথিকৃত, নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সেই সময় চেয়েছিলেন, বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণ–সেখানে তার স্বপ্নময় আশা 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' একটি প্রতীক মাত্র। একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও।

এইসব দিক থেকেই বেগম রোকেয়ার চিন্তা, সমাজ সংস্কারের ভূমিকা মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। অন্ধকার আর কুসংস্কারের কুয়া থেকে বেরিয়ে এসে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আলোকে আলোকিত হবার তার প্রচেষ্টা ছিল নির্ভেজাল। আর সব ক্ষেত্রেই তিনি তার স্বচ্ছতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সেই ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকের কথাই শুরুতে বলা হয়েছিল। তখন থেকে বেগম রোকেয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম সিকিভাগ পর্যন্ত নিরলসভাবে সংগ্রাম ও সাধনা করে গেছেন। তিনি সেই সমাজ থেকেই যে প্রত্যয়দীপ্ত বাণী উচ্চারণ করেছিলেন–সকলের সামনে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। তার সেই চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি শুধু তৎকালীন সময়ের জন্যেই নয় আজকের সমকালীন প্রেক্ষাপটেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ– যা এখনও পর্যন্ত তার মতো করে আর কেউই বলেনি। একবিংশ শতকের শুরুতে এসেও সেই সব কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

www.pathagar.com

মোছ

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

মা বাপ হারা রোকেয়া বড় ভাই-এর সংসারে বড় হয়েছে রুকি নামে। ইতিহাসের মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া হওয়ার কোন সুযোগ তার নেই। তবু সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে একবার চেষ্টা করে দেখবে, নিজের পায়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায় কিনা।

লেখাপড়া করার কোন সুযোগ তার ভাগ্যে জুটেনি। কিন্তু তার সুস্থ সবল দুটি হাত, দুটি পা ও একটি মাথা আছে। এইটুকু সম্বল নিয়ে রুকিয়া রোকেয়াদের মত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে কিনা, তা একবার পরীক্ষা করে দেখবে সে।

বড় ভাই যতটুকু আদর করে, তার তিনগুণ নির্যাতন করে ভাবী। ভাই-এর ছেলে দুটিও বেয়াদবের হাড্ডি। বাবা মা আদর করে নাম রেখেছিল রোকেয়া বেগম। স্বপ্ন ছিল বেগম রোকেয়ার মত মহিয়সী নারীরূপে তৈরি করা। ভাবী ভাইপোদের নির্যাতনে রুকি হয়ে থাকতে হবে চিরকাল। ঢাকা শহরে মহিলা হোস্টেল আছে, মহিলা মেছ আছে। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মত কর্মক্ষেত্র আছে। আজই সে শহরে চলে যাবে। যদি কোন দিন বেগম রোকেয়া অথবা রোকেয়া বেগম হতে পারে, তবেই গ্রামে ফিরবে সে।

গার্মেন্টসে চাকরি পাওয়া তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকরা কখনো বেগম রোকেয়া হতে পারে না। রুকিকে তাই অন্য কিছু করতে হবে। ছোটকালে মায়ের হাতে শেখা রান্না বান্না ছাড়া আর কোন অভিজ্ঞতাও তার নেই। এইটুকু পুঁজি নিয়েই সে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে। প্রমাণ করবে, নারী অবলা নয়। তারা বেগম রোকেয়ার উত্তরসূরী।

একটি চুলা ও কয়েকটি হাড়ি পাতিল যোগাড় করে সে একটু জায়গা দখল করে নেয় আলাতুন নেছা গার্লস স্কুলের সামনে। পাঁচ কেজি আতপ চাল ফ্লাওয়ার মিল থেকে গুড়ো করে নেয়। প্রয়োজন মত খেজুরের গুড় ও নারিকেল কিনে শুরু করে ভাপা পিঠার ব্যবসা।

স্কুল প্রাঙ্গণে ফেরিওয়ালাদের ভীড় লেগেই থাকে। আইসক্রিম, চিনাবাদাম, চকলেট, চটপটি ও চানাচুরওয়ালাদের হাকডাক চলে বিকাল পর্যন্ত। দুটি কনফেকশনারীতে আছে নানারকম ফার্স্টফুড। টিফিন পিরিয়ডে ছাত্রীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে দোকানগুলোতে।

www.pathagar.com

দুদিনেই জমে উঠে রুকির পিঠা ব্যবসা। শুধু ভাপা নয়। পুলি, চিতই, পাটিশাপটা ইত্যাদিও তৈরি করে সে। শুধু স্কুলের ছাত্রীদের কাছে নয়, আশে-পাশের বাসা-বাড়িতেও সে পিঠা পার্সেল সাপ্লাই করে। অলস গৃহিণীরা সকালের নাস্তার ঝামেলা মিটায় রুকির চিতই পিঠা ও সরিষার কাসুন্দি দিয়ে।

আবুল মিয়ার ডাইলপুরি-সিঙ্গারা-পরোটার দোকানটা ফেল মারায় ছেড়ে দেয়। সেটা ভাড়া নেয় রুকি। সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে মিলাদ মাহফিল করে শুভ উদ্বোধন করা হয় 'রোকেয়া পিঠাঘর'।

মহল্লার কুখ্যাত চাঁদাবাজ মাস্তান হাবি দৈনিক আসা-যাওয়ার পথে আড়চোখে তাকায় দোকান ও দোকান মালিকের দিকে। চাঁদাবাজ হলেও তার একটা নীতি আছে। ফুটপাতের ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সে চাঁদা নেয় না। সে এবার টের পায়, রুকির উপার্জন এখন ভালই। সে এখন আর ক্ষুদে ব্যবসায়ীর পর্যায়ে পড়ে না।

ভয়ঙ্কর এক জোড়া মোছ বানিয়েছে হাবি মাস্তান দীর্ঘ দিনের সাধনায়। চেহারা দেখলেই ভয়ে অনেকের পিলে চমকে যায়।

পিঠাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রুকির দিকে বাঁকা চোখে তাকায় হাবি। বিনিময়ে মিষ্টি একটি হাসি উপহার দেয় রুকি।

–আয়েন হাবি ভাই। পিডা খাইয়া যান।

–চুপ থাক ছেমরী। বিরানী খাওনের পয়সা দে।

–একটু খাইয়াই দেহেন। ভালা না লাগলে লাত্তি মাইরা ফালায়া দিয়েন। 'মায় কইতো' পরের আতের পিডা, গালে লাগে মিডা। ঐ পিচ্ছি, ভালা কইরা পেলেড ধুইয়া আঙ্কেলরে সব আইটেমের একটা কইরা পিডা দে।

প্লেটে পিঠা সাজিয়ে পিচ্ছি ছেলেটা ডাকে–

–বন আঙ্কেল।

–চুপ থাক, বইয়া খাওনের সময় নাই আমার।

প্লেট থেকে একটা পুলি পিঠা হাতে নিয়ে কামড় দেয়। পিঠার ভিতরে সুজির হালুয়া। অদ্ভুত একটা স্বাদ অনুভূত হয় জিব্বায়। ভাপা, পাটিশাপটা ও পোয়া পিঠা কয়টাও খেয়ে ফেলে গপ গপ করে।

–কি ভাই, পিডা কেমন অইছে? ছোডকালে মায় হিগাইছে।

–দাম কত অইছে?

–হস্তা দামের পিডা। আইজ থাক। আরো কয়দিন খাইয়া একলগে দিয়েন।

–ছেমরী তুই বেশি প্যাছাল পারছ।

ক্যাশের উপর একটা একশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে হন হন করে চলে যায় হাবি। পাশ্ববর্তী হোটেল তাজের মালিক মফিজ কাকার কানে পৌঁছে রুকির পিঠাঘরে হাবি মাস্তানের ঢুকার খবর। হাবি চলে যাওয়ার পর দৌড়ে আসে মফিজ চাচা।

–কিরে রুকি, হাবিরে পডাইলি ক্যামনে? পিডা খাইয়া দাম দিয়া গেছে হোনলাম। হালারপুতে প্রত্যেকদিন আমার কাছতে মাগনা নাস্তা খায়। খাওনের পরে আবার শিকারেডের পয়সাও চাইয়া লইয়া যায়।

–একশ টেহা দিয়া পাঁচশ টেহা দামের একটা দমক দিয়া গেছে।

–একশ টেহা দিয়া গেছে! কত পিডা খাওয়াইছস হালার পুতরে?

www.pathagar.com

–বার টেহা বিল আইছে। বাহিগুলা এডভান্স দিয়া গেছে। পরে খাইয়া শোধ করব।

–এডভান্স বিল দিয়া পিডা খায় হালার পুতে? আলামত ভালা নারে। দুইদিন পর আবার হাবি দাঁড়ায় রুকির দোকানের সামনে।

–আয়েন হাবি ভাই। এডভান্স দিয়া গেছেন, অথচ পিডা খাইবার আইলেন না। ঐ পিচ্ছি, পেলেড ধুইয়া আঙ্কেলরে পিডা দে।

–কোনডা দিমু আফা?

–কিছু কন না দেহি হাবি ভাই। কোন পিডা আফনের পছন্দ?

–তোর সব পিডা আমার পছন্দ। সব পদের দুইডা কইরা ল।

পিঠা ও পানি খেয়ে ক্যাশের সামনে এসে দাঁড়ায় হাবি। ভয়ঙ্কর মোছ জোড়ার ফাঁকে অদ্ভুত একরকম হাসি দেখতে পায় রুকি।

–তোর আতের মধ্যে যাদু আছে। দারুণ মজার পিডা বানাইছস।

হাবি মাস্তানের এই সুব্যবহারে ভয়ানক চিন্তায় পড়ে যায় রুকি। মফিজ আঙ্কেলের কথাটা কানে বাজতে থাকে 'আলামত ভালা নারে।' পরামর্শের জন্য সে নিজেই মজিফ চাচার হোটেলে যায়। হাবিবের এইরকম আচরণের কথা খুলে বলে চাচাকে।

–মানুষের মতিগতি বুঝা মুশকিল। আল্লার উপর ভরসা রাখ। বেশি বেশি দোয়া কর। ইজ্জতের মালিক আল্লা।

সেদিন থেকে নিয়মিত নামাজ পড়া শুরু করে রুকি। ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে রাখে সর্বদা। মফিজ চাচার বাড়িতে ছোট্ট একটি রুমে ভাড়া থাকে রিনা। মফিজ চাচার বাড়ির সকলে নামাজী। তারা রুকিকে নামাজ পড়ার পরামর্শ দিয়েছে অনেক আগেই। এতদিন আমলে আনেনি।

হাবি মাস্তান প্রায়ই পিঠা খেতে আসে। আজ অন্যরকম বেশে দেখতে পায় রুকিকে।

–কিরে রুকি ঘোমটা দেয়া শুরু করছস কবেত্বনে? হুনছি আল্লা-বিল্লাও শুরু করছস পুরাদমে? এক্কেবারে বেগম রোকেয়া বইনা গেছস মনে অয়?

–কামডাকি খারাপ করতাছি ভাই?

–অস্তাগফিরুল্লা, নোমাজ পড়ারে খারাপ কাম কয় কোন হালায়? খুব বালা কাম করতাছস। কফালে দাগ ফালায়া দে। আর এই ছাগলডার লইগাও একটু দোয়া করিছ।

–কোন ছাগলের লাইগা। আমার মায় সবসময় গোয়াল ঘরে খাড়ায়া গরু ছাগলের লাইগা দোয়া করত, যাতে বেশি দুধ দেয়।

–আরে বোদাই, আমার কতা কইতাছি। আমিই একটা আস্তা ছাগল।

–কি যে কন হাবি ভাই। আফনে অইলেন বাঘের বাচ্চা। বাঘের মতন মোছ। বাঘের মতন চোখ।

–তোর ডর লাগে?

–আগে লাগত। অহন লাগে না। মায় কইছে, ডরাইলেই ডর। মাইয়া বইলে কিয়ের ডর। দাও একটা আতের কাছেই রাহি। মরলে দুই একটারে লইয়া মরুম।

–খাইছে আমারে, তুই দেহি আরেক ডাহাইতা মাইয়া। দে, দুইডা বাফা পিডা দে।

–ঐ পিচ্ছি, আঙ্কেলরে গরম গরম পিডা দে। আমারেও দুইডা দিছ। আইজ নাস্তা না খাইয়া দোহানে বইছি।

এলাকায় কয়ডা উদিয়মান বখাটে দল বেধে হানা দেয় পিঠা ঘরে। উদ্দেশ্য, রুকিকে উত্ত্যক্ত করা ও বিনা পয়সায় পিঠা খাওয়া।

www.pathagar.com

–এই পিঠাওয়ালী, সব পিঠা তোর হাবি মোছওয়ালারে খাওয়াবি? আমাগো বুঝি কোন হক নাই? দে, আমাগোও দে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই হাবি যাচ্ছিল দোকানের সামনে দিয়ে। মতির বাঁকা কথাগুলো সে শুনতে পায়। সোজা দোকানে ঢুকে খোলা থেকে প্রচণ্ড গরম একটা পিঠা হাতে নিয়ে আস্ত চেপে ধরে মতির মুখে।

মাগো, বাবাগো, মইরা গেলাম গো বলে চেচাতে থাকে মতি। বাকীগুলো দৌড়ে পালায় নিমেষে।

–এই মাঙ্গের পো, আরো খাবি পিডা? ঐ পিচ্ছি, আরেকটা গরম পিডা আন।

–ভাই, ভাই, মাফ চাই ভাই। আর কোন দিন এমন কাম করতাম না ভাই।

–যা, তোর আফার পাও ধরা মাফ চা। আর দশবার ক, 'আর কোন দিন এমুন কাম করলে হোগনা শু চাবায়া খাই।'

বখাটে লিডার মতিরে যে শিক্ষা আজ দেয়া হয়েছে, তাতে মনে হয় আর কোন বখাটে রুকিকে উৎপাত করতে আসবে না। রুকি এখন ষোল বছরের যুবতী।

কোন আত্মীয় স্বজন নেই এখানে। একমাত্র মফিজ চাচা ছাড়া কোন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে বলেও এখনো পরিচয় পায়নি। রুকির মত অসহায় যুবতীদের কোন নিরাপত্তা নেই এই সমাজে। ভাল মানুষগুলো সব অকর্মণ্য। সন্ত্রাসীরা পারে চুরি ডাকাতি ঠেকাতে। মাস্তানরা পারে বখাটেদের শায়েস্তা করতে। এক মাস্তান ঠেকাতে হয় আরেক মাস্তানের সাহায্য নিয়ে।

–এই রুকি, কি ভাবতাছস?

–ভাবনার কি শেষ আছে? ভাবতাছি, হিয়ালের মুহের শিকার কাইরা খায় বাঘে। হাঁস মুরুগীর কি উপায় অইব?

–খুব মারফতি কতা কইতাছস দেহা যায়? কি কইবার চাস, বুঝায়া ক।

–কইছিলাম, কয়ডা বখাটে আপনের প্যাদানী খাইয়া ভাগছে। অহন সব পিডা আফনে মাগনা খাইয়া গেলেও আমার কিছু করার নাই।

–ঐ ছেমরী, তোর মারফতি কতার প্যাছ আমি বুঝি না মনে করছস? তয় কতাডা এক্কেবারে মিছা কছ নাই। তোর বাফা পিডার মতন তোরেও আমার পছন্দ অইছে। আইজই তোর মফিজ চাচার লগে আলাপ করমু। হিয়ালের মুহের মুরগী কাইড়া খাই বইলা আমি পোংডা বাঘ না। মানুষ খারাপ অইলেও স্বভাব ভালা।

পিঠা ঘরের সাইনবোর্ড বদলে যায় কিছুদিন পরই। নতুন সাইন বোর্ড লাগে 'রোকেয়া ফার্স্ট ফুড কর্ণার।' মূল্যবান ফার্নিচার ও লাইটিং দিয়ে সাজানো হয় দোকান। শুধু পিঠা নয়। সুপ, বার্গার, পিজা, ফেলুদা, কোল্ড আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিংস ইত্যাদী স্থান পায় মেনুতে। রুকির পরিবর্তে ক্যাশে বসে হাবিব। কোন চুক্তি পত্র ছাড়াই হাবিব তার সঞ্চিত টাকাগুলো ইনভেস্ট করেছে পাটনারশিপ ব্যবসায়। চুক্তি পত্রের দরকারও নেই। রিনা তার লাইফ পার্টনার।

স্বামীকে নিয়ে বহুদিন পর গ্রামের বাড়িতে যায় রুকি। সাথে নিয়ে যায় বিভিন্ন আইটেমের ফার্স্ট ফুড। ভাই এর সন্তানেরা অদ্ভুত সাধের নতুন ধরনের খাবার পেয়ে মহাখুশি। ভাবী এখন রোগ শয্যায়।

–ফুফু বাবায় কইছে আফনে বলে পিডা বেছেন। পিডা কই?

–পিডার দোহান তোর ফুফায় হাইজ্যাক কইরা ফালাইছে।

–কন কি? আমগো ফুফা হাইজাকার?

এবার জবাব দেয় হাবিব।

www.pathagar.com

–ঠিকই কইছ সোনা। আমি হাইজাকার। হিয়ালের মুহের মুরগী বাঘের মতন কাইড়া খাই। তোমার ফুফুরে হিয়ালে ধরছিল।

–ফুফায়ও দেহি মারফতি কতা কয় মা।

–কইব না? তোর ফুফু এক্কেবারে পীরে কামেলা। মাথায় ঘোমটা, হাতে তছবিহ। তোর ফুফায়ও মারফতি বয়ান হিগা ফালাইছে।

–ঠিকই কইছ ভাবী। পীর না অইলেও আমি পীরের মুরিদ। মফিজ চাচা মানুষটা পীরের মত। তারে না পাইলে ঢাহা শহরে কত হিয়ালের মুহে পরতাম। এক গেলেস পানি আন। পইড়া দিয়া যাই। আমার পড়া পানি খাইলে তোমার ব্যারামও ভালা অইয়া যাইবো।

–দেরে বইন, তোর পানি পড়া না খাইলে আমার ব্যারাম যাইত না। অনেক কষ্ট দিছি তোরে। মাফ সাফ কইরা দিস।

সাথে আনা জায়নামাজ বিছিয়ে ধ্যান মগ্ন হয়ে জোহরের নামাজ পড়েছে রুকি। একটি বিষয়ে খটকা লাগে ভাই-এর মনে। তাই জিজ্ঞেস করে।

–তুইতো খুব আল্লাওয়ালা অইয়া গেছস। নোমাজ পড়ছ, পর্দা করছ। কিন্তু জামাই-এর এমন গুণ্ডা মার্কা মোছ কেন?

–হেয়তো গুণ্ডাই। মহল্লার বড় মাস্তান। এই গুণ্ডাই আমারে নোমাজী বানাইছে।

বড় ভাই হা করে কিছুক্ষণ বোনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। রুকি আবার বলে।

–কি করমু ভাই? ঢাহার শহর গুণ্ডা বদমাইশে ভরা। আমার মতন জোয়ান মাইয়া একলা থাহে ক্যামনে? গুণ্ডার ডরে আল্লাহর পাঞ্জায়া ধরছি। আল্লায় বড় গুণ্ডারে জামাই বানায়া দিছে। ছোড গুণ্ডারা আমারে ছেলাম দেয়।

রাতে বাসায় ফিরে রুকি ও হাবিব নির্জনে প্রেমালাপ করে

–মোছওয়ালা জামাই দেইহা ভাইজান ডরায়া গেছিল। এইডা কাইডা ফালাইলে কি অয়?

–কি অয়, তুই বুঝবি না। তোর কতায় পিস্তল, চাক্কু, কুড়াল সব বেইচ্ছা দিছি। এইডাও যদি ফালায়া দেই, মাইনষে আমারে পাত্তাই দিব না।

–একটু কাইডা ছাইডা সুন্দর কইরা রাহ। মোছলমানের মুহে এই রহম মোছ থাকলে চাড়ালের মতন দেহায়।

–আরে রাখ তোর মোছলমান। আমাগো ওস্তাদে কইছে, মোছলমানের মধ্যে তিনডা কতা আছে। এক নম্বর মোছ, তিন নম্বর মান। দুই নম্বরটা হুনতে খারাপ লাগে, তাই কইলাম না। আমাগো পরথম দুইডা আছে, শেষেরটা নাই। পরথমডা কাইডা ফালাইলে মাইনষে ডরায় না। মাঝেরডা কাডলে এক্কেবারে মরণ। এই দুইডা লইয়া আমরা মান ছাড়া মোছলমান।

–ঠিক আছে, তুমি থাহ তোমার দুই জিনিস লইয়া। আমি মাইয়া মানুষ। আমি তিন নম্বরটা লইয়া মোছলমান।

–আরে, রাগ করছ ক্যান? আস্তে আস্তে আমার মোছও ছোড অইব। মানতো কিছু অইছে তোরে বিয়া করণে। আর কয়ডা মাস আমার মোছরে সহ্য করতে পারবি না?

–আমি কি কইছি, আমার অসহ্য লাগে? আমারতো ভালাই লাগে তোমার মোছ ধইরা টানতে। তিন জিনিসের এই একটা ধইরাই টানন যায়। আল্লায় তোমার মোছের হায়াত দারাজ করুক।

আরে খোদায় তোরে এক্কেবারে বেগম রোকেয়া বানাক। তুই আসলেই কামের মাইয়া।

www.pathagar.com

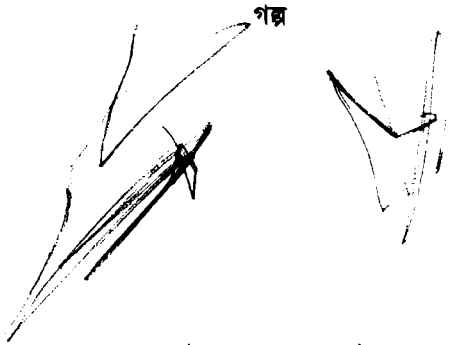

মানুষ অদৃশ্যে

শাহীন আখতার আঁখি

ফর্সা চেহারাটায় কষ্ট আর কান্নার ছাপ স্পষ্ট। শিথিল ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ বসে থেকে ব্যান্ড খুলে ভেজা চুলগুলো পিঠময় ছড়িয়ে দেয় বীথি। নিজের ব্যাগটা পাশের সিটে রেখে রীয়ার জন্যে জায়গা রাখে।

দশটা পয়তাল্লিশ। একে একে মেয়েরা ক্লাসে আসছে। এগারোটায় ক্লাস। পুরো হলরুমে হৈচৈ হট্টগোল।

প্রায় দেড়মাস পর কলেজে এসেছে বীথি। তবে তার আজকের এ আসা অন্য সময়ের চেয়ে একেবারে আলাদা। নিজেকে মনে হচ্ছে কষ্টের কুয়াশায় মোড়া এক অদ্ভুত মানুষ।

চারদিকে শুধু চাপচাপ কান্না। তৃষার মত কোন মেয়ে দেখলে না হয় তৃষার কোন প্রিয় জিনিস, প্রিয় খাবার, প্রিয় রং দেখলেই মন আর চোখ কষ্টের স্রোতে ঘূর্ণিপাক খায়।

মনে হয় পৃথিবীটা দুভাগে বিভক্ত। কষ্টের পৃথিবী আর আনন্দের পৃথিবী। ওর পৃথিবীর চৌহদ্দী এখন কষ্টের আগুনে পুড়ছে নিরন্তর। কষ্টের সময়গুলো ভয়ানক বোঝা হয়ে চেপে থাকে অস্তিত্বের ওপর।

বীথির মনে হয় আজীবন এই শোকের পাথর তাকে বয়ে যেতে হবে। একেকটা দিন যেন বসে থাকে কচ্ছপের পিঠে। স্থবির দুপুর, রংহীন বিকেল নিশ্চল ডানা মেলে আছে।

অথচ আনন্দের দিনগুলো কত দ্রুত বয়ে যেত। সকালের পর খুব তাড়াতাড়িই যেন বিকেল সন্ধ্যা আর রাত নেমে আসত।

হঠাৎ টেবিলে ডাস্টারের প্রচণ্ড শব্দ। কানে আংগুল দেয় কেউ কেউ। ইংলিশ ফার্স্ট পেপার ক্লাস। থেমে যায় মেয়েদের গল্প-গুজব। বরাবরের মত তেমন কোন ভূমিকা ছাড়াই ফারজানা ম্যাডাম ঝড়ো গতিতে লেকচার শুরু করে দিয়েছেন।

ইংলিস ক্লাস শেষে ফিজিক্স ক্লাস শুরু হল। নেভী ব্লু সালোয়ার কামিজ পরেছেন রূপা ম্যাডাম। সব সময়ই তাকে ছাত্রী ছাত্রী মনে হয়। আজকের পড়া স্থিতিস্থাপকতা। কিন্তু বীথি অন্যজগতে একেবারে নিজের মনের ভেতরে।

www.pathagar.com

ওর কাছে মনে হয় সময়টা যেন এসকেলেটরের দুসারি সিঁড়ির মতন। কিছু সময় চলতে চলতে অতীতে হারিয়ে যায় অন্যদিকে ভবিষ্যতের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে অন্তহীন সময়।

ঘন্টা পড়ল। ম্যাডাম বেশ ফুরফুরে মেজাজে 'খোদা হাফেজ' বলে বেরিয়ে গেলেন।

ফিজিক্স বই রেখে দ্রুত বাংলা বই বের করে সবাই। ম্যাডামের ক্লাসে নোট বই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রশ্নোত্তরগুলো ক্লাসে সবাইকে চিন্তা-ভাবনা করে লিখতে হয়। আজকের পড়াটা একটু পড়ে নিচ্ছে কেউ কেউ। কেউ নোট বই ফলো করলে ম্যাডাম ঠিক ধরে ফেলেন। এই একটা ক্লাস স্বস্তি, তৃপ্তি আর ভয়ের মিশ্রণে অন্যরকম।

খালেদা হানুম ক্লাসে এলেন। হালকা বেগুনী তাঁতের শাড়ি পরা। মেয়েরা তাকে মাত্র কয়েকটা শাড়িই পরতে দেখে সব সময়। পুরো কলেজের ছাত্রীদের মুগ্ধতা, শ্রদ্ধা আর ভালবাসা আদায় করে নিয়েছেন কানায় কানায়।

বাংলা ক্লাসগুলো সবসময় নিবিড় নীরবতায় ছেয়ে থাকে তাঁর শান্ত পরিমিত কথাগুলো শোনার জন্য। আজকের পড়া ছিল বেগম রোকেয়ার অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধের ব্যাখ্যাগুলো। সবার মত বীথিও তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। ওর দেহে মনোযোগের ভঙ্গি কিন্তু মনের মনোযোগ হারিয়ে গেছে দূর অজানায়।

তৃষা এখন কেমন আছে? পনের বছরের মিষ্টি বোনটি তার। বীথি আর তৃষা কলোনীর রাস্তায় বিকেলে হাঁটছিল। হঠাৎ চিৎকার করে ঢলে পড়ে গেল তৃষা। রাস্তায় বসে পড়ে বীথি কোলে তুলে নিল ওকে।

দুকানের একটু উপরের ছোট্ট দুটো ছিদ্র থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ল অনেকক্ষণ। অল্প কিছুক্ষণ উহ্ আহ্ করে পুরোপুরি জ্ঞান হারাল তৃষা। বড় দ্রুত শেষ হয়ে গেল সব।

হাসপাতালে সেন্সলেস থাকল একদিন তারপর ক্লিনিক্যলি বেঁচে রইল একদিন। মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী, অত্যাধুনিক পিস্তলের ছোট্ট কোন বুলেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছিল ওর মাথা।

বাসায় নিয়ে আসা হল ওকে। প্রাণচঞ্চল সেই তৃষার প্রাণহীন দেহ। সবই আছে সেই হাত-পা, নাক-মুখ-চোখ; নেই শুধু রূহ-আত্মা।

গোসল-কাফন শেষে কফিনে শোয়ানো হলো। আত্মীয়-স্বজনরা দোয়া দরূদ পড়ছে, কোরআন তেলাওয়াত করছে। মা বারবার সেন্সলেস হয়ে যাচ্ছে, বাবা নির্বাক বসে আছে। আতর-আগরবাতি কর্পূরের গন্ধ চারদিকে। স্বাভাবিক সময়টা যেন উল্টোমুখ করে আছে।

কফিনের ভেতর সাদা শুভ্র পোশাকে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল তৃষা।

এই পৃথিবীতে ওর আর কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। অভিমান-অভিযোগ নেই। সুখ-দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার বিড়ম্বনা নেই।

চোখ-মুখ হাত পা মাথার এই তৃষাকেই তো সে এতদিন তৃষা বলে জানত। ওই চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলত, গলার স্বর শুনে চিনত, কথা শুনত। অথচ ওই চোখ এখন আর দেখছে না। কণ্ঠ নিস্তব্ধ।

তাহলে এ দেহের তৃষাই আসল তৃষা ছিল না! প্রকৃত তৃষা ছিল দেহের ভেতরের অদৃশ্য আত্মা। অদেখা সে আত্মা মৃত্যুর ফেরেশতার সাথে অন্য জগতে চলে গেছে। পড়ে আছে খাঁচা।

প্রাণপণ চীৎকারে বীথি ডেকেছিল, একটু ওঠ তৃষা। একটু কথা বল। একবার ছোট আপু বলে ডাক। এই বিশাল পৃথিবীতে একটু নিঃশ্বাস নে। না সাড়া দেয়নি তৃষা। পার্থিব জীবনের সীমানা সে পেরিয়ে গেছে। মৃত্যু দিন আর রাতের আবর্তনের মত অবিচল নিয়ম নিষ্ঠ।

www.pathagar.com

ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রীর দিকেই খালেদা হানুমের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পড়ান আন্তরিক যত্নে। বীথির বিধ্বস্ত উদাসীন ভাবও তার দৃষ্টি এড়ায় না।

বীথির মন তখন নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে তৃষার আত্মার ভাবনায় একটার পর একটা আকাশের সিঁড়ি বেয়ে কেবলই উর্ধ্বমুখী হচ্ছে।

পায়ে পায়ে তৃতীয় সারির মাঝামাঝি বীথির সামনে এসে দাঁড়াল ম্যাডাম।

পাশ থেকে ওকে ধাক্কা দেয় রিয়া। চমকে উঠে রিয়ার দিকে মুখ ফিরায় বীথি। রিয়া ইঙ্গিত করে ম্যাডামের দিকে।

দাঁড়িয়ে যায় ও। ছল ছল করছে চোখ। তারপর হৃদয়ের মেঘ টপ টপ করে ঝরতে শুরু করল। অবাক হল ম্যাডাম। কাঁদছে কেন মেয়েটা? মনে হয় বেশ কদিন পর ক্লাসে দেখছেন ওকে।

পাস থেকে রিয়াই বলে দেয় সবকিছু। দেড়মাস আগে পেপারে ছাপা হওয়া নিহত স্কুলছাত্রী তৃষার বোনই বীথি।

পরম মমতায় ওর মাথায় হাত রাখেন ম্যাডাম। সান্ত্বনা দেন। বাসা কোথায় জানতে চান। ওনার বোনের বাসাও গ্রীন রোড কলোনীতে জানালেন।

অনেক চেষ্টায় নিজেকে সুস্থির করে তোলে বীথি। চোখ মোছে।

মৃত্যু তার অনেক কাছ ঘেঁষে চলে গেছে। বুলেটটা আর একটু এদিক ওদিক হলে ওকেই বিদ্ধ করতে পারত। তখন ওই হয়ে পড়ত লাশ। চলে যেত পরকালের অচেনা জগতে।

বাবা-মা, বড় বোন তৃণা, তৃষা সবাই ডুবে থাকত হৃদয় ভাঙা শোকের চোরাবালিতে।

চক নিয়ে ম্যাডাম বোর্ডের দিকে এগিয়ে যান। "আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়।" এই ব্যাখ্যাটা লিখতে দিয়ে চুপচাপ বসে পড়েন চেয়ারে। পুরো ক্লাসেই শোকের একটা শীতল ছায়া, চোখ ভিজে উঠেছে অনেকেরই।

ঘন্টা পড়ল। একজন মানুষের হেঁটে যাওয়াও যে কতটা শান্ত-সুন্দর, পরিমিত হতে পারে, ম্যাডামকে দেখলে তাই মনে হয়। অনেকের মত বীথিও তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ক্লাসের মেয়েদের কারো কারো সাথে তৃষার কিছু কিছু মিল আছে মনে হয়। শামার মত ফর্সা ছিল ও। তাবাসসুমের মত পিঠ ছাড়িয়ে যাওয়া ঘন, কালো চুল। লম্বা আর গড়নটা ছিল নাজিফার মত। বড়খালা আম্মুকে সব সময় বলত তোর তিনটা মেয়ে চুনী, পান্না আর মুক্তার মত সুন্দর। তৃষাকে মুক্তা ডাকতেন।

কেমেস্ট্রির ফওজিয়া ম্যাডাম এলেন। মিষ্টি দুধ-গোলাপী একটা মোম-বাটিকের শাড়ি পরেছেন। ডিজাইনটা আনকমন। কানে, গলায় পার্লের গহনা। সেন্ডেল থেকে হেয়ার-ব্যান্ড সবকিছুই ম্যাচিং। বরাবরের মতই মেয়েরা খুঁটিয়ে দেখে তাকে। কারো কারো সুনিশ্চিত অনুমান প্রতিমাসের বেতনের চেয়ে অনেক বেশি এ বাবদ খরচ করতে হয় ম্যাডামকে।

কিন্তু বীথির আজকের দৃষ্টিতে শুধু ব্যথার কুয়াশা। এই নিটোল ফ্যাশন, চমৎকার ম্যাচিং সবই এখন তার কাছে অর্থহীন।

মনে হয় মানুষ মরণের জন্যই জন্ম-বরণ করে। মৃত্যু প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত আপতিত হয়ে মানুষকে এই পৃথিবীতে অস্তিত্বহীন করে দেয়।

সম্ভাবনাময় একটা জীবনের স্বপ্ন চোখে নিয়ে তৃষা চলে গেল কবরে। সুন্দর জীবন আর যত কিছু সুন্দরের তীব্র আকাঙ্ক্ষী ছিল ও। আব্বুকে একটা সুন্দর বাড়ি করার কথা বলত সব সময়।

রাত এগারোটায় বিছানায় যাবার সাথে সাথেই বালিশ ভিজতে শুরু করে বীথির।

www.pathagar.com

তৃষা আর ও এক রুমেই থাকত। ওতো এখন নিজের খাটেই শুয়েছে। অথচ তৃষা শুয়ে আছে কবরে। মাটির উপরে, মাটির নীচে, মাটির ভেতরে।

আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না ও। দ্রুত বিছানা ছেড়ে বারান্দায় চলে আসে। কবর খুলে তৃষাকে যদি এক নজর দেখতে পারত! কার কাছে তৃষার বর্তমান জীবন সম্পর্কে একটু জানতে পারবে?

মেঝ খালার মেয়ে নাঈমা আপার কথা মনে হয় ওর। সকালেই ঝিকাতলায় তার বাসায় যাবে ঠিক করে।

মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। আবার শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করে ও। ভিজতে থাকে বালিশ।

ডিম লাইটের হালকা নীল আলোয় দৃষ্টি চলে যায় ওর ড্রেসিং টেবিলের ওপর। চুড়ির আলনার বেশির ভাগ চুড়িই তৃষার। পারফিউম, লিপিস্টিক, লোশন, নেইল পলিশ, ক্লিপ, টিপ সবই আগের মত সাজানো।

পাশেই পড়ার টেবিলে বই-খাতা। এক কোণে ছোট টবে ক্যকটাস।

কদিন থেকে ব্লক শিখছিল তৃষা। ডজন খানেক ব্লক আর অনেকগুলো রং পড়ে আছে ওর ড্রয়ারে। নেই শুধু এর পেছনের মানুষটি।

কোত্থেকে গুলি এসেছিল? কারো সাথে কি কোন সম্পর্ক বা মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছিল তৃষার? না এরকম কোন কিছুর কথাতো এখন পর্যন্ত শোনা যায়নি।

পুলিশ কেস হয়েছে। তদন্ত চলছে। কোন ক্লুই বের হয়নি। তবে কেউ কেউ এটুকু অনুমান করছে অসতর্কভাবে কেউ কোন আর্মস নাড়াচাড়া করছিল সেখান থেকেই টার্গেটলেস গুলি এসে লেগেছে ওর গায়ে।

ফযর নামাজ পড়ে জায়নামাজে বসে আছে বীথি। পাশের রুম থেকে বড় বোন তৃণার কান্নার শব্দ শুনতে পায়। তৃণার কষ্টের প্রকৃতিটা ভিন্নরকম। তৃষার কোন জিনিসের দিকে তাকাতেও যেন ও ভয় পায়। এ কয়দিন ও বাসার বাইরেই যথাসম্ভব থাকতে চায়। বড়খালার বাসায় থেকে এসেছে এক সপ্তাহ।

বীথি বরং তৃষার স্মৃতির খুব কাছাকাছি থাকতে চায়। তৃষার জিনিসপত্রগুলো বের করে আবার গুছিয়ে রাখে। নেড়েচেড়ে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরে।

অফহোয়াইট একটা থ্রী পিসে এমব্রয়ডারী করছিল তৃষা। জামাটায় এক ফিট সূতার সাথে তৃষার হাতে গাঁথা সুই ঝুলছে। যেন ও এসে কিছুক্ষণ পরই ওতে সেলাই করবে। জামাটা জড়িয়ে ধরে কাঁদে বীথি।

আটটা বাজতেই নাঈমা আপার ঝিকাতলার বাসার উদ্দেশ্যে রিক্সায় ওঠে ও। বাসা থেকে একটু দূরে থাকতেই দেখে নাঈমা আপার ছোট ভাই বাদল রিক্সা থেকে নামছে। তাকে দেখেই বাসায় যাবার ইচ্ছেটা চলে যায় ওর। বীথির কাছে যতই বিরক্তিকর মনে হয় ততই গল্প জমাবার চেষ্টা করে চলে বাদল ভাই।

রিক্সাওয়ালাকে আর থামতে বলে না ও। নাঈমা আপার বাসা ছাড়িয়ে অনেকখানি এগিয়ে যায় রিক্সা। এবার রিক্সাকে আবার গ্রীন রোড চলে যেতে বলে।

প্রথমেই বাসায় না গিয়ে লায়লাদের বাসায় নামে। ওদের বাসায় অনেক ধর্মীয় বই দেখেছে। হয়তো তৃষার জন্য আরো ভালভাবে দোয়া করার মত কোন বই নিতে পারবে।

www.pathagar.com

লায়লা বাসায় নেই। খালাম্মা এলেন, সান্ত্বনা দিলেন। তবে তার সান্ত্বনার ধরনে ওর দুঃখ-যন্ত্রণা আরেকটু উথলে উঠল মাত্র। সবশেষে বললেন, 'তোমার আম্মাকে বইল, ভাল কোন পীর সাহেব দিয়া ওর জন্য দোয়া করাইতে, পর্দা নামাযের ঘাটতি গুলা যেন মাফ হইয়া যায়।'

বিদায় নিয়ে উঠে পড়ে বীথি। লায়লার জন্য আর অপেক্ষা করে না। বাসায় ফিরেই কথাগুলো আব্বু-আম্মুকে বলে। শূন্য-দৃষ্টিতে বাবা তাকিয়ে থাকলেন। কেঁদে উঠলেন মা। আঁচলে মুখ ঢাকলেন।

বাবা বললেন তাকে একজন শিক্ষিত আলেম বলেছেন দোয়া অথবা ক্ষমা প্রার্থনা মৃতের আত্মীয়-স্বজন-শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিক এবাদত দান-সাদকাহ্ ও মোনাজাতের বিষয় এটা ফরমায়েশ দিয়ে হয় না।

বাবার কথায় ওর অশান্ত মনে একটু স্বস্তি ফিরে এল।

রুমে ফিরে তৃষার পড়ার টেবিলটায় বসল। হায় মৃত্যু! নামটুকু পর্যন্ত মুছে দিয়ে যায়।

তৃষার মৃত্যুর খবর পাবার সাথে সাথেই অনেকেই বাসায় চলে এসেছিল। একের পর এক লোকজন জানতে চাইছিল হাসপাতাল থেকে কখন লাশ আনা হবে কেউ আর তৃষা নামটা উচ্চারণ করছিল না। লাশের গোসল কোথায় হবে। লাশ কোথায় দাফন হবে। শুধুই লাশ আর লাশ উচ্চারণ শুনে শুনে আরো কষ্ট পেয়েছিল ও।

গতরাতটা বলতে গেলে ও নির্ঘুম কাটিয়েছে। গোসল করে দীর্ঘ সময় নিয়ে নামায পড়ল। আল্লাহর কাছে মোনাজাতে হৃদয় উজাড় করে দিল।

নিজের ভেতরের আত্মাটাকে দেখার ভীষণ ইচ্ছে হয় ওর। পৃথিবীর সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোই অদৃশ্য। শ্বাস নেয়ার বাতাসটা অদৃশ্য বাহ্যিক মানুষের ভেতরের আসল মানুষ রূহটাও দেখা যায় না।

বুয়া এসে জানাল, 'একজন মহিলা আপনারে খুঁজতাছে।'

ক্লান্ত পায়ে ড্রইংরুমের দিকে আগায় বীথি। খানিকটা অবাক হয়। খালেদা ম্যাডাম। সালাম দিয়ে সোফার এক কোণায় সংকুচিত হয়ে বসে ও। আকাশী ফুলস্লিভ ব্লাউজের সাথে আকাশী পাড়ের সাদা শাড়িতে ম্যাডামকে খোলা আকাশের নীচের জুঁই ফুল মনে হচ্ছে।

দাঁড়িয়ে পড়েন ম্যাডাম। তোমার আম্মু কোথায় চল দেখা করে আসি।

নিজের রুমেই নিয়ে যায় ও। কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে ওর খাটেই ঘুমিয়ে পড়েছেন মা।

ম্যাডাম পাশের সোফায় বসলেন অর্থসহ সূরা ইয়াসীনের ছোট বইটা তুলে নিলেন হাতে।

বুয়াকে চায়ের কথা বলতে বেরিয়ে যায় বীথি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম ভাঙে মায়ের। পরিচয় করিয়ে দেয় ও– আমাদের বাংলার ম্যাডাম 'খালেদা আপা'।

উঠে বসে হাত মেলান মা। বসে যাওয়া রক্তাভ চোখে তার নিদারূণ ক্লান্তি শূন্যতা।

চুপচাপ দীর্ঘ সময় বসে থাকে তিনজন। মায়ের একটা হাত হাতে তুলে নেন ম্যাডাম।

ডোরবেল বেজে ওঠে। এগিয়ে গিয়ে ড্রইং রুমের আইহোলে চোখ রাখে বীথি। বাদল ভাই। একমুহূর্ত ভাবে; তারপর ওড়নাটা মাথায় দিয়ে চুলগুলো ঢেকে দরজা খুলে দেয়। ওড়নার আঁচলে গলা আর মুখও ঢাকা, শুধু নাক আর চোখ দেখা যাচ্ছে। দূরত্ব বজায় রাখার সুস্পষ্ট সংকেত। মুখ ঢাকা কারো সাথে তো আর গল্প করা যায় না।। অপ্রস্তুত বাদল চুপচাপ সোফায় বসে পড়ে। আম্মুকে ডেকে দিচ্ছি বলে বেরিয়ে যায় ও।

www.pathagar.com

রুমে ফিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ওকে বসতে বলে একটু ধরা গলায় ম্যাডাম বলেন– আমার একটা ছোট বোন ছিল। রাজশাহী মেডিকেল থেকে পাশ করে বেরিয়ে একটা ক্লিনিকে বছর খানেকের মতো সার্ভিসে ছিল। গতবছর ওর ডেঙ্গু জ্বর হল। ক্লিনিকে নেয়া হল। রক্ত দেয়া হল একটার পর একটা ব্যাগ। শেষ পর্যন্ত ক্লিনিকে ভর্তির ছয়দিন পর ও মারা গেল।

ছলছল করছে ম্যাডামের চোখ বীথি ও তার মা কাঁদছে নীরবে।

বুয়া চা নিয়ে আসে।

মুখের ভাষা হারিয়ে চুপচাপ বসে থাকে সবাই। ঠাণ্ডা হতে থাকে চা।

বুয়াই শেষ পর্যন্ত আপেল-বিস্কিট আর চা ধরিয়ে দেয় সবার হাতে।

উদাসীন চোখে ম্যাডামের হাতে চা। যেন অনেক দূরের কিছু দেখছেন। আনমনা থেকেই প্রশ্ন করেন– বীথি তুমি কি সূরা ইয়াসীনের অর্থ পড়েছো?

একটু একটু ম্যাডাম।

মৃতদের জন্য রাসূল [স.] বেশি বেশি সূরা ইয়াসীন পড়তে বলেছেন তাই না?

হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে ও।

আমার ছোট বোন মারা যাবার পর–গত এক বছর আমি জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে জানার চেষ্টা করেছি অনেক বেশি। মনে হয় একজন মানুষের সবচেয়ে সুন্দর মৃত্যুর কথা লেখা আছে সূরার শুরুতেই।

হাবীব নাজ্জার। একজন শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন। থাকতেন প্রাচীন সিরিয়ার ইন্তাকিয়া শহরের শহরতলীতে। শহরবাসীকে ঈমানের দিকে আহ্বান জানাতে গিয়ে তাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে শাহাদাত বরণ করেন। পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তাকে বেহেশত প্রদানের ঘোষণা দেন। ভাল কাজের জন্য সুন্দর মৃত্যু। মৃত্যু তো অনেক রকমেরই হতে পারে। সুন্দর, অসুন্দর, কষ্টের-গর্বের।

শূন্য চায়ের কাপগুলো তুলে নেয় বুয়া।

তৃষার এ্যলবামটা এগিয়ে দেয় বীথি।

দেখা শেষ হলে এ্যলবামটা পাশে রেখে, যাবার উদ্যোগ নেন ম্যাডাম। মায়ের সাথে হাত মেলান। একটা হাত টেনে নিয়ে চুমু খান।

সহানুভূতি প্রকাশের এ নীরব আন্তরিকতা মুগ্ধ করে বীথিকে।

সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেন মা পাশে বীথি।

ম্যাডামকে প্রাণ খুলে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করে ওর। কিন্তু খোদা হাফেজ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারে না।

অনুভূতি প্রকাশের এ অক্ষমতায় মন খারাপ হয়ে যায় বীথির। কষ্ট, স্নেহের স্পর্শ আর অক্ষমতার এক মিশ্র অনুভূতিতে চোখ ভিজে ওঠে তার।

এমনি কত স্নেহ-মমতা, ক্ষমা, ভালবাসা প্রকাশ পারঙ্গমতার অভাবে লুকিয়ে থাকে আমাদের হৃদয়ে; দিন, মাস, বছর, যুগব্যাপী। স্বজন-বন্ধুরা জানতে পারে না কোনদিন।

www.pathagar.com

নিবেদিত কবিতা

বেগম রোকেয়া স্মরণে

মোহাম্মদ মোরশেদ আলী

'আন্‌জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' গড়ি
মুসলিম নারীদের সংগঠিত করি
দীক্ষা দিলে তুমি
সমাজটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল
জীবনটা ছিল মরুভূমি
রাসূলের অনুসৃত নীতি মেনে চলে
জ্বেলে ছিলে এলমের দীপ্ত মশাল
নারীদের অন্তরতলে,
নর-নারী সকলের জন্য ফরজ
যে শিক্ষা ছিল ইতিহাসে
তার লাগি ছিল না গরজ
সমাজের পুরুষ লোকের।
নিজেরা গাফিল ছিল
স্বাধীনতা সভ্যতা ঐতিহ্য ভুলে।
জাতির অর্ধেক অংশ যে নারী সমাজ
তাদেরকে জাগাবার ভার তুলে নিলে
শিক্ষা দিলে ধর্মকে ত্যাগ করে নয়
ধর্মাশ্রিত হয়ে হৃদয়ে জাগাতে হবে আত্মপ্রত্যয়
আজ দেখি নারীমুক্তির নামে
ধর্মচ্যুত রমণী সকল
মুক্তির অমৃত নয় পান করে ধ্বংসের গরল
কোরান সুন্নাহ ভুলে
হাতে নেয় তুলে
আত্ম-হননের অস্ত্র সম্ভার
মানসিক গোলামীর জিনজির পরে সভ্যতার।
জাতি তাই পথহারা হারায়েছে দিশা
মুক্তির আড়ালে নামে অন্ধকার নিশা।
জাতিকে জাগাতে হলে
নারী-নর উভয়ের চাই জাগরণ
জননী রোকেয়া,
চাই আজ তোমার মতই দীপ্ত মন
চাই আল্লাহর পথে
নারীদের জাগাবার মহা আয়োজন।

www.pathagar.com

নিবেদিত কবিতা

বেগম রোকেয়া আপনি কিংবা আপনার সুলতানা

সাবিনা মল্লিক

বেগম রোকেয়া!
আপনি কিংবা আপনার সুলতানা–
ধারণাও করতে পারেননি
নারীরা আজ কত কক্ষচ্যুত!

সাখাওয়াত মোমোরিয়াল স্কুলের
গণ্ডী পেরোনো যে মেয়েটি
কচি কলাপাতা রং শাড়ি পরে
কপালে সোনার টিপটি দিয়ে
পৃথিবীর গেটে এসে দাঁড়িয়ে দেখে
রূদ্ধ হয়ে গেছে দ্বার।
ওপারে পুলিশ প্রহরা.....

আর চারদিকে অজস্র কৌতূহলী চোখ।
কি অপমান! কি অপমান! কি অপমান!
বেগম রোকেয়া!
আপনি কিংবা আপনার সুলতানা
স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি–
নারীরা আজ কত দুর্দশাগ্রস্ত!

এখন ভার্সিটি পাশ সেই নারী
অফিস পাড়ায় ব্যস্ত যাতায়াত।
মুখের হাসিটি অম্লান রাখতে গিয়ে
শুকিয়ে ফেলতে হয় চোখের জল।
মরুভূমি বানিয়ে ফেলে সমগ্র হৃদয়
বেগম রোকেয়া!
আপনি কিংবা আপনার সুলতানা
কল্পনাও করতে পারেননি
নারীরা আজ কত বেদনাগ্রস্ত!

www.pathagar.com

জীবনপঞ্জি

১৮৮০ জন্ম

বাবা: জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের [মৃত্যু ১৯১৮]।

মা: রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী [মৃত্যু ১৯১২]

প্রথম ভাই : মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের।

দ্বিতীয় ভাই : খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবের [মৃত্যু ১৯২৪]।

তৃতীয় ভাই : মোহাম্মদ ইসরাইল আবু জাফস সাবের [ছোটবেলায় মৃত]।

প্রথম বোন : করিমুন্নেসা খানম [১৮৫৫–১৯২৬]

দ্বিতীয় বোন : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন [১৮৮০–১৯৩২]

তৃতীয় বোন : হোমায়রা তোফাজ্জল হোসেন [১৮৮৩–১৯৬২]

১৮৮৫ বড় ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বড় বোন করিমুন্নেসার বাড়িতে ইয়োরোপিয়ান গভর্নেসের কাছে ইংরেজি অক্ষর পরিচয়।

১৮৯৮ বিবাহ

স্বামী : খানবাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন, বি.এ. এম, আর, এ. সি. [১৮৫৮–১৯০৯]

বিহারের ভাগলপুরের অধিবাসী সাখাওয়াত হোসেন।

বিয়ের সময় উড়িষ্যার কনিকা স্টেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিযুক্ত ম্যানেজার। এ বিয়েতে দু'টি কন্যাসন্তানের জন্ম। একজন চার মাস বয়সে ও অন্যজন পাঁচ মাস বয়সে লোকান্তরিত।

১৮৯৯ সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন ভাগলপুরের কমিশনারের পার্সোনাল এ্যাসিসট্যান্ট।

১৯০২ সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ।

প্রথম রচনা : পিপাসা [মহরম]।

পত্রিকার নাম : 'নবপ্রভা' [ফাল্গুন ১৩০৮ কলকাতা]

সম্পাদক : হরেন্দ্রলাল রায় ও জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

১৯০৪ দার্জিলিং ভ্রমণ।

মতিচূর [প্রথম খণ্ড] প্রকাশিত [১৫ ডিসেম্বর]।

প্রকাশক : ম্যানেজার, নবনূর, কড়েয়া, কলকাতা [১৩১১]।

১৯০৫ প্রথম ইংরেজি রচনা 'Sultana's Dream'।

পত্রিকার নাম : 'Indian Ladies Magazine [Madras]

সম্পাদক : কমলা মাতমিয়া নাথান ও সরোজিনী নাইডু।

www.pathagar.com

১৯০৭ 'মতিচূরে'র [প্রথম খণ্ড] দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত।
প্রকাশক : শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা।

১৯০৮ 'Sultana's Dream' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
প্রকাশক : S.K. Lahiri & Co,
44, College street, Calcutta।

১৯০৯ সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের পরলোক গমন—৩রা মে, কলকাতা। ভাগলপুরে সমাহিত।
ভাগলপুরের তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ শাহ আবদুল মালেকের সরকারি বাসভবন 'গোলকুঠি'তে ১লা অক্টোবর সাখাওয়াত মোমোরিয়াল গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠা পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে। সৈয়দ শাহ আবদুল মালেকের চার মেয়ে স্কুলের ছাত্রী—
১. সৈয়দা কানিজ ফাতেমা ২. সৈয়দা আমাতুজ জোহরা ৩. সৈয়দা হাসিনা খাতুন [পরবর্তীকালে হাসিনা মোর্শেদ] ৪. সৈয়দা আহসানা খাতুন।
এইসব ছাত্রী কর্তৃক রোকেয়াকে 'স্কুল কি ফুপ্পি' বলে সম্বোধন। স্বামীর মৃত্যুর পর ভাগলপুরের কমিশনারের ব্যবস্থায় সৈয়দ শাহ আবদুল মালেকের বাড়িতে অবস্থান। পঞ্চম ছাত্রীর পরিচয় অজ্ঞাত।

১৯১০ ছোটবোন হোমায়রা তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে আমীর হোসেন চৌধুরীর জন্ম গ্রহণ—সেপ্টেম্বর।
ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে সৈয়দ শাহ আবদুল মালেকের ছোট ভাই সৈয়দ আব্দুস সালেকের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ—৩ ডিসেম্বর।

১৯১১ দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ১৬ মার্চ পর্যায়ে কলকাতায় সাখাওয়াত মোমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা আটজন ছাত্রী নিয়ে ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের ভাড়া বাড়িতে।
বাড়ি ভাড়া করার পর এ বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ।

ছাত্রীদের পরিচয়

ছাত্রীদের নাম	বাবার নাম
১. আখতারুন্নেসা [সম্প্রতি পরলোকগত]	সৈয়দ আহমদ আলী [স্কুলের সেক্রেটারি]
২. জোহরা	
৩. মোনা	মওলনা মোহাম্মদ আলী [বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ]
৪. রাজিয়া খাতুন	আবদুর রব [স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য]

www.pathagar.com

৫. জানি বেগম — ড. ওহাব
৬. সৈয়দা কানিজ ফাতেমা — সৈয়দ আবদুস সালেক
৭. সৈয়দা সাকিনা

[এ দুজন কর্তৃক রোকেয়াকে 'স্কুল কি ফুপ্পি' বলে সম্বোধন]

৮. অষ্টম ছাত্রীর পরিচয় অজ্ঞাত।

ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের ১৪ নম্বর রয়েড স্ট্রিটের বাড়িতে এক মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৌলবী সৈয়দ আহমদ আলী সেক্রেটারি নিযুক্ত। স্কুলের নামকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ—২ এপ্রিল।

বার্মা ব্যাংক ফেল হয়ে স্কুলের ১০,০০০.০০ [দশ হাজার] টাকা লোকসান—নভেম্বর। বোম্বের বাহরামজি মারওয়ানজি মালাবারি ও কলকাতার নওয়াব বদরুদ্দিন হায়দারের কাছ থেকে স্কুলের জন্য আর্থিক সাহায্যলাভ।

১৯১২ মা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানীর পরলোক গমন—কলকাতা।

৪ নম্বর মেডিক্যাল কলেজ রোডে Turkish Relief Fund -এর সভায় বক্তৃতা প্রদান—১৬ ফেব্রুয়ারি।

হিজ হাইনেস দি আগা খানের ৩০০.০০ [তিনশ] টাকা ব্যক্তিগত সাহায্য প্রদান বি.এম. মালাবারির মাধ্যমে।

বাহরামজি মারোয়ানজি মালাবারির লেডি হার্ডিঞ্জ মারফত আবার ৩০.০০ [ত্রিশ] টাকা প্রেরণ।

প্রথম মাসিক সরকারি সাহায্য ৭১.০০ [একাত্তর] টাকা বরাদ্দ—১লা এপ্রিল।

ছাত্রীসংখ্যা—২৭।

১৯১৩ বাবা জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবেরের পরলোকগমন—পায়রাবন্দ, রংপুর, ৩১ বৈশাখ, ১৩২০।

১৩ নং ইয়োরোপিয়ান এ্যাসাইলাম লেনে স্কুল স্থানান্তরিত—৯ই মে।

ইংরেজি কবিতা রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে রূপার শামাদান [মোমবাতি-দান] পুরস্কার লাভ—সেপ্টেম্বর।

ছাত্রীদের স্কুলে আনা নেওয়া করার জন্য ঘোড়ার গাড়ির অর্ধেক দাম ৭৫০.০০ [সাড়ে সাতশ] টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।

ছাত্রীসংখ্যা—৩০।

১৯১৪ ছোট লাট পত্নী লেডি কারমাইকেলের ৩০০.০০ [তিনশ] টাকা বিশেষ সাহয্য প্রদান।

বার্ধিত মাসিক সরকারি সাহায্য ৪৪৮.০০ [চারশ আটচল্লিশ] টাকা।

ছাত্রী সংখ্যা—৩৯

১৯১৫ পঞ্চম শ্রেণী শুরু করার পর স্কুল উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালয়ে উন্নীত।

৮৬/এ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে স্কুল স্থানান্তরিত—২৭ ফেব্রুয়ারি।

www.pathagar.com

দুইটি ঘোড়াটানা বাসগাড়ি ক্রয়—প্রথমটা বছরের শুরুতে, দ্বিতীয়টা জুন মাসে।

১৯১৩ সনে প্রাপ্ত সরকারি সাহায্য ৭৫০.০০ [সাড়ে সাতশ] টাকা প্রথম গাড়ির জন্য ব্যয়িত।

ছাত্রী সংখ্যা—৮৪

১৯১৬ তৃতীয় ঘোড়াটানা বাসগাড়ি ক্রয়। মওলানা: আবদুল করিমের স্ত্রী আয়শা খাতুনের অর্ধেক দাম ৪৫০.০০ [সাড়ে চারশত] টাকা প্রদান—২১ ফেব্রুয়ারি।

আয়েশা খাতুনকে সভানেত্রী করে এবং নিজে সাধারণ সম্পাদিকা হয়ে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' নামের মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা।

দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সরোজিনী নাইডুর পত্র প্রেরণ—১৬ সেপ্টেম্বর।

ছাত্রী সংখ্যা—১০৫

১৯১৭ বছরের শুরুতে বাংলা ক্লাসের [শাখার] প্রবর্তন।

বড়লাট পত্নী লেডি চেমসফোর্ডের স্কুল পরির্দশন—৯ জানুয়ারি।

লেডি চেমসফোর্ডের সহায়তায় ষষ্ঠ শ্রেণী আরম্ভ করে মধ্য ইংরেজি স্কুলে পরিণত।

ছোটলাট-পত্নী লেডি কারমাইকেলের মেধাবী ছাত্রীদের মধ্যে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ—১৫ মার্চ।

আয়েশা খাতুনের সভানেত্রীত্বে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামে'র প্রথম বার্ষিক সভা ৮৬/এ, লোয়ার সার্কুলার রোডে অনুষ্ঠিত—১৫ এপ্রিল।

ছাত্রী সংখ্যা—১০৭

১৯১৮ 'সওগাত' পত্রিকার প্রকাশনাকে অভিনন্দন জানিয়ে 'সওগাত' নামের কবিতা রচনা—নভেম্বর।

চতুর্থ ঘোড়াটানা বাসগাড়ি ক্রয়। মূল্যের ১১০৮.০০ [এগারশ আট] টাকার মধ্যে ৫৫০.০০ [সাড়ে পাঁচশ] টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।

হোমায়রা তোফাজ্জল হোসেনের মেয়ে নূর ওম্মেদের জন্ম—[১৫ই ডিসেম্বর]।

ছাত্রী সংখ্যা—১১৪

১৯১৯ ছাত্রীর অভাবে বাংলা শাখা বন্ধ ঘোষণা।

ছাত্রী সংখ্যা—১২৩

১৯২০ কলকাতা টাউনহলে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে সভানেত্রী নির্বাচিত ও 'শিশু পালন' নামের প্রবন্ধ পাঠ—৬ এপ্রিল। পরে 'বঙ্গীয় মুসলমান- সাহিত্য-পত্রিকায়-প্রকাশিত—কার্তিক, ১৩২৭।

ছাত্রী সংখ্যা—১২৬

১৯২১ দ্বিতীয় ভাই ও ঢাকার অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট হাফেজ খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবেরের দ্বিতীয় মেয়ে আজিজুন্নেসা উম্মে সাকিনা সুফিয়া খাতুনের বিয়ে উপলক্ষে

www.pathagar.com

ঢাকা আগমন ও বেশ কিছুদিন ঢাকায় অবস্থান। পুরনো ঢাকায় অবস্থিত দ্বিতীয় ভ্রাতৃবধুর সে বাড়ি আজো বর্তমান।

ছাত্রী সংখ্যা—১২১

১৯২২ মতিচূর [দ্বিতীয় খণ্ড] প্রকাশিত, ১০ মার্চ। প্রকাশক : গ্রন্থকর্ত্রী স্বয়ং।

সমাজের পতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনকল্পে ডাঃ লুৎফর রহমান প্রতিষ্ঠিত 'নারীতীর্থে'র সভানেত্রী।

প্রথমিক চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ৫০.০০ [পঞ্চাশ] টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।

ছাত্রী সংখ্যা—১১৪

১৯২৩ আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১৫০.০০ [দেড়শ] টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।

ছাত্রী সংখ্যা—১২২

১৯২৪ 'পদ্মরাগ' উপন্যাস প্রকাশিত। প্রকাশক : গ্রন্থকর্ত্রী স্বয়ং।

দ্বিতীয় ভাই হাফেজ খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবেরের পরলোক গমন—ঢাকা।

আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১০০.০০ [একশ] টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।

শিউড়ি মুসলিম বালিকা মক্তবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভানেত্রী।

ছাত্রী সংখ্যা—১২০

১৯২৫ বর্দ্ধিত মাসিক সরকারি সাহায্য ৫৫০.০০ [সাড়ে পাঁচশ] টাকা লাভ—ফেব্রুয়ারি।

পঞ্চম ঘোড়াটানা বাসগাড়ি ক্রয়।

লাইব্রেরির জন্য ৭০০.০০ [সাতশ] টাকা সরকারি সাহায্য লাভ

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী [পঞ্চাশ বছর পূর্তি] উপলক্ষে আয়োজিত 'অল ইণ্ডিয়া মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে 'আলিগড় মহিলা সমিতি'র আমন্ত্রণে তিনদিনের জন্য আলিগড়ে গমন এবং বোরকা ঢাকা অবস্থায় বক্তৃতা প্রদান করে প্রশংসা লাভ—২৬-২৮ ডিসেম্বর।

ছাত্রী সংখ্যা—১০৪

১৯২৬ বড় বোন করিমুন্নেসার পরলোকগমন—৬ সেপ্টেম্বর।

প্রথম মোটর বাস ক্রয় এবং এ বাবদ ৫০০০.০০ [পাঁচ হাজার] টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।

৪০ জন ছাত্রী পাওয়া গেলে বাংলা শাখা আবার প্রবর্তন করার ইচ্ছা প্রকাশ

ছাত্রী সংখ্যা—১০৯

১৯২৭ ৭ জন ছাত্রী নিয়ে 4 class অর্থাৎ এখনকার ৭ম শ্রেণী শুরু করে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের সূচনা।

কিণ্ডারগার্টেন শাখার প্রবর্তন।

ইয়াং ক্রিশ্চিয়ান উইমেনস এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে চতুর্থ দিবসের অধিবেশনের সভানেত্রী হিসেবে ভাষণদান—১৯ ফেব্রুয়ারি। বিভিন্ন নামে এ ভাষণ সাপ্তাহিক 'সত্যাগ্রহী', 'সাহিত্যিক', 'সওগাত' ও 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত।

ছাত্রী সংখ্যা—১২৮

www.pathagar.com

১৯২৮ বর্ধিত মাসিক সরকারি সাহায্য ৭৫০.০০ [সাড়ে সাত শত] টাকা লাভ [মার্চ]।
দ্বিতীয় মোটর বাস ক্রয়। এ বাবদ ৪৭২৫.০০ [চার হাজার সাতশ পাঁচিশ] টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।
আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৭৫০.০০ [সাড়ে সাতশ] টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।
লাইব্রেরির জন্য ৫০০.০০ [পাঁচশ] টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।
ছাত্রী সংখ্যা—১৪৯ [১২ জন আবাসিক]।

১৯২৯ ছাত্রী সংখ্যা—১৩৩।

১৯৩০ লেডি জ্যাকসনের ২৫০.০০ [আড়াইশ] টাকা সাহায্য প্রদান।
দশম শ্রেণী পর্যন্ত শুরু করে পূর্ণ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত।
বাংলার প্রথম মুসলমান পাইলট মোরাদের সঙ্গে আকাশ ভ্রমণ—২ ডিসেম্বর।
ছাত্রী সংখ্যা—১২৩

১৯৩১ পঞ্চম বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে 'Educational Ideals for the Modern Indian Girl's প্রবন্ধ পাঠ—১৯ ফেব্রুয়ারি। পরে 'দি মুসলমান' পত্রিকায় প্রকাশিত—৫ মার্চ, ১৯৩১।
স্কুল পরিচালনা কমিটির অধিবেশনে সেক্রেটারি খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদ কর্তৃক রোকেয়া রচিত 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' ভাষণ পাঠ—মার্চ। পরে 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।
তিনজন মুসলমান মেয়ের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ।
ছোটবোন হোমায়রা তোফাজ্জল হোসেনের মেয়ে নূর উম্মেদের অকালমৃত্যু—১৮ এপ্রিল।
সরকারি চাকরির বদলিজনিত কারণে খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদের সেক্রেটারি হিসেবে পদত্যাগ। ৭ জুলাই।
নতুন সেক্রেটারি ওয়ালিউল ইসলামের যোগদান—৫ আগস্ট।।
'অবরোধবাসিনী' প্রকাশিত—২৮ অক্টোবর। প্রকাশক : মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ৯১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১৯৩২ ১৬২ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে স্কুল স্থানান্তরিত—জুন।
ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্রীদের পাশের হার-৭৫%।
শেষ রচনা 'নারীর অধিকার'—৮ ডিসেম্বর, রাত ১১টা। ১৩৬৪/১৯৫৮ মাঘ মাসের 'মাহে'নও পত্রিকায় মরণোত্তর প্রকাশিত।
মহাপ্রয়াণ—৯ ডিসেম্বর, ফজরের আযানের পর।
কায়সার স্ট্রিটের বুআলী কলন্দর মসজিদে জুম্মার নামাজের পর জানাজা অনুষ্ঠিত। জানাজায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ: শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, স্যার আবদুল

www.pathagar.com

করিম গজনভী, নবাব কে.জি.এম. ফারুকী, খাজা নাজিমুদ্দিন, ড: আর. আহমদ, মৌরভী মজিবর রহমান, খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদ, নবাবজাদা কামরুদ্দিন হায়দার, মওলানা আবদুর রহমান, রেজাউর রহমান, খান বহাদুর তোফাজ্জল আহমদ, আমিন আহমদ।

আত্মীয় মওলানা আবদুর রহমান খানের পারিবারিক কবরস্থান কলকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরের শুখচরে সমাহিত—৯ ডিসেম্বর।

বাংলার গভর্ণর জন এ্যাণ্ডারসনের শোকবাণী প্রেরণ।

দৈনিক পত্রিকাসমূহের পৃষ্ঠায় মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত—১০ ডিসেম্বর।

দি মুসলমানের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ—১১ ডিসেম্বর।

কলকাতা কর্পোরেশনে শোক-সভা।

কলকাতা এলবার্ট ইনস্টিটিউট হলে শোকসভা। উদ্যোক্তা : বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ও আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম। সভানেত্রী : কলিকাতা গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মিসেস সরলা রায় [ডা; পি.কে.রায়ের স্ত্রী ও দুর্গামোহন দাসের মেয়ে] ১৫ ডিসেম্বর।

'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' আয়োজিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রাঙ্গণে পৃথক শোকসভা। সভানেত্রী : লেডি আবদুর রহিম। বেনিয়াপুকুর রোড অথবা অন্য কোনো রাস্তার নাম পরিবর্তন করে রোকেয়ার নামে করার জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের নিকট প্রস্তাব পেশ ১৮ ডিসেম্বর।

'মোহাম্মদীর 'মরহুম মিসেস আর.এস. হোসেন' নামে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ—মাঘ, ১৩৩৯।

১৯৩৫ G.O. No 4404 Edn (s) বলে সরকারের সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ ১৯ ডিসেম্বর।

১৯৩৬ মিস ভারতী চক্রবর্তী প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত—২রা জানুয়ারি।

১৯৩৭ রোকেয়া সংক্রান্ত প্রথম বই শামসুননাহার মাহমুদ রচিত 'রোকেয়া জীবনী' প্রকাশিত—অক্টোবর।

১৯৬৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের নামকরণ—'রোকেয়া হল'—নভেম্বর।

১৯৬৫ রোকেয়া সংক্রান্ত দ্বিতীয় বই শামসুননাহারের পুত্রবধূ ও রোকেয়ার চাচাতো বোনের মেয়ে মোশফেকা মাহমুদ রচিত 'পত্রে রোকেয়া পরিচিতি' প্রকাশিত—ফেব্রুয়ারী।

১৯৭৩ আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'রোকেয়া-রচনাবলী' প্রকাশিত। এই রচনাবলতিে রোকেয়ার পূর্ণাঙ্গ রচনা প্রথমবারের মতো উপস্থাপিত।

১৯৮০ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি : সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে রোকেয়ার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত। বাংলাদেশ ডাকবিভাগ থেকে দুটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত।

www.pathagar.com

পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার তালিকা

নবপ্রভা

[সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায়]

১. পিপাসা। প্রবন্ধ। ফাল্গুন ১৩০৮।

মহিলা

[সম্পাদক : গিরিশচন্দ্র সেন]

১. অলংকার না badge of slavery। প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩১০।
২. ঐ [দ্বিতীয় কিস্তি]। প্রবন্ধ। জৈষ্ঠ ১৩১০।
৩. ঐ [তৃতীয় কিস্তি] প্রবন্ধ। আষাঢ় ১৩১০।
৪. প্রভাতেরর শশী। কবিতা। বৈশাখ ১৩১১।
৫. পরিতৃপ্তি। কবিতা। জৈষ্ঠ ১৩১১।
৬. স্বার্থপরতা। কবিতা। আষাঢ় ১৩১১।
৭. কূপমণ্ডূকের হিমালয় দর্শন। ভ্রমণকাহিনী। কার্তিক ১৩১১।
৮. কাঞ্চনজঙ্ঘা। কবিতা। পৌষ ১৩১১।
৯. প্রবাসী রবিন ও তাহার জন্মভূমি। কবিতা। মাঘ ১৩১১।
১০. নারী-পূজা। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩১২, মাঘ ১৩১২ ও ফাল্গুন ১৩১২।
১১. মোসলমান-কন্যার পুস্তক সমালোচনা। প্রবন্ধ। ভাদ্র ১৩১৩।
১২. দজ্জাল। প্রবন্ধ। ভাদ্র ১৩১৪।

নবনূর

[মাসিক। সম্পাদক : সৈয়দ এমদাদ আলী]

১. নিরীহ বাঙ্গালী। প্রবন্ধ। মাঘ ১৩১০। ১ : ১০।
২. বাসিফুল। কবিতা। ফাল্গুন ১৩১০। ১ : ১১।
৩. শশধর। কবিতা। চৈত্র ১৩১০। ১ : ১২।
৪. বোরকা। প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩১১। ২ : ১।
৫. নলিনী ও কুমুদ। কবিতা। আষাঢ় ১৩১১। ২ : ৩।
৬. আমাদের অবনতি[১]। প্রবন্ধ ভাদ্র ১৩১১। ২ : ৫।
৭. গৃহ। প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩১১। ২ : ৬।
৮. অর্ধাঙ্গী। প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩১১। ২ : ৬।
৯. রসনা-পূজা। প্রবন্ধ। অগ্রহায়ণ ১৩১১। ২ : ৮।
১০. কাঞ্চনজঙ্ঘা। কবিতা। পৌষ ১৩১১। ২ : ৯।
১১. ভ্রাতা-ভগ্নী। প্রবন্ধ। জ্যৈষ্ঠ ১৩১২। ৩ :২।
১২. ঈদ-সম্মিলন। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩১২। ৩ : ৯।
১৩. সৌর-জগৎ। গল্প। ফাল্গুন ১৩১২। ৩ : ১১।
১৪. সৌরজগৎ। গল্প। চৈত্র ১৩১২। ৩ : ১২।
১৫. আশা-জ্যোতিঃ[২]। প্রবন্ধ। জৈষ্ঠ ১৩১৩। ৪ : ২।

www.pathagar.com

ভারত-মহিলা

১. প্রেম-রহস্য। রস-রচনা। শ্রবণ ১৩১৩। ১ : ১২।

আল-এসলাম

[মাসিক। সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ]

১. নূর-ইসলাম। জৈষ্ঠ ১৩২২। ১ : ২।
২. নূর-ইসলাম। আষাঢ় ১৩২২। ১ : ৩।
৩ নূর-ইসলাম। আষাঢ় ১৩২৩। ২ : ৩।

বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা

[ত্রৈমাসিক। সম্পাদক : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক]

১. পুরুষ সৃষ্টির অবতারণা। গল্প। শ্রবণ ১৩২৭। ৩ : ২।
২. একটি ভাষণ[৩]। কার্তিক ১৩২৭। ৩ : ৩।
৩. চাষার দুক্ষু। প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩২৮। ৪ : ১।
৪. মুক্তি-ফল। প্রবন্ধ। শ্রাবণ ১৩২৮। ৪ : ২।
৫. এণ্ডি শিল্প। প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩২৮। ৪ : ৩।

সওগাত

[মাসিক। সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন]

১. সওগাত। কবিতা। অগ্রহায়ণ ১৩২৫। ১ : ১।
২. সিসেম ফাঁক। প্রবন্ধ। অগ্রহায়ণ ১৩২৫। ১ : ১।
৩. নারী-সৃষ্টি। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩২৫। ১ : ১।
৪. রাঙ ও সোনা। প্রবন্ধ [প্রতিবাদ]। আশ্বিন ১৩৩৩। ৪ : ৪।
৫. পরী ঢিবি। প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩৩৩। ৪ : ৫।
৬. বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি[৪]। প্রবন্ধ। চৈত্র ১৩৩৩। ৪ : ১০।
৭. লুকানো রতন। স্মৃতিকথা। আষাঢ় ১৩৩৪। ৫ : ১।
৮. বেগম তরজীর সহিত সাক্ষাৎ। অনুবাদ-প্রবন্ধ। ভাদ্র ১৩৩৬।
৯. ৭০০ স্কুলের দেশে। প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩৩৭।

সাধনা

[মাসিক। সম্পাদক : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আবদুর রশীদ সিদ্দিকী]

১. আফীল। কবিতা। ফালগুন ১৩২৮।

ধূমকেতু

[অর্ধ-সাপ্তাহিক। সম্পাদক : কাজী নজরুল ইসলাম]

১. পিপাসা[৫]। কথিকা। ভাদ্র ১৩২৯। মোহররম সংখ্যা।
২. নিরুপম বীর। কবিতা। ৫ই আশ্বিন ১৩২৯। ১ : ১১।

www.pathagar.com

বার্ষিক সওগাত

[বার্ষিক। সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন]

১. তিন কুঁড়ে। প্রবন্ধ। বার্ষিক সওগাত ১৩৩৩।

নওরোজ

[মাসিক। সম্পাদক : মোহাম্মদ আফজাল-উল হক]

১. বলিগর্ত্ত। গল্প। আশ্বিন ১৩৩৪। ১ : ৪।

মোহাম্মদী

[মাসিক। সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরাম খাঁ]

১. রানী ভিখারিনী। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩৩৪। ১ : ৬।

২. বলিগর্ত্ত[৬]। গল্প। জৈষ্ঠ ১৩৩৫। ১ : ৮।

৩. অবরোধ-বাসিনী [১-৭]। প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩৩৫। ২ : ১।

৪. উন্নতির পথে। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩৩৫। ২ : ৩।

৫. পঁয়ত্রিশ মণ খানা। প্রবন্ধ। চৈত্র ১৩৩৫। ২ : ৬।

৬. অবরোধ-বাসিনী [৮-১৭]। প্রবন্ধ। ভাদ্র ১৩৩৬। ২ : ১১।

৭. অবরোধ-বাসিনী [১৮-২৩]। শ্রাবণ ১৩৩৭।

৮. অবরোধ-বাসিনী [২৪-৩০][৭]। ভাদ্র ১৩৩৭।

৯. বিয়ে-পাগলা বুড়ো। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩৩৭।

১০. ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম[৮]। প্রবন্ধ। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

১১. হজ্বের ময়দানে। প্রবন্ধ। বৈশাখ ১৩৩৯।

সাহিত্যিক

[মাসিক। সম্পাদক : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ও গোলাম মোস্তফা]

১. সভানেত্রীর অভিভাষণ। ফাল্গুন ১৩৩৩। ১ : ৪।

সবুজপত্র

[মাসিক। সম্পাদক : প্রমথ চৌধুরী]

১. অভিভাষণ। চৈত্র ১৩৩৩। ১০ : ৬।

মোয়াজ্জিন

[ত্রৈমাসিক। সম্পাদক : সৈয়দ আবদুর রব]

১. সুবেহ-সাদেক। প্রবন্ধ। আষাঢ়-শ্রবণ ১৩৩৭।

২. বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল। প্রবন্ধ। অগ্রহায়ণ ১৩৩৯।

বঙ্গলক্ষ্মী

১. 'কাটা মুণ্ডু কথা কয়'। প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৩২।

গুলিস্তাঁ

১. গুলিস্তাঁ। প্রবন্ধ। পৌষ ১৩৩৯।

২. কৌতুক-কণা। প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৩৯।

www.pathagar.com

Indian Ladies Magazine

1. Sultana's Dream, 1905.

The Mussalman

[Editor : Mujibar Rahman]

1. A Prosposed Girls; School. Jan. 10. 1911.
2. The Sakhawat Memorial Girls' School. Jan. 10. 1913.
3. Sakhawat Memorial Girls' School.
4. Sakhawat Memorial Girls' School and Bengali Teaching. Dec. 20. 1918.
5. All India Muslim Ladies' Conference. Feb. 7. 1919.
6. Muslim Ladies' Conference ends in a Fiasco. Feb. 12. 1919.
7. The Muslim Ladies' Conference : A Rejoinder. April 4. 1919.
8. God gives, Man robs, Dec. 6. 1927.
9. Educational Ideals for the Modern Indian Girls. Mar. 5. 1931.

মাহে-নও

[মাসিক। সম্পাদক : আবদুল কাদির]

১. নারীর অধিকার। প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৬৪।

.....

"মতিচূর"-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপনের ঐ-ঐ গ্রন্থভূর্ত প্রবন্ধের প্রকাশস্থল হিসেবে কয়েকটি পত্রিকার কথা উল্লিখিত হয়েছে। তার মধ্যে আমি দেখিনি 'নবপ্রভা', 'মহিলা', 'ভারত-মহিলা' প্রভৃতি পত্রিকা। 'Sultana's Dream' রচনাটি 'Indian Ladies' Magazine' পত্রিকায় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে বলে লেখিকা-কর্তৃক অনূদিত 'সুলতানার স্বপ্ন' ["মতিচূর", 'ইতিপূর্বে 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের কোন অংশ কোন পত্রিকায় প্যকাশিত হয় নাই।' প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য নিচে উল্লিখিত হলো :

১. এই প্রবন্ধের গ্রন্থিত ['মতিচূর', প্রথম খণ্ড] শিরোনাম : 'স্ত্রীজাতির অবনতি'। 'মূল প্রবন্ধের ২৩শ থেকে ২৭শ পর্যন্ত পাঁচটি অনুচ্ছেদ গ্রন্থে পরিবর্জিত হয়ে সে-স্থলে নূতন সাতটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে।' পরিত্যক্ত পাঁচটি অনুচ্ছেদ বো.ব.র; সম্পাদকের নিবেদনে উদ্ধৃত।

২. 'আশা-জ্যোতিঃ' প্রবন্ধটি সংগ্রহ করা যায়নি। বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরিতে 'নবনূর'-এর এই সংখ্যার মূদ্রিত অংশটি ছিন্ন। মুহম্মদ শামসুল আলমের 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে অন্তর্ভূত 'আশা-জ্যোতি;' প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত মনে হয়।

৩. এই ভাষণটি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল কলিকাতা টাউন হলে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে পঠিত' হয়।

www.pathagar.com

৪. ভাষণ। –এ Bengal Women's Educational Conference–এ [বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে] পঠিত।
৫. এটি পুনর্মুদ্রন। প্রথমে 'নবপ্রভা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
৬. একই লেখা প্রকাশিত হয়েছে 'নওরোজ' ও 'মোহাম্মদী'তে।
৭. 'অবরোধ-বাসিনী'র গ্রন্থভূর্ত ঘটনা ৪৭টি। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় ৩০টি অংশ প্রকাশিত হয়েছিলো। ভাদ্র ১৩৭৭-এর 'মোহাম্মদী'তে লেখা ছিলো 'সমাপ্ত'।
৮. ভাষণ। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ রোকেয়ার এই লিখিত ভাষণটি 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে'র ম্যানেজিং কমিটির অধিবেশনে স্কুলের সেক্রেটারি সৈয়দ আহমদ আলী কর্তৃক পঠিত হয়।

[উৎস : বাংলা একাডেমি প্রকাশিত "রোকেয়া রচনাবলী" থেকে সংকলিত]

পায়রাবন্দের প্রবেশ পথ, ঢাকা রংপুর হাই রোড থেকে নেমে গেছে।
দৈনিক ইনকিলাবের সৌজন্যে প্রাপ্ত

www.pathagar.com

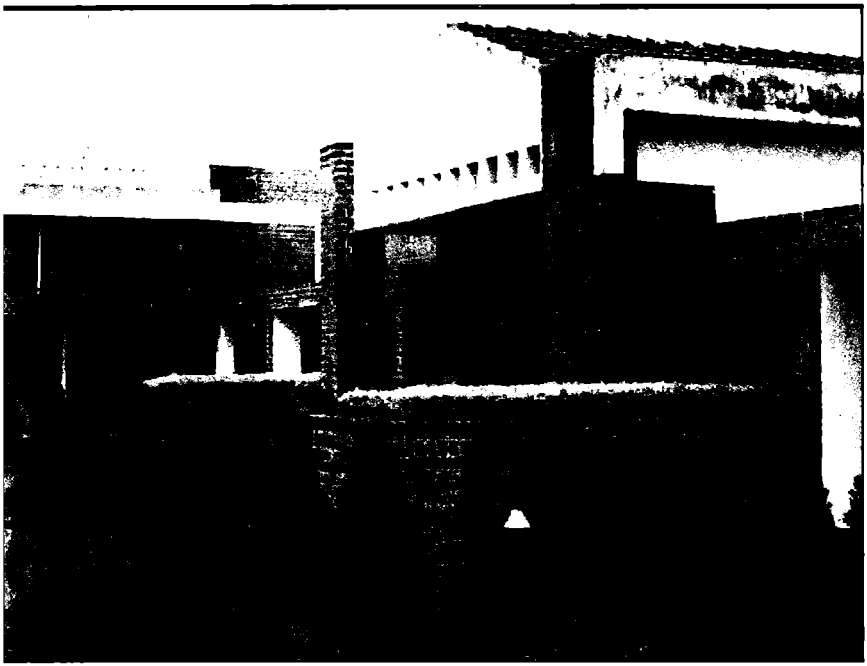

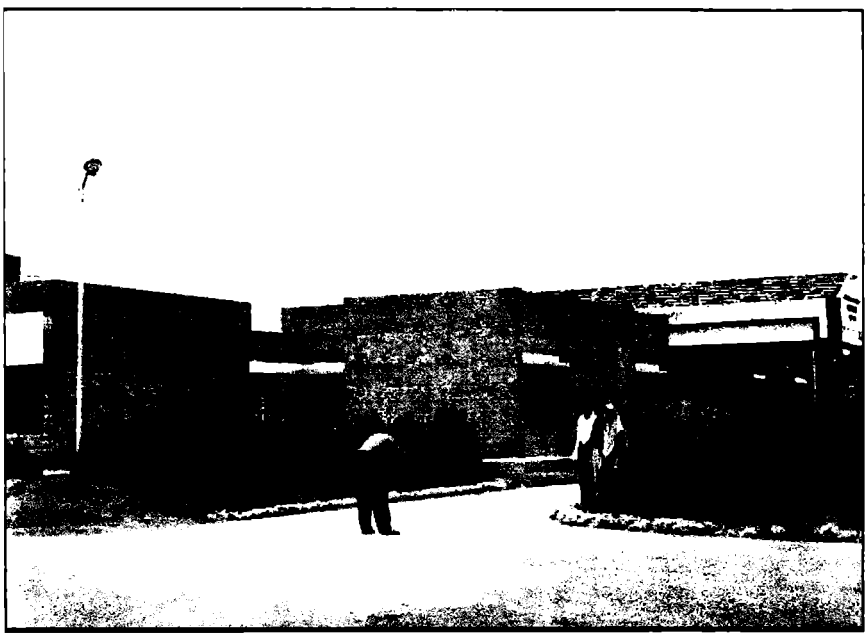

পায়রাবন্দে প্রতিষ্ঠিত নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র
উপরে স্মৃতিকেন্দ্রের অভ্যন্তর ভাগের একাংশ

www.pathagar.com

পায়রাবন্দে প্রতিষ্ঠিত বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্রের পাঠাগারের একাংশ

www.pathagar.com

পায়রাবন্দ বেগম রোকেয়া মোমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন

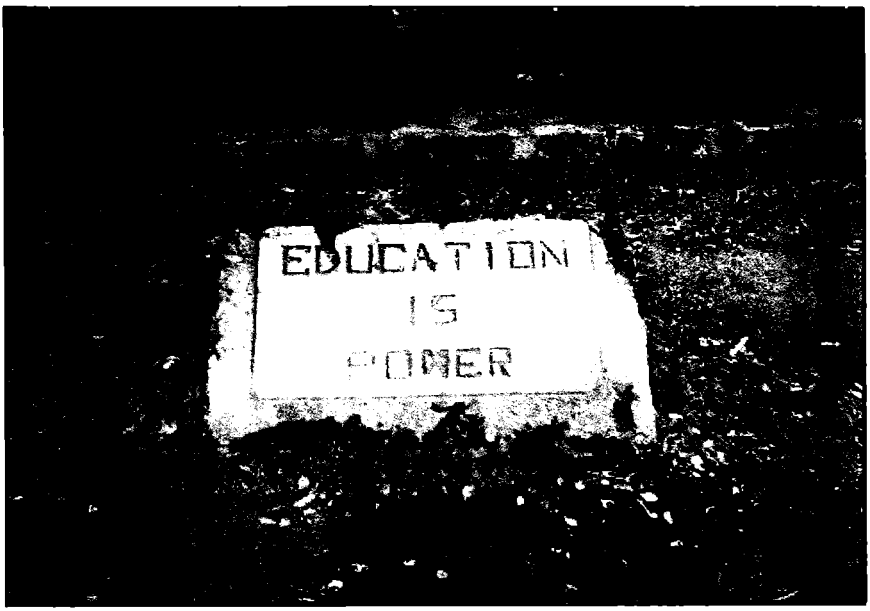

পায়রাবন্দ বেগম রোকেয়া মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে স্থাপিত বাণী চিরন্তন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রংপুর পায়রাবন্দ গ্রামে বেগম রোকেয়ার পিত্রালয়ের ধ্বংসাবশেষ

পায়রাবন্দে বেগম রোকেয়ার পিতা-মাতার অরক্ষিত কবরস্থান

www.pathagar.com

একাডেমিক ভবন, সরকারী বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর

www.pathagar.com

রংপুর জুম্মাপাড়ায় অবস্থিত বেগম রোকেয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
উপরে স্কুলের প্রধান ফটক

www.pathagar.com

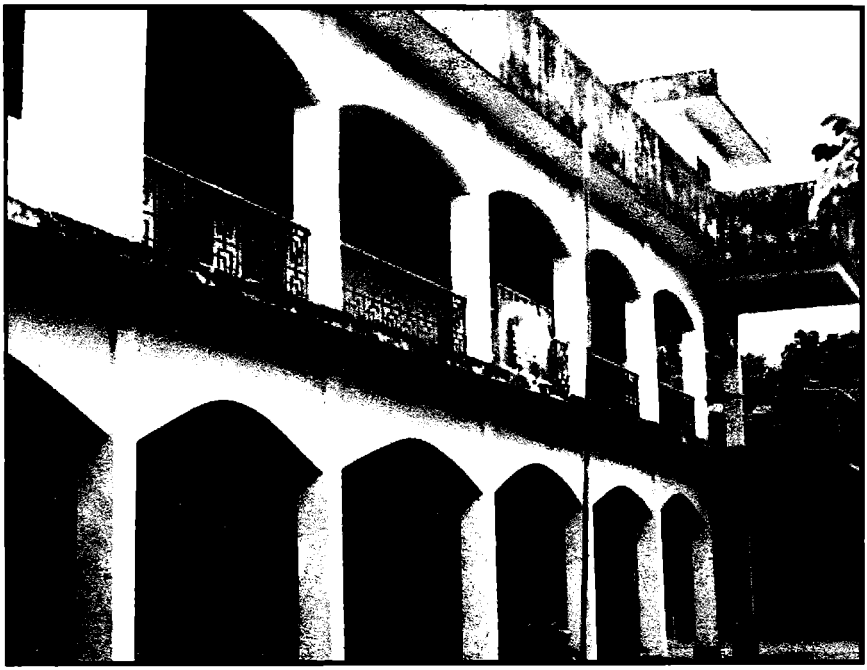

বেগম রোকেয়া মেমোরিয়াল ভবন, পায়রাবন্দ, মিঠাপুকুর, রংপুর

রংপুর কারমাইকেল কলেজের বেগম রোকেয়া ছাত্রী নিবাসের প্রধান ফটক
দৈনিক ইনকিলাবের সৌজন্যে প্রাপ্ত

www.pathagar.com

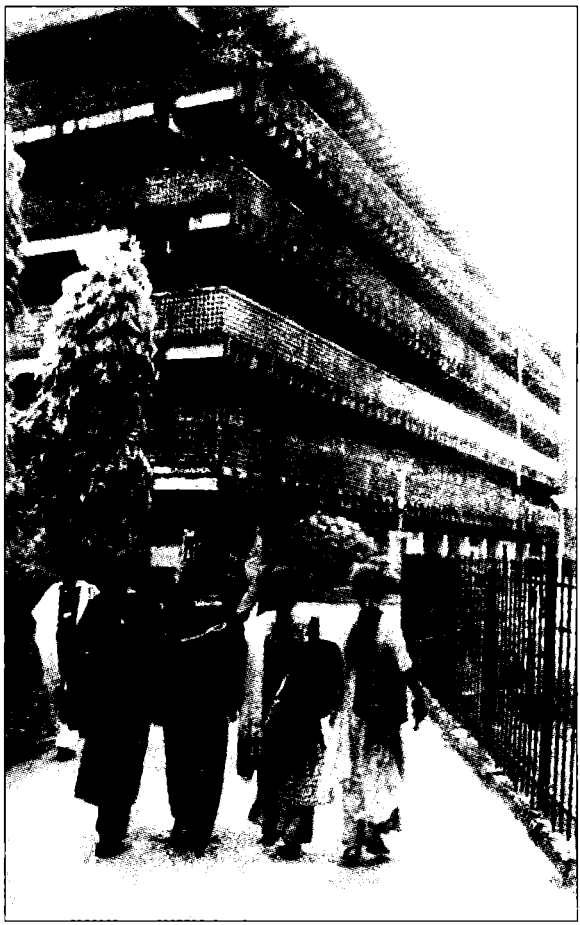

রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। The Daily Star-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত

www.pathagar.com

দারিদ্র্য-পীড়িত রোকেয়া পরিবারের সদস্যবৃন্দ
প্রথম আলোর সৌজন্যে প্রাপ্ত

পায়রাবন্দ গ্রামের সূর্য বেগম তার বাড়ির আঙিনায় কাজ করছে
প্রথম আলোর সৌজন্যে প্রাপ্ত

www.pathagar.com

মোসাম্মৎ রঞ্জিনা সাবের [বেগম রোকেয়ার ভাইঝি]
দৈনিক ইনকিলাবের সৌজন্যে প্রাপ্ত

প্রফেসর মাজেদা সাবের
[বেগম রোকেয়ার ভাইঝি]
প্রথম আলোর সৌজন্যে প্রাপ্ত

সোলায়মান আবু জায়গাম সাবের [বেগম রোকেয়ার ভাইপো,
বয়স ৭৫ বছর]
দৈনিক ইনকিলাবের সৌজন্যে প্রাপ্ত

www.pathagar.com

ADMISSION-2004

PLAY GROUP TO O'LEVEL

DARLAND

INTERNATIONAL SCHOOL & COLLEGE

FACILITIES OFFERED

- ★ OLDEST ENGLISH MEDIUM SCHOOL OF MIRPUR-PALLABI.
- ★ CONGENIAL ACADEMIC ATMOSPHERE.
- ★ OFFERS CURRICULUM BASED ON LONDON UNIVERSITY, UK.
- ★ RICH COMPUTER LAB
- ★ FULL TIME SCHOOLING
- ★ HOSTEL FACILITIES
- ★ TRANSPORT AVAILABLE.

ADMISSION :
Form Saturday to Thursday
from 9 a.m To 3 p.m

PLEASE CONTACT

Main Branch : House # 5, Road # 11/2, Block - B, Mirpur-10 Dhaka-1216, Tel : 9009816, Mobile : 018-237099
Mirpur Branch : 1270, East Monipur, Mirpur, Dhaka-1216, Tel : 9013757, Mobile : 018-237099
Malibag Branch : B-63, Malibag Chowdhurypara, Dhaka-1219 Tel : 9339959, 9348460, Mobile : 018-237099

www.pathagar.com

We BREED
WE HATCH
WE FED
WE NOURISH

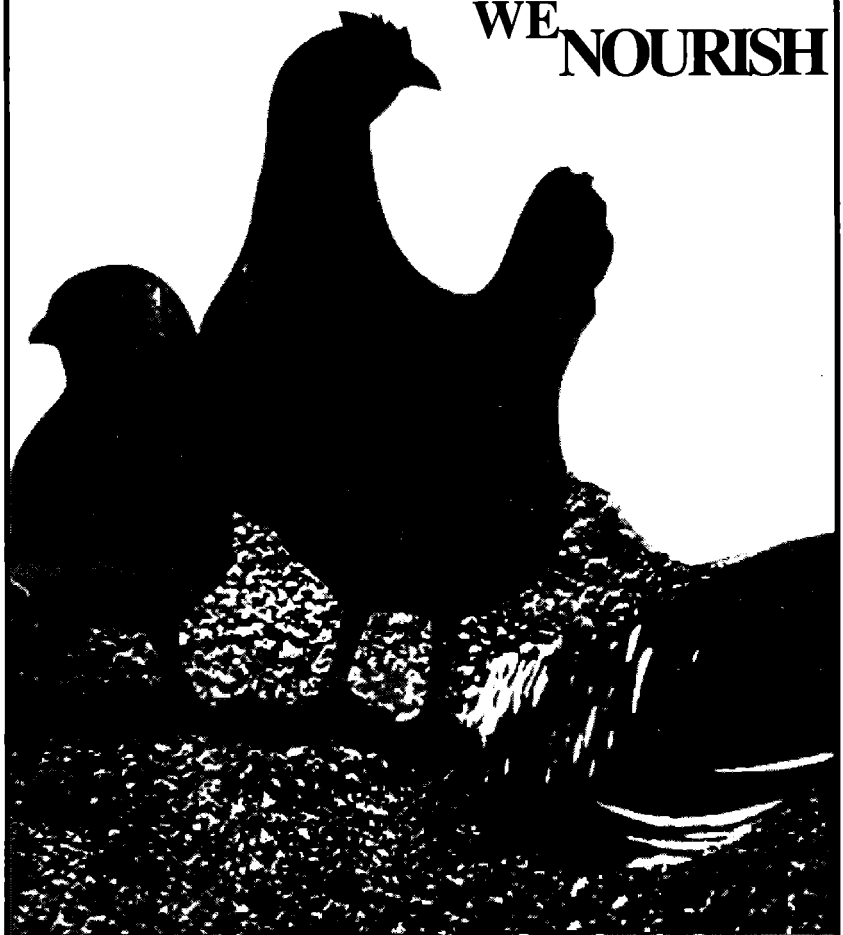

Nourish Poultry & Hatchery Ltd
House # 405 (3rd floor), Road # 27 (old), 16 (new)
Dhanmondi, Dhaka - 1209, Bangladesh. Phone : 8117977,
8115033, 018239903, 011838397, Fax : 88-02-8122213

B

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সাশ্রয়ী মূল্য– কম বিদ্যুৎ খরচ – বেশি বাতাস – দীর্ঘস্থায়ী

তাই সবার পছন্দ

বিউটি সিলিং ফ্যান

১২ বছরের গ্যারান্টি

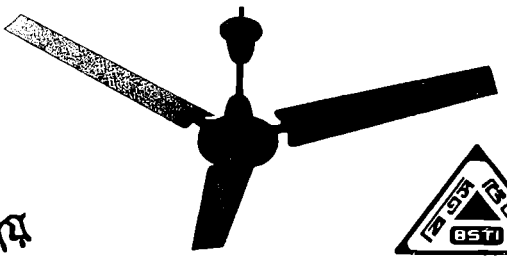

BSTI 818

শীতল হাওয়ায় পরান জুড়ায়

দেশী পন্য * বিদেশী ফর্মূলা * আকর্ষণীয় ডিজাইন

৪টি সাইজ * ৩টি মন মাতানো রং

বিউটি ডিলাক্স
বিউটি সুপার ডিলাক্স
বিউটি হাই ডিলাক্স ফ্যান

বিউটি ফ্যানটাস্টিক
বিউটি গোল্ড
বিউটি ভিআইপি ফ্যান

ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণই আমাদের লক্ষ্য

আপনার সম্পূর্ণ আস্থা নিয়ে

আজই কিনুন

প্রস্তুতকারক ঃ

মোকলেছ মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় : ১৬৬, নবাবপুর রোড (এনাম ইলেকট্রিক মার্কেট ৩য় তলা), ঢাকা-১১০০, ফোন : ৯৫৫৮৭৪৯

www.pathagar.com

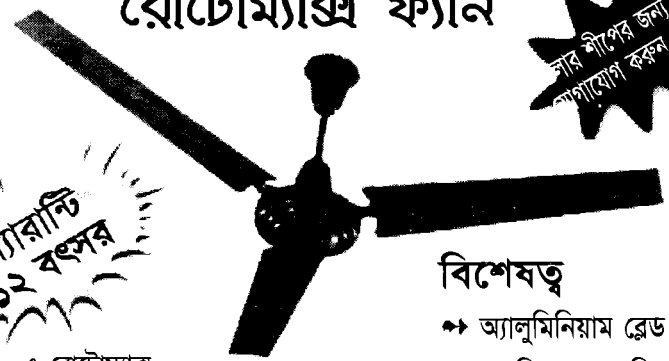

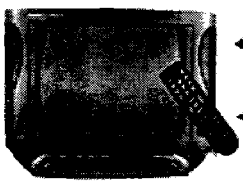

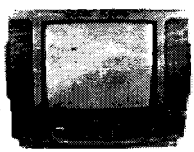

উন্নতমানের প্রতীক
রোটোম্যাক্স ফ্যান
গ্যারান্টি ১২ বৎসর
বিশেষত্ব
অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড
কোরিয়ান বেয়ারিং
কোরিয়ান সুপার ওয়্যার
উন্নতমানের প্রযুক্তি এবং দক্ষ কারিগর দ্বারা প্রস্তুত
ব্র্যান্ড ঃ রোটোম্যাক্স
সাইজ ঃ ৫৬″ এবং ৪৮″ (৩ পাখা ও ৪ পাখা)
RPM ঃ ৩২০, ৫৬″, ২২০/২৩০ ভোল্ট
৩৪০, ৪৮″, ২২০/২৩০ ভোল্ট
পাওয়ার ঃ ৮০ ওয়াট (৫৬″)
৭০ ওয়াট (৪৮″)
প্রস্তুতকারক ঃ রোটোম্যাক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
"নামেই যার দ্রুত প্রসার"
রোটোম্যাক্স টেলিভিশন
মডেল ঃ 44YL-3R
রিমোট
মডেল ঃ MTYL-14DX
বিশেষত্ব
ছবি এবং শব্দের পরিচ্ছন্নতা
এ, সি ও ডি সি-তে চালানোর সুবিধা
মোট ৩ বছরের সেবার নিশ্চয়তা
রিমোট টিভি ভি,সি,ডি-তে চালানোর সুবিধা
সকল অপারেশন রিমোট নিয়ন্ত্রিত
রিমোট টিভির ২৩০টি চ্যানেল
নন-রিমোট টিভির ১৮ চ্যানেল
বর্তমানে ১৫ ধরনের মডেল চালু আছে
প্রস্তুতকারক ঃ ইউয়ান লিমিটেড
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঃ ইঞ্জিনিয়ার বি. এম. মনিরুল ইসলাম
১৫ ইষ্টার্ণ হাউজিং, মিরপুর রোড, দারুস্‌সালাম, ঢাকা-১২১৮, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮০১০৬৬৬, ৮০২৩৭৭৭ মোবাইল ঃ ০১৮-২২৮১৪৯, ০১৭-৮৩২২০৭

খাঁটি গিনি সোনার গহনার জন্য সেরা

বন্ধন জুয়েলার্স
BANDHAN Jewellers

Bldg # 2	বিল্ডিং নং # ২
Shop # 53	দোকান # ৫৩
(1st Floor)	(দ্বিতীয় তলা)
Chandni Chawk AC Market	চাঁদনী চক এসি মার্কেট
3/2 Mirpur Road, Dhaka-1205	৩/২ মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
Tel#Shop : 8621150	ফোন # দোকান-৮৬২১১৫০
Mobile : 017-104943	মোবাইল ঃ ০১৭-১০৪৯৪৩

www.pathagar.com

Your dreams come true with Prime Bank

Prime Bank's **Consumer Credit Scheme** offers you an unique opportunity to buy in easy monthly installments all kinds of household item like Car, TV, Fridge, Washing Machine, Computer, Sewing Machine etc.

For details please contact any of our branches

Prime Bank Limited

A Bank with a difference

Head Office : Adamjee Court Annex Building-2
119-120, Motijheel C/A, Dhaka-1000
Phone : 9562983, PABX : 9567265